স্বপনে, নিভৃত স্বপনে

স্বপ্নিল • পরিক্রমা • দ্রিমি

স্বপনে, নিভৃত স্বপনে

স্বপ্নিল • পরিক্রমা • দ্রিমি

বুদ্ধদেব গুহ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SWAPANE, NIVRITA SWAPANE • SWAPNIL • PARIKRAMA • DRIMI
A Collection of Bengali Romantic Novels
by BUDDHADEV GUHA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 80.00

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা

প্রচ্ছদ : অমিতাভ চন্দ্র

B. C. S. C. Public Library
Lib Fin. Join No. 7212
Lib Fin. Gen. M.R. No. 27188

দাম : ৮০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কল্যাণীয়াসু

রিঙ্কি গাঙ্গুলীকে

লেখকের অন্যান্য বই

রিয়া
সোপর্দ
নাজাই
মহড়া
পারিধী
চবুতরা
বনবাসর
পরদেশিয়া
অভিলাষ
শালডুংরি
ধুলোবালি
পঞ্চপ্রদীপ
স্বগতোক্তি
শ্রেষ্ঠ গল্প
দূরের ভোর
দূরের দুপুর
যাওয়া আসা
আলোকঝারি
সুখের কাছে
জঙ্গল মহল
অদল বদল
সমুদ্রমেখলা
সারেং মিঞা
প্রথম প্রবাস
পঞ্চম প্রবাস
প্রেমের গল্প
জঙ্গল সত্তার
ভাল লাগে না
কাঙ্গপোকপি
সাজঘরে, একা
লবঙ্গীর জঙ্গলে
অজগরের দেশে
আয়নার সামনে
যুগল উপন্যাস

তেরোটি উপন্যাস
সাঁঝবেলাতে
পর্ণমোচী
চরৈবেতি
কোজাগর

চানঘরে গান
ঋভু (১ম) (২য়) (৩য়)
প্রথমাদের জন্য
জঙ্গলের জার্নাল
বাজা তোরা, রাজা যায়
ইলমোরাণদের দেশে
জলছবি, অনুমতির জন্যে
লালা মিঞার শায়েরী
পলাশতলীর পড়শী
ঋভুর শ্রাবণ
টাঁড়বাঘোয়া
গুণ্ডনোগুম্বারের দেশে
মউলির রাত
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
ওয়াইকিকি
বনবিবির বনে
হলুদ বসন্ত
বাবলি
চাপরাশ
ভোরের আগে
অন্য চোখে
সন্ধ্যের পরে
সাসানডিরি
পুজোর সময়ে
জেঠুমণি এণ্ড কোং
ল্যাংড়া পাহান
রুআহা
বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
বাংরিপোসির দু'রাত্রির
পহেলি পেয়ার
অন্বেষ
হাজার দুয়ারী
নিনিকুমারীর বাঘ
বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে ১ম, ২য়

স্বপনে, নিভৃত স্বপনে

স্বপ্নিল ● পরিক্রমা ● দ্রিমি

স্বপনে, নিভৃত স্বপনে

বহরমপুরে বার বন্যার জন্যে অবস্থা খুবই খারাপ। ট্রেন তো যাচ্ছেই না, গাড়িও যাচ্ছিল না এতদিন। এদিকে ট্যাক্স-অডিট সময়ে শেষ করতে না পারলে আয়কর আইনের দুশো একাত্তরের 'খ' ধারার দণ্ড লেগে যাবে সব মক্কেলেরই। আর সাংঘাতিক আইনই করেছেন সরকার। সময়ে, অর্থাৎ একত্রিশে অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট সুদ্ধ আয়কর রিটার্ন আয়কর দপ্তরে জমা না পড়লেই পেনাল্টি দু'লাখ টাকা।

ব্রজেন্দ্র মোহন, অবনীমোহন ঘোষের অফিসের বহরমপুরের পার্টনার এসটিডি করে কেঁদে বললেন, আপনি না এলে পর মক্কেলগুলান সব পটল তুলবে গো দাদা। আমি একা সামাল দিতে পারব না। মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বনাশ হয়ে গেছে এবারের বন্যাতে। প্লিজ একবার আসুন।

তোমরা পারবে না?

কী বইলতেচেন গো দাদা! পাইরলে কি আর বলতেচি! সত্বর আসেন গো! মরাল সাপোর্টের জন্যেও একবার আসা খুবই দরকার। লালগোলা চলছে না। গাড়িতেও আসতে পারবেন না। তবে রামপুরহাট হয়ে খাগড়াঘাটে নেমে আসতে পারেন। এতদিন তো নৌকোতে আসতেছিল মানুষে, এখন অবশ্য গাড়ি যাচ্ছে।

ব্রজভূষণ কথায় কথায় 'গো' 'গো' করে, যেমন কোলকাতার পাঁড়-ঘটিরা কথায় কথায় 'করিনিকো', 'খাইনিকো', 'যাইনিকো' বলেন। অবনীমোহনের এককালীন 'ইস্ট পাকিস্তানে', যেমন উত্তরবঙ্গ পূর্ববঙ্গের নানাজেলার ভাষা আলাদা আলাদা ছিল। আজও ঢাকা, নোয়াখালি, চাটগাঁ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, বরেন্দ্রভূমি, অর্থাৎ পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর ইত্যাদি সব জায়গার কথ্য ভাষাতেই বিস্তর তফাত আছে। অনেক জেলার ভাষা তো এতোটাই অন্যরকম যে অন্য জেলার মানুষদের পক্ষে বোঝাই দুষ্কর। তেমন পশ্চিমবঙ্গে ও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বহরমপুর ইত্যাদি জায়গার ভাষার মধ্যেও চাটগাঁ-নোয়াখালির মতো না হলেও অনেকই তফাত আছে। থাকাটা আশ্চর্যরও নয়।

বহুদিন বহরমপুরে থেকে থেকে ব্রজমোহনের কথাতে মুর্শিদাবাদী টান এসে

গেছে। ব্রজেন্দ্র মোহন বিয়েও করেছে স্থানীয় মেয়েকে। অত্যন্ত অবস্থাপন্ন শ্বশুরের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে ভালো রাজকন্যার সঙ্গে অডিট ফার্মের রাজত্ব বাগিয়ে নিয়েছে। নিজের রোজগারও কম নয়। অবনীমোহনের পার্টনার হওয়া ছাড়াও যে তার ইনডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে সেলস ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স প্রাকটিস করে। ভালো কথাই। বাঁশবনে শেয়াল রাজা হয়ে আছে।

অবনীমোহন ভাবেন, পৃথিবীতে অনেকেই দেশ আছে, যাদের আয়তন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এক একটি জেলার মতন অথচ তাদের কথ্য ভাষাতে তো বটেই, সংস্কৃতি, রুচি এবং স্বাধিকারেও তারা এক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। গায়ে গায়ে লেগে থেকেও তারা নিজেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং ঐতিহ্য গর্বের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। তাহলে আমাদের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বাংলার ভাষা আলাদা হতে অসুবিধে কোথায়?

রামপুরহাট থেকে বহরমপুরের পথে এখনও জল আছে। তিনটে ব্রিজও ভেঙে গেছে। বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করেও কাজের কাজ ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সমাধান কিছুই হয়নি, হয় না। সেচ এবং ত্রাণ দুই দপ্তরই সমান। স্বাস্থ্য দপ্তরেরও জবাব নেই। অন্য দেশ হলে এইসব দপ্তরের মন্ত্রী, আমলা এবং ঠিকাদারদের গুলি করে মেরে দিত মানুষে। হয়ত মারবেও একদিন। গণতন্ত্র যদি ধীরে ধীরে প্রহসনে পর্যবসিত হয় তবে সাধারণ মানুষ কতদিন আর সহ্য করবে এই অনাচার?

বাংলাদেশের স্বাধীনতার এখনও পঞ্চাশ বছর হয়নি। হলে পরে তখনই পশ্চিবঙ্গের অবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থার তুলনা টানা যাবে। তবে ঐ বাংলার মানুষেরা এই বাংলার মানুষদের চেয়ে পরিশ্রমী, জেদি। সম্ভবত বাংলাদেশের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের মতো শোচনীয় কখনওই হবে না। তা ছাড়া বাংলাদেশের মানুষেরা রাগীও। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মতো সর্বংসহ নন তাঁরা। যে রাগে ভর করে তারা একদিন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই রাগে ভর করেই তারা গণতন্ত্রকে রক্ষাও হয়ত করবে, ফাঁকা-বুলিতে রূপান্তরিত হতে দেবে না যে, এমন আশা করা যায়।

ট্রেনে রামপুরহাট অবধি এসে অবনীমোহন সেখান থেকে বাস ধরে কোনোক্রমে এসে পৌঁছলেন। লালগোলা চালু হতে এখনও অনেক দেরি। ভাবছিলেন, সত্যি! নিজে বহরমপুরে না এলে বুঝতেই পারতেন না বন্যার ভয়াবহতা। এখনও যদি WAR FOOTING-এ সব সমস্যার গভীরে গিয়ে সৎ এবং আন্তরিকভাবে তা সমাধান করার চেষ্টা না করা হয় তাহলে এই বন্যা বাৎসরিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে যে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। নির্বাচনে

ভোট দিয়ে মানুষ শাসক দলে পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিন্তু দেশের মানুষই যদি অকর্মণ্য, কর্মভীরু, অসৎ এবং অপদার্থ হয়ে যায় তবে সরকার বদল হলেও কোনো উন্নতি হবে না। দেশ গড়ে মানুষেই। তবে এটাও ঠিক যে, দেশের মানুষ, সব দেশেরই, নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে সব সময়ে যদি সততার সঙ্গে এবং সজাগ হয়ে নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্যর সঙ্গে কর্তব্য সম্বন্ধেও অবহিত না থাকে তবে মিছিমিছি সরকারকে দুষে লাভ কী?

অনেক কথাই মনে ভিড় করে আসছিল অবনীমোহনের রামপুরহাট থেকে খাগড়াঘাট-এর দিকে ট্রেনে যেতে যেতে।

খাগড়াঘাট স্টেশনে নেমে ভগীরথী পেরিয়ে বহরমপুরে ঢুকে বুঝতে পারলেন শহরের ভিতরেও অনেক জায়গাতে ভালো জল হয়েছিল। তবে ব্রজর বাড়ি এবং ওদের অফিস যে পাড়াতে, সেখানে জল ওঠেনি। চারধারের সব জায়গাতে, যেমন বেলডাঙ্গা, লালগোলা, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গীপুর, ইসলামপুর, কান্দী, এসব জায়গার অবস্থা মারাত্মক হয়েছিল এবং এখনো মারাত্মকই আছে। জল এসেছিল রাতে— ভোরে উঠে যে গরু-ছাগলদের খোঁটা থেকে খুলে মুক্তি দেবে সে সুযোগও পায়নি মানুষে। অবলা গবাদি পশুরা অসহায়ের মতো ভেসে গেছে।

বহরমপুর শহরের মধ্যেও অবস্থা খারাপ হয়েছিল। বাসস্ট্যান্ড জলের তলায় ছিল খাগড়া এবং ভাগীরথীর পাশে পাশে যে সব জায়গা, সবই ডুবে গেছিল। লালদীঘির আশপাশের পথ একাকার হয়ে গেছিল। লালদীঘির সব মাছও ভেসে গেছিল।

সাইকেল রিকশা থেকে উনি যখন ব্রজর বাড়ির সামনে নামলেন তখন ব্রজর ধড়ে যেন প্রাণ এল অবনীমোহনকে দেখে। বললেন, এবার আর ট্যুওরিস্ট লজ-এ উঠতে দেব না দাদা আপনাকে। তার সামনেও জল উঠেছিল। তা ছাড়া আপনি তো এলেনও বহুদিন পরে। আমার বাড়ির দোতলাতে একটা আলাদা Wing করেছি। আপনারই জন্যে বারান্দাওয়ালা আলাদা সুইটের বন্দোবস্তও করেছি যখন দোতলা বানাই, যাতে, আপনি সেই বারান্দাতে বসেই ব্যালান্স শিট ফাইন্যালিজ করতে পারেন। কিচেন প্যান্ট্রিও সব আছে। যদি আপনার কোনো বন্ধু ফ্যামিলি নিয়ে আসতে চান তাও স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। আলাদা লোক দিয়ে দেব রান্নার এবং দেখাশোনা করার যাতে আপরুচি-খানা খেতে পারেন। ফ্রিজও আছে। মাইক্রো আভেন। অসুবিধা নেই কোনো কিছুরই। তা ছাড়া আমার বাড়ির টিউবওয়েলের জল চমৎকার। অন্য কোথাওই আপনাকে থাকতে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না শুধু এই জলেরই কারণে। আন্ত্রিক, কলেরা,

টাইফয়েড ইত্যাদি নানা ওয়াটার-বোর্ন ডিজিজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। জল নামার পরে এসবের প্রকোপ আরও বাড়বে।

তারপর দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ব্রজ বলল, এই জন্যেই তো দাদা কতদিন ধরে বলে আসছি আপনাকে যে, দিনে মিনিমাম দু পেগ করে নিজৌষধি খান তা হলে কোনো ওয়াটার-বোর্ন ডিজিজই আপনাকে কখনো কাবু করতে পারবে না। তা আপনি কথা শোনেন কই? এবারে আমার বিনীত নিবেদন একটু শুনুন।

অবনীমোহন বললেন, রাখো তোমার বিনীত নিবেদন। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। তা রিনি কোথায়? তাকে দেখছি না। ছেলেমেয়েরা?

আজ তারা সব শ্বশুরবাড়িতে। পতিপ্রেম আর কাকে বলে। বন্যা হতে পারে শুনেই ছানা-পোনা নিয়ে বড়লোক বাবার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

তুমিও বা কী কম বড়লোক ব্রজ!

কী যে বলেন দাদা। কীসে আর ইসে।

শ্বশুরের যা কিছু সব তো তুমিই পাবে। রাজত্ব আর রাজকন্যা তো একই সঙ্গে বাগিয়েছ তুমি।

আমাকে শ্বশুরমশাই থোড়াই কিছু দেবেন। সবই মেয়ের নামে। অবশ্য আমি চাইও না কিছু। শ্বশুর-ভাঙানো মানুষ যেন কোনো দিনও না হই। ছিঃ।

তারপরই আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে বলল, কী বলব দাদা! আপনি তো সাহিত্য-টাহিত্যের ছায়াও মাড়ান না। একেবারে die hand অ্যাকাউন্ট্যান্ট আপনি। ডেবিট-ক্রেডিট-এর দু উইকেটের মধ্যেই সারাজীবন বিচরণ করে এলেন। উইকেটের পেছনে যে আম্পায়ার আর উইকেট কিপার ছাড়াও অনেক কিছু থাকে তা জানতেও পেলেন না কোনোদিন। জানতে চাইলেনও না। আমার মতো অধমেরা জানাবার চেষ্টা করলেও জানতে চাইলেন না। জানতে চাইলে, শরৎবাবুর কথা অবশ্যই জানতেন।

কোন শরৎবাবু? শরৎ ঘোষ? ইনকামট্যাক্স অ্যাপেলেট ট্রাইবুন্যালের জুডিসিয়াল মেম্বার?

আরে না না দাদা। কী যে বলেন আপনি। শরৎ চ্যাটার্জি, ঔপন্যাসিক।

ও। যিনি শ্রীকান্ত লিখেছিলেন?

শুধু শ্রীকান্তই কেন, আরও অনেক বইই লিখেছিলেন।

তা হয়তো লিখেছেন অবশ্যই কিন্তু তার সঙ্গে আন্ত্রিক বা কলেরা-টাইফয়েডের কী সম্পর্ক?

তার উপন্যাসে আছে না? যাকে বলে, বাইবেল-এর Gospel Truth.

কোন উপন্যাসে?

আরে দাদা এইতো হচ্ছে মুশকিল। মগজে সেলস ট্যাক্স-এর ইনকামট্যাক্স-এর সেকশান একেবারে গিজগিজ করছে। অন্য কিছুর জায়গায় নেই। মনে থাকে না কিছুই। উপন্যাসের নাম মনে নেই কিন্তু এটা মনে আছে যে, উনি লিখেছিলেন "ওলাউঠা রোগে গ্রামের সমস্ত মানুষ মরিয়া গেল শুধুমাত্র গ্রামের মাতালটি নদীপারে গান গাহিয়া ফিরিতে লাগিল।"

ওলাউঠা রোগটা আবার কী রোগ? যত সব ছোটলোকী রোগের নামই বা তুমি যোগাড় করো কোত্থেকে?

কলেরা দাদা। আমাদের কলেরা।

ও। তা কলেরার সঙ্গে মাতালের সম্পর্ক কী?

আরে! মাতাল রোজ মদ খেত বলেই না ওলাউঠা তাকে ছুঁতে পারল না।

অবনীমোহন বললেন, তুমি খাচ্ছ তো রোজই, খাও না, আমি কি মানা করেছি? কাজের সময়ে না খেলেই হলো। তা আমার পেছনে লাগবার কী দরকার?

চলুন ওপরে চলুন। এই একটাই ব্যাগ এনেছেন তো?

হ্যাঁ।

তারপর ব্রজ বললেন, ঠিক আছে। আজকের রাতটা রেস্ট নিন। আমরা সকাল সাড়ে আটটা থেকে অফিস শুরু করছি আজকাল। আপনি লুচি বেগুনভাজা রসগোল্লা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরেই আসবেন।

দোতলাতে পৌঁছে ঘর-বারান্দা দেখিয়ে ব্রজ বললেন, কেমন?

দারুণ।

পছন্দ হয়েছে তা হলে। তা চা খাবেন তো? আমি নিজে গিয়ে এখুনি নকুলকে চা দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পটে করে নিয়ে আসবে দুধ চিনি আলাদা করে— ঠাণ্ডা হবে না, টি-কোজি দিয়ে মুড়ে পাঠাব।

তোমার পুষ্যিরা কেমন আছে?

ভালো, সকলেই ভালো। শুধু নিবেদিতা, সিজারিয়ান সেকশান করার সময়ে বড় কষ্ট পেল।

পেল মানে কী? মরে গেছে না কি?

না না মরেনি দাদা, তবে বেশি বয়সে কনসিভ করেছিল তো? প্রেডিগ্রি হাঁস পাচ্ছিলাম না এখানে। তিন বছর কেটে গেল। এস.ডি.ও সাহেবের বাড়ি; নিবেদিতাকে নিয়ে যেতে হলো শেষ পর্যন্ত ও কম্মো করাতে।

অ।

অবনীমোহন বললেন থ হয়ে।

নিবেদিতা ব্রজর বড় আদরের রাজহাঁসী। সে-ই ব্রজর বাড়ির পাহারাদারনী।

কিন্তু আজ তার গলা পেলাম না যে!

বাঃ সে তো নার্সিং হোমে আছে এখনও। পরশু-তরশু আসবে।

সেটা কোথায়? হাঁসীদের নার্সিং হোম?

নকুলের শ্বশুরবাড়িতে।

অ।

অবনীমোহন বারান্দাতে দাঁড়িয়ে বললেন, বাঃ সত্যিই দারুণ করেছ তো হে দোতলাটা। ভিউও চমৎকার। এটা কি গাড়ি গ্যারেজে? নতুন নিলে বুঝি?

সবই তো আপনারই দয়াতে। এটা ইন্ডিকা ডিজেল।

মারুতিটা বেচে দিলে?

না। সেটা আপনার ভাদ্দরবৌ চড়ে।

বাঃ।

তারপর ব্রজ বললেন, আপনি কি নতুন গাড়ি কিছু নিলেন দাদা?

হ্যাঁ, আমি কি আর তুমি! পয়সা কোথায়? তা ছাড়া ব্যাচেলর মানুষ, প্রয়োজনই বা কী? আমার সেই পুরনো অ্যাম্বাসাডারই চলছে। ওল্ড ইজ গোল্ড।

এবারে বদলান দাদা। এখন বদলেরই যুগ।

কেন রে বাবা! দেশি গাড়ি। দেশের টাকা দেশেই থাকবে।

না দাদা। আঁকড়ে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে। কী বাড়ি, কী গাড়ি, কী নারী, এখন ধরবার আর ছাড়বারই যুগ। ই-মেইল এর যুগ।

যাই বল আর তাই-ই বল, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের, তাতে অ্যাম্বাসাডারই সবচেয়ে ভালো গাড়ি। ক্লিয়ারেন্স বেশি, পার্টস সস্তা। তাছাড়া পাওয়া যায় পানের দোকানেও। এতে যতদিন চলে যায়, চলুক। এখনও চাকা চারটে গড়িয়ে তো চলেছে, না কি?

আমিও নিতাম না। তা আমার দাদার ছেলে তো Prince of Wales! তারই জন্যে নিতে হলো। ব্রজ বললেন।

কাজ করছে কেমন? পরীক্ষা পাস করল?

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি তো পাস করতে পারল না। ভাবছি, ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়ে ল'টা পড়িয়ে আনব। বাঙ্গালোরের আইনের ডিগ্রি থাকলে.....

প্রফেশনে, ডিগ্রি দিয়ে কিছুই হয় না, ব্রজ। সে শুধু আইন কেন? ডাক্তারি, অ্যাকাউন্ট্যান্সি, আর্কিটেকচার অথবা এঞ্জিনিয়ারিংই হোক। পেশার সফলতা অন্য ব্যাপার। পেশাতে সফল হওয়াটা একটা আর্ট। বিশেষ কিছু গুণ এবং হয়তো

কিছুটা কপালেরও প্রয়োজন হয় তাতে। ঈশ্বর-আল্লাহর আশীর্বাদ কী দোয়া।

তা ঠিক।

তারপর ব্রজ বললেন, কালকে রাতে খাওয়ার সময়ে দাদা-বৌদিও আসবেন। সঙ্গে একটি বাংলাদেশি দম্পতিকে নিয়ে আসবেন। আলাপ করিয়ে দেব। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট-এর ব্যবসা করেন ভদ্রলোক। দাদার বাড়িতেই উঠেছেন কোলকাতা থেকে এসে। এসেই এই বন্যাতে আটকে গেছেন।

গজেনবাবু কেমন আছেন? অবনীমোহন জিজ্ঞেস করলেন।

চমৎকার। খারাপ কী করে থাকতে হয় তা দাদা জানেনই না। বাইরের জগৎ আর অন্তরের জগতের মধ্যে এমন মিল-মিশ আপনি কম মানুষের মধ্যেই দেখতে পাবেন।

যিনি এসেছেন সে ভদ্রলোকের নাম কী?

আগে নাম ছিল হোসেনুর। এখন হয়েছে হোসেন-উর।

কেন?

এখন সব কিছুই আরবি-ফারসি উচ্চারণে হচ্ছে বাংলাদেশে। মঞ্জুরুল এখন মঞ্জুর-উল। আহমদ এখন আহামাদ। আরব এখন আরাব।

অবনীমোহন বললেন, উর্দুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তো একদিন রক্তক্ষয়ী সম্মানক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ-এর জন্ম হয়েছিল। এখন বাংলাদেশে তাহলে আরবি-ফারসির এত রমরমা কেন? বাংলা ভাষা কি আবারও দুখিনী হবে?

আবার কেন? মোল্লাদের জন্যে। বাংলা ভাষার ভালোবাসায় ভর করে স্বাধীন হওয়ার পর এখন পৃথিবীর ইসলামি সংস্কৃতিতে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে শামিল হতে চলেছে বলেই আরবি-ফারসির এতো কদর হচ্ছে।

তাহলে ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা কি দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হয়ে যাবে? বাংলাদেশেও? ভারতে বাংলা ভাষা তো চিরদিনই দুখিনী মা, বাংলাদেশেও যদি তাই হয়ে যায় তাহলে তো ভারি দুঃখের কারণ হবে।

এখুনি হবে না। তবে ভবিষ্যতে হলেও হতে পারে।

ইসলামি দুনিয়ার টাকার জোর তো অসীম, অন্যান্য জোরও নেহাত কম নয়। ধর্মান্ধ মানুষও পশ্চিমবঙ্গেরই মতো কম নেই বাংলাদেশে। নানান প্ররোচনাতে তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছেও। তাই কোনোদিন তেমন হলে, হতেও বা পারে। ওসব প্রশ্নের জবাব নেই, আপনি বরং ওদেরই জিজ্ঞেস করুন,

যখন হবে দেখা।

তারপর ব্রজ বললেন, আপনি বাংলাদেশ হবার পর যাননি কখনও বাংলাদেশে?

না।

কেন?

আমার দেশের স্মৃতি আমার বুকের মধ্যেই থাকুক।

যাঃ বাবা। আপনি অদ্ভুত।

তো ওঁরা এই বন্যার মধ্যে এলেন কেন? মধ্যে তো আসেননি এসেছিলেন তো আগেই। মুর্শিদাবাদ ভালো করে দেখতে এসেছিলেন শ্রীমতী। নবাব সিরাজদৌল্লার প্রাসাদ। মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বর স্মৃতি। এরপর কোলকাতার পুজো দেখে ফিরবেন এমনই কথা ছিল। সেখানে কাজও সারবেন। রথ দেখা কলা বেচা দু-ই হবে। কিন্তু এমনভাবে যে আটকে পড়বেন তা তো আগে জানা ছিল না। আর হোসেনুর করিম এসেছিলেন ইসলামপুরের সিল্ক এর হদিসে। আরব দেশে নাকি খুব কদর। এক্সপোর্ট করেন এখান থেকে নিয়ে। দাদার সঙ্গে ব্যবসা সূত্রেই জানাশোনা ওঁদের।

তারপর বললেন, ওঁরা তো আর জানতেন না যে, এমন হবে। আমাদের আবহাওয়া দপ্তরের বুঝদার গোলদার সাহেবরা বৃষ্টি হবে না ঘোষণা করেন তো সাধারণ মানুষে ছাতা হাতে করে বাড়ি থেকে বেরোয়।

নকুল ট্রেতে বসিয়ে চা, কিসমিস দারচিনি-লবঙ্গ দেওয়া, ঘি-চপচপ, হালুয়া, পাঁপরভাজা আর চা নিয়ে এল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অবনী বললেন, বাংলাদেশের ওঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করবেন কেন? কোলকাতাতে কোনো পার্টির কাছে ইনট্রডাকশনের জন্যে কি?

না না ওরা 'দ্যাশে'র মানুষ, তাই।

ব্রজরা খাস কোলকাতার মানুষ। তিনপুরুষ সাদা চামড়াদের পায়ে তেললাগানো চাকর। তাদের পূর্বপুরুষেরা অবনীমোহনের মতো উদ্বাস্তুদের পরম ঘৃণামিশ্রিত-অবজ্ঞার সঙ্গে 'রেফ্যুজি' বলেই ডেকে এসেছেন। নইলে, 'বাঙাল'। এমন ভাব, যেন দুই বাংলার রেফ্যুজিরাই স্বেচ্ছায় এবং মহানন্দে রিফিউজি হয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ঘটি-বাটি ছেড়ে চলে এসেছিলেন ও চলে গেছিলেন অন্য দিকে, এতো কষ্ট অসম্মান ও অপমানের ভাগীদার হবার জন্যে। সম্পূর্ণই নিজেদের ইচ্ছাতে। শিকড় উপড়ে নিয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে নিজেদের পিতৃপুরুষের দেশ, শৈশবের

অনুষঙ্গ ছিঁড়ে-খুঁড়ে চলে যে কেউই ইচ্ছা করে আসে না। তা যারা জানে, তারাই জানে। অবনীমোহন এ কারণেই চিরদিনই সুখী। মালিকের, সে মালিক ধলাই হোক কী কালো, পা-চাটা অথবা পিতৃপুরুষের রোজগারে সুখে বসে খাওয়া পরম অন্ধ কূপমণ্ডুক মানুষদের মনুষ্যেতর জীব বলে গণ্য করে এসেছেন। ওঁদের 'পশ্চিম' মধুপুর আর যসিডি, বড়জোর হাজারীবাগেই শেষ হয়ে গেছে। দিগন্ত ওঁদের চিরদিনই সীমিত। তাঁদের অবজ্ঞা এবং শ্লেষ অনুকম্পার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন তিনি, গায়ে মাখেননি।

'দ্যাশের লোক' শব্দ দুটি বেশ বিদ্রূপের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছিলো ব্রজ। অবনীমোহন ভাবছিলেন, কোথাকার মানুষ এই করিম সাহেবরা?

অবনীমোহনের আদি দেশ ছিল বরিশালে, বহুপুরুষ আগে। তারপরে ছিল ফরিদপুর। তারও পরে শেষ দেশ রংপুরে। ইস্ট পাকিস্তানের উত্তরবঙ্গে। কোন দেশের মানুষ করিম সাহেবরা কে জানে।

অবনীমোহন বললেন, আমি একটু বিশ্রাম করে নিই ব্রজ চা খেয়ে। তারপর চান করে উঠে তোমাকে ডাকব। যদি কোনো কিছু ডিসকাসন-এর থাকে তাহলে তখন করা যাবে। আর্টিকেলড ও অডিট ক্লার্করা, টাইপিস্টরা, কম্প্যুটারের ছেলেরা সকলে আসবে তো কাল?

সক্কলে আসবে দাদা। আপনি কোলকাতা থেকে এক হাতে ছাতা আর অন্য হাতে জুতো নিয়ে এসে পৌঁছলেন আর এ নবাবেরা বহরমপুর শহর থেকে আসতে পারবে না? তারপরে ব্রজ বললেন, বন্যার জন্যে আমি সকলকে এক শ' টাকা করে দিয়ে দিয়েছি।

অডিটেড ব্যালান্স শীট এবং ট্যাক্স অডিট রিপোর্ট ছাড়া তো রিটার্ন দেওয়া যাবে না। এখন অন্য বা অন্নচিন্তা নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না।

বেশ করেছ। চমৎকার কাজ করেছ। এইতো হাত ধীরে ধীরে খুলছে দেখছি। দেবার সময়ে আমার অনুমতির প্রয়োজন নেই। না-দেবার সময়ে অনুমতি নিও। তাদের বিপদে আমরা তাদের পাশে না দাঁড়ালে তারা আমাদের বিপদে পাশে দাঁড়াবে কেন?

একটা কথা মনে রেখো ব্রজ। মালিকের পরিচয় তার নিজের অবস্থা দিয়ে হয় না, হয় তার কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থা দিয়ে। তারাই তোমার সবচে' আপন লোক। এটা জানবে।

আজকাল আগের দিন নেই দাদা। কর্মচারীরাও আজকাল মালিককে আপন মনে করে না।

মালিক যদি মনে না করে তো তারাই বা করবে কেন? কিন্তু একশ টাকার দাম কী এখন? কাল তুমি হাজার টাকা করে দাও। কারও বেশি ক্ষতি হয়ে থাকলে তাকে আরও দিতে হবে।

বলছেন বটে দাদা, কিন্তু দিনকাল সব বদলে গেছে। যে গরুর দুধ খায় তাকেই এখন লোকে লাথি মারে। মানুষ বড় স্বার্থপর হয়ে গেছে। ফোর-টুয়েন্টি। উপকার করলে আড়ালে বলে, 'মানুষটা বোকা'। নিজের টাকা নিজের কাছে না রাখলে তাকে কেউ বুড়ো বয়সে খেতেও দেবে না। নিজের ছেলেমেয়েই চেনে না, আর পর। যাই হোক, আমি জানতাম ফোনের লাইন, বা ফ্যাক্স কাজ করলে আপনি করতেই বলতেন, তাই, নিজে থেকেই করেছি।

খুবই ভালো করেছ ব্রজ। বললামই তো। তোমার কাজ তুমি করো। বিচারের ভার ঈশ্বর-আল্লার উপরে ছেড়ে দাও। তিনি যা করবেন তাই হবে।

বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তো আপনি। তার পরে তো অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আনপড়দের মতো সবসময় ঈশ্বর-ঈশ্বর কী করে যে করেন তা আপনিই জানেন দাদা। ঈশ্বরের নাম শুনলেই তো কমিউনিস্ট আর আঁতেলরা আপনাকে জুতোপেটা করবে।

কমিউনিস্ট আর বাঙালি আঁতেলদের কথা ছাড়ো।

কেন?

ভর সন্ধেতে ঐ সব এসকেপিস্টসদের নাম করতে নেই।

তাহলে আমি আসি। ব্রজ বললেন। আর কিছু কি খাবেন?

কী আর খাব? তোমার নকুলের পাঁপরভাজা আর হালুয়া খেয়েই পেট ভরে গেছে।

ক্ষীরের দুটো পাটিসাপটা? বৌদি সম্ভবত করিম সাহেবদের জন্যে করেছিলেন। আমার জন্যে এবং আপনি আসছেন শুনে আপনার জন্যেও বেশি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ব্রজর দাদা গোপেন্দ্র মোহনের অবস্থা অত্যন্ত সচ্ছল। তা ছাড়া মনও খুব দরাজ। ব্রজেন্দ্র সঙ্গে তার তফাত আছে।

এই জন্যেই তো তোমার কাছে আসতে চাই না। এলেই ওজন বেড়ে যায়। তারপর বললেন, সিনিয়র পার্টনার ব্যাচেলর, এরকম সি. এ. ফার্ম বোধহয়

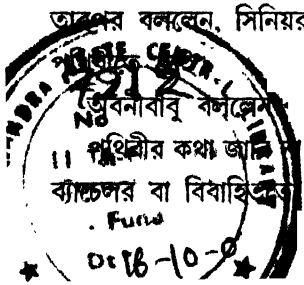

ভুবনবাবু বললেন

পৃথিবীর কথা জানি না দাদা। কোলকাতার কথা জানি। কোলকাতাতে অন্তত ব্যাচেলর বা বিবাহিতদের কোনোই তফাত নেই।

মানে?

মানে আর কী। সি. এ.-দের ছেলে হয় না। শুধুই মেয়ে।

সে কী। এ আবার কোন নতুন তথ্য শোনালে তুমি ব্রজ?

হ্যাঁ দাদা। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, কোনো বড় বাঙালি সি. এ. ফার্ম-এর বংশধরই নেই। কোথাও কোথাও জামাইরা ইনহেরিট করেছে বটে কিন্তু তাও কম। কেন এমন হয় কে জানে? ট্রায়াল-ব্যালান্স মিলিয়ে কি তাদের বীর্য তরল হয়ে যায়?

অবনীমোহন ব্রজর কথাতে হেসে ফেললেন।

বললেন, চান করতে যাচ্ছি। গিজার লাগিয়েছে তো বাথরুমে?

কী যে বলেন দাদা! আমার সিনিয়র পার্টনার চান করবেন আর গিজার থাকবে না সে বাথরুমে? আমি কি আপনার কোলকাতার পার্টনার? জায়গার নাম বহরমপুর। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার জায়গা এ।

চান করতে করতে ভাবছিলেন অবনী, র‍্যাজহাঁসীর নাম নিবেদিতা। এবং তারও আবার সিজারিয়ান সেকশান অপারেশান। সিস্টার নিবেদিতা বেঁচে থাকলে হয়ত আত্মহত্যাই করতেন।

শাওয়ারের নিচে ঈষদুষ্ণ জলের ধারায় চান করতে করতে অবনীর আবারও মনে হলো যে, ব্রজ যখন বলল, আপনাদের 'দ্যাশের লোক' তখন কথাটার মধ্যে তাচ্ছিল্য অবশ্যই অনেকখানি ছিল। তাঁদের উত্তরবঙ্গের দেশ-এ তিনি জন্মানও নি। জন্মেছিলেন কোলকাতাতেই। তবে শেষ দেশ উত্তরবঙ্গের রংপুরেই ছিল। যুদ্ধের সময়ে কোলকাতাতে কর্মরত বাবা রংপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাঠশালাতে পড়েছিলেন অবনীবাবু। 'ধাপ'-এর ডিমলার রাজবাড়ির উল্টোদিকের পাঠশালাতে, ত্রিশের দশকের শেষাশেষি। তারও পরে রংপুরের জেলা স্কুলেও পড়েছিলেন। সে সব স্মৃতি বড় মধুর। তেমনই তিক্ত দেশভাগের পরপরই এক পিসির বিয়ে খেতে গিয়ে রংপুর থেকে ফিরে আসার সময়ে রংপুর স্টেশনে এবং পথে আনসার বাহিনীর অত্যাচারের। কিশোর অবনীবাবুর মনে সেই পরম মধুর এবং পরম তিক্ত অভিজ্ঞতা এমন করেই গেঁথে আছে যে যতদিন নিঃশ্বাস ফেলছেন এবং প্রশ্বাস নিচ্ছেন ততদিন তা মুছবে না।

'দ্যাশের লোক' বলতে কী বোঝালো ব্রজ কে জানে!

ভদ্রলোক কি রংপুরের? না ভদ্রমহিলা? না কি দুজনেই?

পরবর্তী জীবনে বরিশালেও থেকেছিলেন উনি মাস ছয়েক। তখন ক্লাস সিক্স-এ পড়তেন উনি। সেই স্মৃতিও স্পষ্ট আছে। কিন্তু তা রংপুরের স্মৃতির মতো

মোহজাল বিস্তার করে না।

কেন করে না, কে জানে! জীবনের প্রথম দশটি বছরের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, অভিঘাত হয়ত প্রত্যেক মানুষেরই চরিত্রের উপর এক বিশেষ প্রভাব ফেলে নইলে কেন মনে হয়, সে সব তো 'কালকেরই কথা।'

চান করতে করতে মনের মধ্যে নানা ফানুস ওড়ালেন অবনীবাবু। 'দ্যাশের লোক' শব্দ দুটি এমনভাবে উচ্চারণ করেছিল ব্রজ তাতে অবনীবাবু বুঝেছিলেন যে যাঁরা এসে উঠেছেন ব্রজর দাদা গজেন্দ্রর বাড়ি, তারা নিছকই রংপুরের মানুষই নন। নিশ্চয়ই অবনীবাবুর বিশেষই পরিচিত।

কালকে রাত। সে তো অনেকেই দেরি। মনে মনে চিন্তিত এবং কিঞ্চিৎ উত্তেজিতও হয়ে উঠলেন অবনীবাবু। কার বা কাদের সঙ্গে দেখা হবে কাল রাতে কে জানে? রাতে খেতে বসে ব্রজ সর্বক্ষণ বন্যার ভয়াবহতার কথা বলে গেল। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। কোথায় স্ত্রী ভেসে গেছে, স্বামী সেই শোকে পাগল হয়ে গেছে। কোথায় শিশুরা ভেসে গেছে অথচ মা বেঁচে আছে। বৃদ্ধা মা-বাবা বেঁচে আছে, ছেলে, ছেলে-বৌ. নাতি-নাতনিরা, অবিবাহিত ছোট মেয়ে সবাই ভেসে গেছে। ভেসে গেছে মনিহারি দোকান, চাল-ডাল, নুন তেল, হরিশ শাহ আর কামাল শেখ এর বান্ডিল বান্ডিল দু নম্বরি টাকা। যে টাকা ভাসেনি, তা কাগজ হয়ে গেছে। পাঁচশ টাকার কড়কড়ে নতুন নোটের বান্ডিল দিয়েও খুদ কুড়ো জোটেনি জিয়াগঞ্জের পঞ্চানন ঘোষ-এর, যে নাকি নিজেই মস্ত বড় আড়তদার ছিল।

জলে গেছে অনেক জায়গার এস. ডি. ও, এস.ডি.পিও, বড় দারোগা ছোট দারোগাদের ঘুষের টাকা। যেখানে ভেসে যায়নি সেখানেও Legal tender বলে গণ্য হয়নি টাকা।

আর নানাজাতের সাপ এসে উঠেছে গাছে, সামান্য ডাঙ্গা জমিতে, রেল লাইনের ওপরে যেখানে মানুষে আশ্রয় নিয়েছে। কান্দীর সাপদরদি স্নেক পার্কওয়ালা গজা মিত্তির নিজে হাতে বিষাক্ত সাপ মেরেছে বন্দুক দিয়ে আর নির্বিষদের ছেড়ে দিয়েছে জলে। ইসলামপুরের আমিনুল হক এরা শাপলা দিয়ে ঢোঁড়া সাপের তেলহীন চচ্চড়ি বানিয়ে খেয়ে থেকেছে সাত দিন পরিবার সুদ্ধ। শুধুই এ সব গল্প। এইসব শুনতে শুনতে খাওয়া! মুখে রুচি ছিল না অবনীমোহনের। কিন্তু তাতেও ব্রজর বিকার নেই।

পায়েসটা আরেকটু নিন অবনীদা, বলেই বললেন, পেটে একদানা ভাত নেই মানুষগুলোর। কী যে অবস্থা মানুষগুলোর। অদ্ভুত লোক এই ব্রজ। ব্রজেন্দ্রমোহন

ঘোষ। অবনীবাবু ভাবছিলেন মনোহরপুরের জমিদার বাড়িতে একরকমের বন্দুক দেখেছিলেন, নাম প্যারাডক্স। তার এক নলে বন্দুক অন্য নলে রাইফেল। এই ব্রজমোহনও একটি প্যারাডক্স। অবনীমোহন দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, অনেক খেয়েছি। আর নয়। উঠছি আমি। বুদ্ধিমান ব্রজ অবনীমোহনের মন বুঝে বললেন, তাতে কী হয়েছে দাদা। পৃথিবীর সব দুঃখ-কষ্ট কি আমরা লাঘব করতে পারি? বলুন? এক জায়গাতে সূর্য যখন ওঠে তখন অন্য জায়গাতে অন্ধকার। সংসারে বিপদ আপদ, ওঠা-পড়া থাকেই। কখনও মানুষের হাতে মার খেতে হয় কারো, কখনো বিধাতার হাতে। যতক্ষণ চার দিকে আলো আছে, পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে, গরু দুধ দিচ্ছে, মেয়েরা সাজুগুজু করে চোখে কাজল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ততদিন আনন্দ করে নেওয়াই তো উচিত। make hay, while the sun shines, কী বল?

অবনীমোহন কিছুই বললেন না, ইংরেজি ইডিয়মটি যে ভুল প্রয়োগ করল তা ব্রজকে বলে লাভ নেই। ছাত্রাবস্থাতে যা শিখেছিল তা শিখেছিল, এখন ওর ইংরেজির দৌড় থেকে গেছে গ্রাউন্ডস অফ আপীল লেখাতে এসে। That, on law, as well, as on the fact and in the circumstances of the case, the learned income-tax-officer was wrong in making an addition or Rupees three lacs twenty three thousand five hundred and thirty three under the had Dhata account. হয় পাটের ধলতা, নয় গলতা, নয়, কাঁসার না সোনা-রুপোর গলতা গ্রেস প্রফিট নয় ক্যাশ ক্রেডিট এই নিয়েই ব্রজেন্দ্রমোহনের জগৎ। অর্থকরী, অর্থময়। জগতটা হয়ত কিঞ্চিৎ অন্যরকম হতে পারত যদি ট্রাইব্যুনাল অবধি যেত কোনো কেস নিয়ে। সে সব ঝামেলার মধ্যে যায়ই না ব্রজ। Section 264 এ কমিশনারের কাছ অবধি গিয়ে যা হয় তা হয়। বাকিটা মফস্বলের সাদা-সিধে মক্কেলদের বলে দেয়, আর হবে না, যা করার তা করা হয়েছে।

সি এ পরীক্ষা পাস করার পরে, অনেক সি. এ.-দেরই মতো পেশার প্রয়োজনে যেটুকু লেখাপড়ার প্রয়োজন তার বাইরে আর কোনোরকম পড়াশুনোই করেনি। সাহিত্য তো পড়েই না। অথচ কথাই আছে Literature makes a man. ব্রজর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কিন্তু বুদ্ধিটা পুরোপুরি সুবুদ্ধি নয়। তার বুদ্ধিমত্তার সবটুকুই সে ব্যয় করেছে নিজের পকেট ভর্তি করতেই এবং বহুদিন তা করতে করতে পকেট ভর্তি করাটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। মক্কেলের ভালোর কথা আর ভাবে না ও। যেন-তেন-প্রকারেণ পকেট ভর্তি করাই এখন ওর অভ্যেস।

ছেলেবেলায় অবনীমোহন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি ছোট উপন্যাস পড়েছিলেন। তার নাম ছিল 'দুই বাড়ি'। অসম্ভব মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস। এক গরিব উকিল সদ্য আইন-পাস করা তার ভাইপোকে জুনিয়র নিয়েছেন। এক অখ্যাত মফস্বল শহরেই তাদের বাস। সেখানে এক মস্ত বড়লোকের বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে দাসদাসী পাত্রমিত্র নিয়ে প্রতি বছর শীতের ছুটিতে আসেন। খুব খাওয়া-দাওয়া, নানা মজা, গান-বাজনা, প্রাচুর্যের বন্যা বয়ে যায়। সেই বাড়ির ছোট মেয়েটির ভারি সুন্দর চেহারায় এবং ব্যবহারে সেই তরুণ মনে কল্পনার ফানুস ওড়ায়। তারপর একদিন, যেমন সব আনন্দই শেষ হয়ে যায়, শুরু থাকলেই যেমন শেষ থাকেই, সংসারে কোনো দুঃখ বা আনন্দই নিরবধিকাল ধরে চলতে পারে না যে, এই স্বাভাবিক নিয়মে ভর করেই তারা ফিরে যান কোলকাতায়। তাদের শূন্য, অন্ধকার বাড়িটা সেই তরুণের বুকে পাথরের মতো চেপে বসে থাকে।

আধুনিক লেখকেরা প্রেমের গল্প লেখেন বটে কিন্তু শরৎবাবুর 'পরিণীতা' বা 'বিপ্রদাস' বা 'শ্রীকান্ত' মতো, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই বাড়ির' মতো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মানদীর মাঝির'র মতো প্রেমের গল্প লিখতে পারেন কই? তা ছাড়া,ঐ সব উপন্যাস তো নিছক প্রেমেরই নয়।

প্রেমের গল্প লিখিয়েরা, রোমান্টিক লেখকেরা সকলেই না কী থার্ড গ্রেড লেখক? পশ্চিমবঙ্গের আঁতেলরা তাই বলেন। অবনীমোহন এই যুক্তি মানতে পারেন না, পারেননি কোনোদিনই।

বিভূতিভূষণের 'দুই বাড়ির' কথা যে প্রসঙ্গে তাঁর মনে এসেছিল সেই প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলেন অবনীবাবু। আসলে ঐ বইটির কথা মনে হয়েছিল সেই উপন্যাসের উকিলবাবুর তার ভাইপোকে দেওয়া একটি উপদেশেরই প্রেক্ষিতে। কাকা-ভাইপো একসঙ্গে খেতে বসেছেন মেঝেতে। কাকা বলেন, মক্কেলের একটা পয়সাকে নিজের পয়সা বলে জ্ঞান করবে। কোনোভাবেই সে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাই দেখবে। এই হচ্ছে ওকালতির প্রথম পাঠ। যে উকিলের বিবেক নেই, সে উকিল পদবাচ্যই নয়।

এই বিবেকের কথাতেই ছেলেবেলাতে কোলকাতার কোনো রঙ্গমঞ্চে দেখা একটা নাটকের কথা মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের। একজন মাড়োয়ারি ব্যবসাদার ফাঁকা মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বগতোক্তি করছিলেন। "আমার পার্টনার বোলতেছে কী না যে ময়দা বানাতে গমের সঙ্গে তেঁতুলের বিচি মেশাও তাহলে

মুনাফা তিনগুণ হোবে। ভাবতে আছি এখন হামি কী কোরবে? হামি কী করবে? হামার যে বিবেক আছে। সে শালা বড়ই কামড়াতেছে যে। বিবেক শালা এক নম্বরের হারামি আছে।"

শ্যাম লাহা ঐ চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন। নাটকের নামটাম কিছু মনে নেই আর এতদিন পরে। হঠাৎ আজ রাতে ঐ গল্পটা কেন মনে পড়ল কে জানে। মানুষের মন এমনি দুর্জ্ঞেয়। কখন যে সে কী ভাবে, কেন ভাবে, তা কি সে নিজেই জানে! সে সব ভাবনার কোনো ব্যাখ্যা থাকে না।

এই বিবেকই হচ্ছে আসল। যা কোনো কোনো চোর-ডাকাতেরও তাকে আবার অনেক ডাক্তার উকিল ব্যারিস্টারেরও থাকে না। কাকা ভাইপোকে বিবেকসম্পন্ন উকিল হতে বলেছিলেন। কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে বিবেকসম্পন্ন ডাক্তার বা উকিল আর সোনার পাথরবাটি প্রায় একই কথা হয়ে গেছে।

একা বসে আছেন বারান্দাতে। নিচের পথ দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে দুটি একটি সাইকেল, রিকশা যাচ্ছে আসছে। দুটি কুকুরে কামড়া কামড়ি করে উঠল। রাস্তার ও পাশের কোনো বড়লোকের বাড়ির বাগানে প্যাঁচা আর প্যাঁচানি ঝগড়া শুরু করল। কোথায় যেন চাঁপা ফুটেছে, গন্ধে ম ম করছে. একটা সিগারেট ধরিয়ে নানা কথা ভাবছিলেন অবনীমোহন। দোতলাতে ওঁর জন্যে নির্ধারিত উইং-এর বারান্দাতে উনি ইজি চেয়ারে একাই বসেছিলেন।

ব্রজ তার ইমপোর্টেড বাথরুম স্লিপার পায়ে দিয়ে থপ-থপ করে উঠে এলেন দোতলাতে, খিদমদগার নকুলও সঙ্গে এল। বললেন, নকুল, মশারি ভালো করে গুঁজেছিস তো?

নকুল বলল, হ্যাঁ বাবু।

বহরমপুরে মশা কি আগের মতোই আছে?

অবনীমোহন জিজ্ঞেস করলেন।

একটু কমেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে, মেলা বাড়িঘর হয়েছে ড্রেইনেজ সিস্টেমের কিছু উন্নতিও হয়েছে। তবে এখন তো সব মশাও বানের জলে ডুবে মরেছে। মশা হবে বটে, জল কমলে। বাবার নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে। সাপ ব্যাঙ তো সব নির্মূল হয়ে গেল বন্যাতে। ইঁদুরেরাও ডুবে মরল লাখে লাখে, কী শহরে-গ্রামে কী মাঠে-ময়দানে, খেতে। আসল সীনটা বোঝা যাবে জল সরে গেলে।

রিলিফ-এর কাজ বহরমপুরে কেমন হলো?

যেমন অন্য সব জেলাতে হলো। যদি পার্টির দাদা-টাদা থাকে তা হলে পেল

কিছু নইলে পেটে কিল দিয়ে পড়ে থাকল।

কোন পার্টির দাদা?

সব পার্টির দাদাই। মানে যে-কোনো পার্টির দাদা হলেই চলবে। কিন্তু দাদা মাস্ট। সি পি এম, আর এস পি, কংগ্রেস যে-কোনো দলের দাদা। সব দাদাই সমান। তার ওপরে এখন হয়েছে তৃণমূল। এই মূলও দন্ত্যশূল হয়ে কী না দেখা যাক। এখনও কিছু বলা যায় না। কোন পার্টি, সে পার্টি ভালো কী মন্দ সেটা বড় কথা নয়, পার্টি হলেই হলো। রিলিফ কী দেওয়া হলো তা নৌকো করে গিয়ে খোঁজ করে আসুন, জানবেন। এদিকে সরকারি রিলিফের কর্মীদের থার্টি টু অল আউট।

মানে?

অবাক হয়ে বললেন অবনীবাবু। তারা কি ক্রিকেট খেলে না কি? তা ছাড়া থার্টি টু?

দাদা যে কোন আমলে পড়ে আছেন! আজকালকার মডার্ন একসপ্রেশানই জানেন না। থার্টি টু অল অডিট মানে, বত্রিশ পার্টি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে আর কী। আহ্লাদে, আনন্দে। যত বন্যা, যত খরা, যত দুর্গতি ততই তো তাদের পোয়াবারো। হিঃ হিঃ।

রামকৃষ্ণ মিশন কি খুব কাজ করল এখানে?

রামকৃষ্ণ মিশন এখন শুয়ে-বসে থাকা মানুষদের ডিপো হয়েছে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারেরই মতো আরও এক Establishment হয়ে উঠছে। তবে কাজ করছে বটে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। তাদের টাকাকড়ি ক্ষ্যামতা বিশেষ নেই বটে তবে আন্তরিকতা আছে প্রচণ্ড। অত্যন্তই সীরিয়াস। যেখানেই বিপদ সেখানেই গিয়ে সবার চেয়ে আগে ঝাঁপিয়ে পড়েন ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা।

তারপর ব্রজেন্দ্রমোহন বললেন, আমি তো সে কারণেই এদের প্রতি মাসে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট চাঁদা দিই।

কত দাও?

শব্দ দুটি ঠোঁটের ডগাতে এসে গেছিল। সামলে নিলেন অবনীমোহন। কিন্তু পরমুহূর্তেই দাতা ব্রজ নিজেই শ্লাঘা ভরে বললেন, প্রতি মাসে দশ টাকা করে দিই।

অবনীমোহন বললেন, বেশ করো। খুবই ভালো করো। তোমার হাত আরও খুলুক।

আমি তাহলে আসছি দাদা। কাল নকুলকে ক'টাতে চা দিতে বলব? বেডটি?

ছ'টাতে। তার আগে দেওয়ার দরকার নেই। একটু হেঁটে এসে তারপর চান করে আটটাতে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে যাব। যাব মানে কী! এক তলা নামলেই তো অফিস।

ঠিক আছে দাদা। গুড নাইট। আজ আমার শ্বশুরবাড়িতে রাত কাটাতে হবে।

কেন?

ওয়াইফ-এর অর্ডার। তবে আমি আপনার ব্রেকফাস্টের আগেই চলে আসব। তারপর বলল, নিবেদিতা নেই, তাই বাইরের ফ্লুরোসেন্ট আলোটা জ্বলবে। বন্যার পরে চুরি-ডাকাতির হিড়িক পড়ে গেছে। দোষও নেই। মানুষে না খেয়ে আছে যে!

ব্রজ চলে গেলে অবনীমোহনের একটা গল্প মনে পড়ে গেল। ই এন টি'র মস্ত ডাক্তার অমিতাভ রায়ের মুখে শুনেছিল। দীপচাঁদ কাঙ্কারিয়া মস্ত বড় প্রডিউসার ছিলেন। সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের ছবিও প্রোডিউস করেছিলেন। তা কোলকাতার ক্যালকাটা ক্লাব-এর মেইন হল-এ ড. রায়ের সঙ্গে দীপচাঁদ কাঙ্কারিয়ার দেখা। দীপচাঁদ বললেন, কালকে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি দেখলাম।

কেমন দেখলেন? ড. রায় জিজ্ঞেস করলেন।

সে আর কী বোলব মোশায়, কী পোভার্টি! কী পোভার্টি!

তাই?

হ্যাঁ। না তো বলছি কী? এতোই মন খারাপ হয়ে গেল যে, পুরো স্টাফ-এর মাহিনা বাড়িয়ে দিলাম।

কত করে? এ কথা জিজ্ঞেস করা যায় না।

দীপচাঁদজী নিজেই বললেন, পোরদিন অফিসে এসেই সোক্কোলকে পাঁচ পাঁচ রুপীয়া করে মাহিনা বাড়িয়ে দিলাম।

কোলকাতা ছেড়ে এসে নতুন জায়গাতে প্রথম রাত ভালো ঘুম হয় না অবনীমোহনের, যেমন হয় না ট্রেনেও।

ব্রজ চলে যাবার পরে আরও একটা সিগারেট শেষ করে ঘরের আলো নিভিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে পড়লেন বটে কিন্তু ঘুম আসছিল না। তখনো নিচ থেকে দু'টি একটি সাইকেল-রিকশা যাবার শব্দ আসছিল। দ্রুত বেগে চলে-যাওয়া সাইকেলের ক্রিং ক্রিং। ঘণ্টার প্রথম আওয়াজটা থেকে দ্বিতীয় আওয়াজের দূরত্বই বুঝিয়ে দিচ্ছিল সাইকেলের দ্রুতগামিতা। ডানদিকে পথের

ওপরে দু'টি কুকুর কামড়া-কামড়ি করছে। পথের কুকুরদের গলার স্বরের মধ্যেই তারা যে পাতি এই খবরটা নিহিত আছে। সাধে কি আর যে সে তাদের পেছনে লাথি মারে! লাথি খেয়ে তারা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে, কামড়াবে না যে, এ কথা তাদের নিজেদের মতো ভালো আর কেউই জানে না। এই প্রজন্মের বাঙালিদের অধিকাংশই এই রকম মনোভাবসম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে। মানে পশ্চিমবাংলার বাঙালি বাঙালি হিসেবে এক সময়ে গর্ববোধ করতেন, আজও করতে পারলে খুশি হতেন, কিন্তু করতে পারেন না।

অবনীমোহন ব্যাচেলার বলেই দেশ ও দশের ভাবনা এখনও ভাবেন। একটু অবসর পেলেই। সংসারী হলে, স্ত্রী ছেলেমেয়ের ভাবনা ভেবেই বোধহয় দিন কাটত। স্ত্রীর পাশে শুয়ে সাংসারিক নানা তুচ্ছ কথা শুনতে শুনতে প্রায় দিনের পর দিন সেই কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি করতে করতে মানুষ হিসেবেও একজন সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, সংসারে নিমজ্জিত গৃহী হয়ে যেতেন হয়তো। নিজের ছোট সুখ, নিজের ভবিষ্যৎ, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ, স্ত্রীর মেনোপজ-জনিত মানসিক অবসাদ, মেয়ের প্রেমিকের রহস্যময় ব্যবহার, ছেলের মদ বা গাঁজা খাওয়া ইত্যাদি নানা Mundane চিন্তাতে নিমজ্জিত হতেন। অন্য একজন মানুষের সঙ্গে, তা তিনি সুন্দর স্তনসম্পন্না এবং সুগন্ধি তেল মাখা বা হ্যানড ও ফেস লোশান মাখা স্ত্রী বা অন্য নারীই হন না কেন, সমস্ত রাত শুয়ে থাকা একই খাটে, তাও একরাত নয়, রাতের পর রাত, বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি রাত দিন কী করে যে সম্ভব হতো তা কে জানে! তেমনি একজন বিবাহিতা নারীই বা কী করে সহ্য করেন একই পুরুষকে এরকমভাবে পাশে শুয়ে থাকতে? রাতে তার পাজামা উঠে যায়, লুঙ্গি উঠে যায়, অনেক সময়ে খুলেও যায়, তার নাক ডাকার আওয়াজ, তার নাকের আর বগলের বিচ্ছিরি চুল নিয়ে মানুষটা শুয়োরের মতো হাঁসফাঁস করতে থাকে। সত্যি কী করে পারে!

কোনো নারী দাঁত না মেজে, চুল না বেঁধে, ভুরু না টেনে, চোখে কাজল অথবা সুর্মা না দিয়ে তাঁর পাশে শুয়ে আছে সাতসকালে এমন ভাবনাও তাঁর মধ্যে বমি-বমি ভাব জাগায়। কত মহিলার গায়ে এবং উরুতেও বড় বড় লোম হয়। কতজনের আবার গোঁফ হয়। না, না অমন ভাবনাও তার মতো জন্ম-রোমান্টিক মানুষকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করতে পারে। মেয়েরা, অবনীমোহনের মতে, স্বর্গের পরী, জান্নাতের হুরী। তাদের তিনি তেমনি দেখতে চান। দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টাই।

আর মুসলমান মেয়েরা! যারা নোংরা সহ্য করতে পারে না, নোংরার মধ্যে

থাকে বলে শুয়োরকে যাদের ধর্মে হারাম আখ্যা দেয়া হয়েছে, সেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশ্বাসী মুসলমান মেয়েরাই বা কী করে ঐ সব হারাম পুরুষ পাশে নিয়ে রাতের পর রাত শুয়ে থাকেন কে জানে!

অনেক কথাই আছে, যা অবনীভাবে জানেন না এবং জীবনের দুই তৃতীয়াংশ কাটিয়ে এসে আর জানতেও চান না।

বেশ আছেন অবনীবাবু। চমৎকার আছেন। এই প্রকার জীবনেই তিনি বহুদিন হলো অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এখন দোকার কথা ভাবতে পর্যন্ত ভয় করে। উনি ব্যাচেলর রইলেন কেন? তা নিয়ে কত লোকে যে কত জল্পনা-কল্পনা করে ওঁর সম্বন্ধে ওঁর চেয়ে বেশি জানেন পৃথিবীর সকলেই। উনি হাসেন আর বলেন, 'A bachelor is a Souvenir of a woman who had found a better one at the last moment.'

নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অবনীবাবু তা তিনি নিজেও জানেন না।

শরতের সকাল। অবনীবাবুদের রংপুরের ধাপ-এর বাড়ির উঠোন থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে আজ নির্মেঘ নীল আকাশে, জলপাই গাছটার পাশ দিয়ে। আলুক্ষেতের পরে যে পুকুর তার পারের শিমুল গাছে পাতা ঝরতে শুরু করেছে। তিস্তার শাখা নদ ঘোঘট নদী থেকে বেরিয়ে আসা ক্যানেলের জলের তোড় বর্ষার পরে অনেক কমে গেছে। বড়দাদা আর অবনীবাবু সকলে পুকুর পাড়ে বসেছিলেন সকালের খাওয়া দাওয়ার পরে। সকালের খাওয়া বলতে ক্ষেতের সুগন্ধি চালের ফেনা ভাত। ফুলমণি গাইয়ের দুধের সর-তোলা ঘি, ক্ষেতের নতুন লাল লাল খোসা ছাড়ানো ধবধবে আলু সেদ্ধ, হাঁসের ডিম সেদ্ধ আর কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে জম্পেস করে মেখে খাওয়া। বড়দাদা আবৃত্তি করলেন, 'এসেছে শরত হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে'। একটা লাল-সাদা গো-বক উড়ে এল ঘোঘটের ক্যানেল পেরিয়ে।

অবনীবাবু বললেন, যাই আমি।

কোথায় যাবি?

তাঁর পিসতুতো দাদা বেলু শুধোলেন।

যাই একটু হরিসভার মাঠে। পুটু আসবে বলেছিল।

বেলুদা অবনীবাবুর চেয়ে অনেকেই বড়। অল্পবয়সীদের মধ্যে গল্প জমে না।

বেলুদা বললেন, যাবি? তো যা।

হরিসভার মাঠে এসে দেখলেন পুটু আসেনি। হরিসভাতে যাওয়ার পথটা ছিল সুধীন কাকুদের বাড়ির সামনে দিয়ে হাতির শুঁড়ের মতো ধার দুটো'র মধ্যে লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ি— পুকুরের দিকে মুখ করা লাল মাটির রাস্তার এপারে। এটাই ছিল প্রধান প্রবেশদ্বার কিন্তু সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে সেগুনের কারুকার্য করা দরজা সেটাকে খোলা দেখেননি অবনীমোহন কখনও। একটা লটকা গাছের নিচ দিয়ে বার-বাড়ির বাঁ দিকে ঘুরে পেছন দিয়ে যেতে হতো সুধীনকাকুর বাড়িতে। সুধীনকাকাদের বাড়িটা ছিল আদ্যোপান্ত পাকা গাঁথনির বাড়ি। মস্ত উঠোন। আম জাম কাঁঠাল লিচু, গোলাপ জাম, পেয়ারা, চালতা, কামরাঙ্গা, কত কী ফলের গাছ। আর ছিল মাঝারি মাপের একটা পুকুর। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে তো! খাওয়ার জলের জন্য অবশ্য ছিল কুয়ো। রংপুরে মানুষেরা বলতেন ইঁদারা।

দেশ যখন ভাগ হয়ে গেল, সুধীনকাকুরা চলে গেলেন বেনারস না কোথায় যেন। তখন বিনুকাকু ঐ বাড়িতে থাকত পড়াশুনার বাহানা নিয়ে। উনিশবার না হলেও বহুবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন বিনুকাকু। বিনুকাকু পুকুরে ডুব দিয়ে এসে কখনো গামছা তোয়ালে ব্যবহার করতেন না। লম্বা লম্বা চুল থেকে, নাকের ডগা থেকে টপটপ করে জল গড়াত। মনে আছে। অবনীমোহনের মা বলতেন, এ কী জংলীপনা!

বিনুকাকুকে খুব পছন্দ ছিল অবনীমোহনের, কারণ বিনুকাকু বড়ি থ্রো দিয়ে বদু মিঞার বা রঙ্গলাল দাদুদের পাঁঠা আর ছাগল ধরতে পারত, যখন তারা নির্জন দুপুরে হরিসভার পুকুরপাড়ে চলে বেড়াত। বদু মিঞা পাঁঠা পুষতেন ঈদে জবাই করবেন বলে আর রঙ্গলাল দাদু ছাগল পুষতন তার কোলকাতা থেকে আসা "ডেলিকেট" নাতি-নাতনিরা গরমের ছুটিতে বেড়াতে এসে গোগ্রাসে গোলা-কাঁঠাল গিলে বেদম পাই করে করে যখন মরে যাবার উপক্রম হতো— তখন তাদের ছাগলের দুধ খাওয়াবার জন্যে পুষতেন তিনি ছাগল।

পাঁঠা হলে ভালো, নইলে ছাগলই সই। কেটে ফেলার পরে আর দেখছে কে? স্বাদে যদিও ফারাক হতো। ক্যানেলের পারের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কেটে-কুটে বাড়িবাড়ি ভাগা হিসেবে সস্তাতে বিক্রি করে দিত বিনকাকুরা। মিথ্যে বলত সকলকে, বলত, বাজারের প্যানা কসাই-এর কাছ থেকে সস্তায় ম্যানেজ করেছে।

মুসলমানেরা অবশ্য কেউই কিনতেন না। তাঁরা হালাল না করে মাংস খান না।

হরিসভার পুকুর আর হরিসভার মাঝখানে যে মস্ত কদমগাছটা ছিল, বর্ষাকালে যার নিচে হলুদ বলের মতো নরম গোল গোল কদম ফুল পড়ে থাকত সেই কদমতলাতে রাতের বেলা রাধা-কৃষ্ণ নাকি খেলা করতেন। পুটু একদিন নাকি দেখেছিল। অবনীবাবু সন্দেহ প্রকাশ করাতে পুটু বলতো, 'আমার নুরুন্নেসার দিব্যি'। পুটুটা নম্বরী গুলেড়ু ছিল ঐ বয়সেই।

পুটুর তখন বয়স হবে সাত-আট আর হামুদু মিঞার ছোট মেয়ে নুরুন্নেসার পাঁচ ছয়। নথ-পরা নুরুন্নেসার নাক দিয়ে সবসময়ে সিকনি গড়াত বলে অবনীমোহন তাকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু পুটু বলতো ঠাকুর বলেন, 'যাকে দেখে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।' হাড়ি ডোম না হলেও মুসলমান তো বটেই! ফুটুদের বাড়িতে ঐ সব প্রবাদ ট্রবাদের চল ছিল কিন্তু অবনীমোহনের বাবা একদিন বলেছিলেন, "আমার অবু যাকে পছন্দ করবে তার সঙ্গেই বিয়ে দেব আমি। জাত-ফাত আমি মানি না। কোনো শিক্ষিত মানুষেরই তা মানা উচিত নয়।"

পুটুকে না দেখতে পেয়ে অবনীমোহন যখন স্বপ্নে হেঁটে হেঁটে বুলবুলিদের বাড়ির দিকে চলেছেন ঠিক সেই সময়েই দরজাতে ধাক্কা দিয়ে নকুল বলল, বাবু চা।

তার দেশের স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আচমকা ঘুম ভাঙানোতে একটু বিরক্তও হলেন উনি। তার অ্যানজোপ্লাস্টি হয়েছে একবার বছর পাঁচেক আগে। বুকটা মাঝে মাঝেই ব্যথা করে। কিন্তু বারবার নর্দমা পরিষ্কার করানোতে তাঁর অশেষ অনীহা। আবার কোন ভ্যাবল সেন-এর পাল্লাতে গিয়ে পড়বেন সেই আতঙ্কেই আর যান না। কোলকাতার অধিকাংশ ডাক্তারে আর রংপুরের বাজারের প্যানা কসাইতে বিশেষ তফাত নেই। টাকা নষ্ট হয়, সে জন্যে ততটা নয়, যতটা শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত অন্য পেশার মানুষদের এই ধরনের ডাক্তারেরা মুরগি বানায় সে জন্যে। বাংলাদেশি অগণ্য মানুষ প্রতিবছর এদের হাতে মরে ধন্য হবার জন্যে যে কেন আহাম্মকের মতো প্রতিবছর আসেন তা তারাই জানেন। শুধু কি ডাক্তারই? ইন্ডিয়া আর ইউরেকাতে কোনো তফাত নেই। কী বাইপাস বা প্রস্টেট গ্লান্ড অপারেশন বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম সবই কোলকাতাতে অনেকেই ভালো হয় বলে ওঁদের ধারণা। কলিম শরাফি থাকতে তাঁরা ধেয়ে ধেয়ে কোলকাতা বা শান্তিনিকেতনের তাবড় তাবড় 'গুরুদের' কাছে কেন যে দৌড়ে আসেন তা তাঁরাই বলতে পারবেন। তাও গুরু যদি কেউ থেকে থাকতেন! সুবিনয় রায় এখনও বেঁচে আছেন, সুভাষ চৌধুরীদের মতো কতিপয় মানুষ কোলকাতাতে। নীলিমা সেন

ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনে তো গুরুদের প্রাধান্য নেই আর। শুধুই গরুদের। এক সময়ে স্বাধীন ভারতবাসীর, বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের যেমন 'ফোরেন' ম্যানিয়া ছিল, হাওয়াই চপ্পল থেকে ব্রেসিয়ার— ফোরেন হলেই লাজোয়াব এমনই ধারণা ছিল এখনও স্বাধীন বাংলাদেশিদের অনেকের কাছে 'ইন্ডিয়ান' হলেই হলো। এই কোলকাতার সব পিজঁরাপোল এ যে কী করতে আসেন ওঁরা হালাল হতে তা ওরাই জানেন।

চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন অবনীবাবু, চিনি দিয়েছ ক'চামচ? ব্রজ কি চিনির কল খুলেছে নাকি? নিয়ে যাও। দুধ চিনি ছাড়া এক কাপ লিকার নিয়ে এসো। আর সাত সকালে এতো মিষ্টি কেন? একটু মুড়ি আর দু'কোয়া রসুন নিয়ে এসো। সকালে আমি এই খাই।

ঠিক আছে। বলে নকুল ওগুলো তুলে নিল।

অবনীমোহন বললেন, ব্রজ যে বলল, চা দুধ চিনি সব আলাদা করে দিতে। তাই? আমাকে তো বলেন নাই বাবু। ও সব কায়দাতো দেখাই যখন হাকিমেরা আসেন।

হাকিমেরা মানে?

মানে, হুজুরেরা।

মানে?

মানে ইনকাম-ট্যাক্স সেলস-ট্যাক্স অফিসারেরা। তেনারা বাইরের লোক। ঘরের লোকদের তো বানিয়েই দি।

আমি হুজুর বা হাকিম নই, তবু আমাকে বাইরের লোক হিসেবেই ধর নকুল।

জি আজ্ঞে।

নকুল জি এবং আজ্ঞেটা একই সঙ্গে বলল কেন কে জানে।

নকুল ফিরতে সে কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, বাবুর টেরেনিংই আলাদা। বাবু বলেন, আজকাল কোন হাকিম বামুন, কে বৈষ্ণব কে নমোশুদ্দুর আর কে মোসলমান বাইরে থেকে বোঝার কি জো আছে! তুই যেই আসুন না কেন জি আজ্ঞে বলবি।

অবনীমোহন মৃদু হাস্য করলেন।

ভাবলেন, ব্রজকে যা যা শেখাতে চেয়েছিলেন সিনিয়র পার্টনার হিসেবে, তার কিছুই শিখল না, শিখল কেবল রুগী-মারা ভ্যাবল সেনদের মতো মক্কেল মেরে রোজগার করতে আর 'ম্যানেজ' করতে। লজ্জা হলো অবনীমোহনের।

বুঝলেন, শুধুমাত্র ডাক্তারি জগতেই ভ্যাবল সেনরা নয়, ওকালতি, অ্যাকাউন্টেসি সব জগতেই তাঁরা বেশ পরিমাণেই আছেন। কোনো একটি পেশার মানুষকে দোষ দেওয়া বোধহয় ঠিক নয়। এখন পকেটমারদেরই দিন। এ সব পেশার কথা না হয় ছেড়েই দিল, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক তারাই বা কম যায় কীসে! Bad Money drives away Good Money. অর্থনীতির এই Maxim এখন জীবনের সব ক্ষেত্রে লাগু হয়েছে।

সন্ধের পরে চান টান সেরে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে দোলার বারান্দাতে পাখার নিচে অবনীমোহন বসলেন। সিগারেট ধরালেন একটা। এমন সময়ে ব্রজ এসে বললেন, প্ল্যানটা একটু বদলাতে হচ্ছে দাদা।

কী রকম?

না, আমার দাদা ফোন করেছিলেন। বললেন, দাদার বাড়িতেই আমাদের যেতে। কারণ মেহমানেরা কোথায় কোথায় যেন ঘুরতে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে। ফিরে চান টান করে আমার এখানে আসতে দেরি হয়ে যাবে। তাই চলুন আমরাই গিয়ে পৌঁছই ওখানে। হট কেস এ করে যা রান্না হয়েছে নিয়ে যাই। ওখানেও বৌদি নিশ্চয়ই কোনো স্পেশ্যাল ডিশ করেছেন।

বলেই বলল, আপনি তাহেরি খেয়েছেন কখনও?

তাহেরি! না তো।

বৌদি সম্ভবত তাহেরি বেঁধেছেন। তাহেরি একরকমের উমদা পুলাও। মুর্শিদকুলি খাঁ এর ঘরানার খানা এ। যাই বল তাই বল, খানাপিনাতে এঁদের জুড়ি নেই।

যেমন বলবে তুমি ব্রজ। দুপুরে যা গাণ্ডে-পিণ্ডে খাইয়েছে, খিদেই তো নেই। তবে একটু দেরিও করতে চাই না, কাল তো ছেলেদের সকাল আটটাতে আসতে বললে।

হ্যাঁ দাদা। নইলে নিরুপায়। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সেস এর চেয়ারম্যানকে বলে রিটার্ন আর ট্যাক্স-অডিট রিপোর্ট জমা দেবার তারিখ সম্বন্ধে একটু শৈথিল্য ঘটানো যায় না? মক্কেলগুলো যে মরে যাবে। এই রকম বন্যা তো রোজ হয় না। লোকে প্রাণ বাঁচাবে না ট্যাক্স অডিট করাবে।

অবনীমোহন বললেন, দেখি, চেয়ারম্যানের তো আসার কথা আছে আয়কর-বিভাগে ভয়েসমেইল ইনট্রডুস করার জন্যে নভেম্বরের গোড়াতে।

যদি আসেন, তাহলে একটু ডেপুটেশন দেওয়া যায়।

তাই করেন দাদা। নইলে যে প্রাণ যায়।

একটু চুপ করে অবনীমোহন বললেন, তোমার দাদার বাড়ি যেতে কতক্ষণ লাগবে?

বেশিক্ষণ লাগবে না। গ্রান্ট হল রোড-এ।

মানে, যে পথ দিয়ে হাইওয়েতে পড়তে হয়?

আজকাল হাইওয়েতে ওঠার কত রাস্তা হয়ে গেছে।

তা নয়, আমি বলছি ঐ পথের থেকেই না এক কালীমন্দিরের পথ বেরিয়ে গেছে? জাগ্রত কালী? যেখানে প্রতি রাতে পুরোহিতেরা শিবাভোগ দেন। সেটা আবার কী জিনিস? এত বছর বহরমপুরে রয়েছি ঐ কালীর কথাতো শুনি নি কখনোও।

তুমি তো শুধু কারণ-বারিরই খোঁজ রাখো, মা কালীর খবরে তোমার দরকার কী।

শিবা মানে কী দাদা?

শিবা একটি সংস্কৃত শব্দ।

সংস্কৃত শব্দ? মানে কী?

মানে, শিয়াল।

আর শিবাভোগ মানে?

মায়ের পুজো শেষ হলে শেয়ালদের জন্যে ঝোপ-ঝাড় ভরা মাঠের মধ্যে প্রসাদ রেখে আসেন পুরোহিতেরা। শিয়ালদের ভোগ খাওয়ানো হয় বলেই শিবাভোগ।

দুসস শালা। এর পরের জন্মে শেয়াল হয়েই জন্মাব। দু'তিন পাত্তর রাম মেরে অন্ধকারে বসে থাকব ঝোপের মধ্যে। তারপর পেসাদ দিলে, সাঁটিয়ে দেব।

অবনীবাবু বললেন, তুমি যে বলছিলে বাংলাদেশে আরবি ভাষার রমরমা তা এখানেও দেখি সংস্কৃত ভাষার রমরমা।

তোমাকে বলেছে!

মানে!

সংস্কৃত তো দেশ থেকে উঠেই গেছে। আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়েতে এক ব্যাটা পুরুত ...

পুরুত ঠাকুরকে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কি উচিত?

আরে আসল পুরুত হলেও না কথা ছিল। ঘোষ-বাঁড়ুজ্যে সি. এ. ফার্মের

লেজার-কিপার হরিপদ। পদবি ভট্টাচার্যি ঠিকই, ফরিদপুরে অনেক পুরুষের পুরুতগিরিই করতেন তাদের পরিবার। যজমানও ছিল প্রচুর। কিন্তু পার্টিশন হওয়াতে রেফ্যুজি হয়ে এসে পেটের দায়ে যার যেমন জীবিকা জুটেছে তাই নিয়েই কোনোক্রমে দিন গুজরান করতে হয়েছে। এ পুরুত পোস্ট-পার্টিশান পশ্চিবাংলার। সেকেন্ডে জেনারেশনের। এ পুরুতের বাবা মোটর মেকানিকের কাজ করতেন ভবানীপুরের শ্যামাপদ ঢালির মোটর-রিপেয়ারিং গারাজে.....

তা কী বলছিলে বল না ভায়া, সে ব্যাটা মুহুরি পুরুত কী করল তাই তো বললে না।

হ্যাঁ। এন্ডির চাদর আর ধুতি পরে পৈতেখানা ঘষে-মেজে, আগের দিন রাতে ভালো করে 'পুরোহিত দর্পণ' পড়ে নিয়ে বিয়ে দিতে এসেছিল। কিন্তু আগের রাতে প্রচণ্ড লোড-শেডিং থাকায় ভুলক্রমে বিয়ের বদলে শ্রাদ্ধর মন্ত্র পড়ে এসেছিল। অনেক সময় হয় না, পড়ে গেল গরুর প্রবন্ধ পরীক্ষার আগের রাতে, কোশ্চেন পেপারে এল বটগাছ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ। আর কী! তারপর?

তারপর আর কী? মাগগে বাঁশ। ফলে, যা হবার তাই হয়ে গেল।

ঈতো হাইলি ডেঞ্জারাস কাণ্ড-মাণ্ড দেখি।

তা না হলে আর বলছি কী?

তারপর?

সেই খুড়তুতো ভাই আর তার লাভ-ম্যারেজ করা বউ এমনি লাঠালাঠি মারামারি করছেন বিয়ের পরদিন থেকেই যে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না আপনি!

তা হবে না? বিয়ের মন্ত্রর জায়গায় যদি শ্রাদ্ধর মন্ত্র পড়া হয় তবে তো এরকম হবেই। ঠেকাবেটা কে?

অবনীমোহন হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, গল্প করার মতো গল্পই শোনালে ভায়া, কিন্তু গুল নয় তো?

আরে না না, গুল নয়। এ এক করুণ গল্প।

তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে অবনীমোহন বললেন, হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করায় মুসলমানদের ফারসি থেকে বিচ্ছিন্ন করায় সার্বিক ভারতীয়ত্বর যা ক্ষতি হয়ে গেল তা আর বলার নয়।

এটা আপনি ঠিকই বলেছেন দাদা। বাবা-জ্যাঠাদের কাছে শুনেছি যে আগেকার দিনে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই ফারসি আরবি জানতেন আবার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও অনেকেই ভালো সংস্কৃত জানতেন।

এইভাবেই ভাষার মাধ্যমে আমাদের সকলের মধ্যে এক মেলবন্ধন ঘটে গেছিল। অজানিতে আমরা সকলেই তখন ভারতীয়ত্বে সম্পৃক্ত হয়েছিলাম আমাদের পুরো দেশের নৃত্য, গীত, কাব্য, সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা সব কিছুই চর্চিত হতো এইসব ভাষায়ই। ব্যাটা ইংরেজরা এসে আমাদের ভারতীয়ত্বর গোড়াতে মারল কোপ। তারপর তো আধা সাহেব নেহরু আর জিন্না এসে 'ড্যাডি! ড্যাডি! ছাপ্পর পর Pigeon বৈঠে বৈঠে' সংস্কৃতি চালু করে দিলেন।

যা বলেছ! আজও জার্মানিতে সংস্কৃতর যে চর্চা আছে তার ছিটেফোঁটাও ভারতে নেই। সত্যিই এটা ভীষণই দুঃখের কথা।

নেহরু আর জিন্নাকে আধা-সাহেব বলছ কেন? আধা সাহেব নয়? ব্যারিস্টার মতিলাল নেহরুর ছেলে ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুল এ পড়া ব্যারিস্টার জওহরলাল বা তাঁর কন্যা কতখানি ভারতীয় ছিলেন? জিন্না সাহেব তো একটিও ভারতীয় ভাষাই বলতে পর্যন্ত পারতেন না। ইংরেজিতে তুখোড় ছিলেন। এইসব নেতাদের কাছ থেকে আপনি কী করে আশা করেন যে তাঁরা একজন সাধারণ ভারতীয়র দুঃখ-কষ্ট বুঝবেন। ভারতীয়ত্বে সম্পৃক্ত হবেন? আমাদের নেতাদের ছেলে-মেয়েরা তো প্রায় সকলেই ইংল্যান্ড-আমেরিকাতেই পড়ে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী, বিজু পট্টনায়েকের ছেলে নবীন পট্টনায়েক ওড়িয়া লিখতে-পড়তে তো, দূরস্থান, বলতে পর্যন্ত পারেন না। বাবার মৃত্যুর পরে দেশে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন। রাজ্যের মানুষ তাঁকেই ভোট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বানালেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও গণতন্ত্রের চেহারাটা চেনা যাচ্ছে কি? নাম যাই হোক, রাজার ছেলে রাজা, সে মরলে তার ছেলেও রাজা। আসল সামন্ততন্ত্রকে বিলোপ করে আমরা নকল সামন্ততন্ত্র কায়েম করেছি করছি।

আরে আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরে কী দরকার।

আজকাল আদা উড়োজাহাজে যায়। দিনকাল প্রেক্ষিত সব বদলে গেছে দাদা। তখনও দরকার পড়ত, এখনও পড়ে। পঞ্চাশ বছরে দেশে ভালো স্কুল-কলেজ হলো না কেন? জ্যোতিবাবুকে প্রতিবছর ইংল্যান্ডে যেতে হয় বিশ্রাম এবং চেক্-আপ এর জন্যে। কেন? তিনি নাকি জন-দরদি সরকারের প্রতিভূ? কই মুজিবুর রহমান তো তাঁর মেয়েকে বিদেশে পড়তে পাঠাননি? তাঁর কন্যা কি অশিক্ষিত রয়ে গেছেন? বিলেত আমেরিকাতে না গেলে মানুষ বুঝি মনুষ্যপদবাচ্য হয় না?

থাক থাক। এবারে চল ব্রজমোহন। তোমার দাদা-বৌদির সঙ্গেও বহুদিন দেখা হয়নি। মেহমানরা আসার আগে আমরা একটু গল্প করব বরং। চলো,

তা নয় কী সব ভ্যাজারং ভ্যাজারং।

চলুন। এইসব আলোচনার দরকার। নইলে খাওয়াটা জমবে কী করে!

ব্রজ বললেন।

ব্রজও গিয়ে গোপেন বাবুর বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে একটি সাদা রঙা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি এসে দাঁড়াল গেটে।

ব্রজ বললেন, আদাব করিম সাহেব।

আদাব।

এই যে আমার সিনিয়র পার্টনার অবনীমোহন রায়।

অবনী বললেন, সালাম ওয়ালেকুম।

ওয়ালেকুম আসসালাম। এই যে আমার বেটার-হাফ উদামা।

মহিলা একটি আকাশি নীল রঙা ঢাকাই শাড়ি পরেছিলেন, মধ্যে সাদা ফুলের কাজ। কী সুগন্ধি মেখেছিলেন অবনীমোহন বুঝতে পারলেন না। নিজে আতর ব্যবহার করেন তাই পশ্চিমী পারফ্যুমের নাম ধাম জানেন না। মেয়েদের পারফ্যুমের তো জানেনই না। কিন্তু সেই ফারফ্যুমের গন্ধ হ্যালোজেন ভেপার ল্যাম্পের স্বপ্নিল আলোতে একঝলক মাদকতা এনে দিল। অবনী বললেন, আদাব।

মিঞা হোসেন-উর রফিক সাহেবকে চেনা বলে মনে হলো না ওঁর। কিন্তু উদামা বিবির গলার স্বর যেন হঠাৎ কী মনে পড়িয়ে দিল। কোনো চেনা ফুলের গন্ধ উড়ে এল যেন রাতের হাওয়ায় দূর থেকে।

তাঁর ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে ব্রজ বললেন, চলুন চলুন, ভেতরে যাই।

চলেন।

হোসর-উর রফিক বললেন।

ইতিমধ্যে, দুটি গাড়ির আওয়াজ শুনে ব্রজর দাদা গোপেন্দ্রমোহন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। অবনীমোহনকে অনুযোগ করে বললেন, ভাগ্যিস মুর্শিদাবাদ জেলাতে বন্যা হয়েছিল নইলে কি আর আপনার দেখা পেতাম!

অবনী বললেন, কত যে ঝামেলাতে থাকি কী বলব। নইলে কার না ইচ্ছে করে আসতে! কতদিন যে ভেবেছি বহরমপুরে বেশ ক'দিন কাটিয়ে যাব নিরিবিলিতে।

নিরিবিলি এখন জিন্নাতুল ফিরদৌসেই নেই অবনীবাবু, নিরিবিলি পাবেন কোথায়?

রফিক সাহেব বললেন।

অবনী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রফিক সাহেবের স্ত্রী বললেন,

নিরিবিলি ব্যাপারটা তো বাইরের ব্যাপার না, মানে পরিবেশের ব্যাপার নয়, অন্তরের ব্যাপার। যিনি অন্তরে নিরিবিলি হতে জানেন তিনি যে-কোনো জায়গাতেই নিরিবিলি। বলেই অবনীর দিকে চেয়ে বললেন, তাই না? চমকে উঠে অবনী বললেন, ঠিক তাই।

গোপেনবাবু অতিথিদের নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দোতলার ড্রয়িংরুমে উঠতে উঠতে বললেন, বেরিয়েছেন তো অনেকক্ষণ, সোজা ডাইনিং টেবিলে যাবেন নাকি? আপনাদের বৌদি তো ছটফট করছেন কখন তাহেরি পরিবেশন করবেন আপনাদের।

তারপর অবনীকে বললেন, আপনি কখন খান অবনীবাবু?

আমি তো একা থাকি, যখন আমার খিদমদ্গার খেতে দেয়, তখনই খাই। সময়ের তেমন কোনো ঠিক নেই।

একা থাকেন কেন? বিয়া শাদি করেন নাই?

রফিক সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

গোপেনবাবু বললেন, আরে অবনীবাবু তো কনফার্মড ব্যাচেলর। নো ঝুট ঝামেলা।

রফিক সাহেব একটু অজ্ঞর মতোই বললেন, ফ্যামিলি না থাকলে, ছেলেমেয়ে না হলে, মানুষের জীবনই বৃথা।

গোপেন বললেন, তা বটে। তবে ঝামেলাও কম নয় বিয়ে করার।

ব্রজ বললেন, অবনী দাদা বলেন, 'A Bachelor is a souvenir of a woman who had found a better one at the last moment.'

তাই?

রফিক সাহেব বললেন, অন্যমনস্ক গলায়।

অবনী প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করছিলেন এই উদামা মহিলা কে? তার সঙ্গে তার কোথাও দেখা হয়েছিল কি আগে? কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। আজকাল এরকমই হয়। বয়স যদিও মোটে পঞ্চাশ হয়েছে কিন্তু মাথাটা একেবারেই গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পাগল হয়ে যাবেন বোধ হয়। অফিসের কাজের কথা মনে থাকে কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো কথাই মনে থাকে না। অ্যালঝাইমার কি এত তাড়াতাড়ি হয় কারও? ডিমেনশিয়া? কে জানে! ডাক্তারদের কাছেও যান না উনি। কারণ, কোলকাতার ডাক্তারদের সম্বন্ধে তাঁর এক গভীর ভীতি জন্মে গেছে। তা ছাড়া মাথার ব্যাপারে তো আরোই যেতে চান না। তাঁরা হয়ত তাকে পাগলাগারদেই ভরে দেবেন।

রফিক সাহেব বললেন, আমি তো রেডিই তবে দুটো পেগ খেলে মন্দ হতো না। রাস্তাঘাটের যা অবস্থা! শরীরের উপরে বড়ই ধকল গেছে। অবনীবাবুর চলে না কি?

যেন গর্হিত অবরাধ করেছেন এমন মুখচোখ করে অবনী বললেন, না, না। আমার চলে না। কিছু মনে করবেন না দয়া করে।

হো হো করে হেসে উঠলেন করিম সাহেব।

হাসি শুনেই মনে হলো মানুষটা দিল-খোলা। মুখে আর মনে কোনো তফাত নেই।

ভাবি বললেন, অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমিও আপনারই দলে।

গোপেন বললেন, বাংলাদেশে মহিলারাও প্রকাশ্যে মদ খান না কি?

রফিক সাহেব বললেন, ওঁদের মধ্যে খুব কমই খান। খেলেও প্রকাশ্যে আদৌ খান না। বাংলাদেশে পর্দা মধ্যপ্রাচ্যের মতো না হলেও আছে অবশ্যই। ইসলামে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা তো পর্দা মানবেনই। তবে আমি কাফির। ধর্মে আর বিশ্বাস নেই। বস্টনে পড়াশুনা করেছি। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। কোনোরকম কুসংস্কারেই আমার বিশ্বাস নেই। তবে আমার বিবি আমার গুণাহ্ সব স্খলন করে দিয়েছেন। পাঁচওয়াক্ত না হলেও তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। এই তো এখনই গিয়ে ঈশার নামাজ পড়বেন ওজু করে। মাগরিব-এর নামাজটা মিস হয়ে গেছে বলে আমার উপরে খুব রাগ।

বলেই বললেন, আপনি কি ঈশ্বর মানেন অবনীবাবু?

ধর্ম-কর্ম, মানে Rituals পালন করি না তেমন করে বটে কিন্তু ঈশ্বর মানি অবশ্যই। বিজ্ঞানের সঙ্গে তো ঈশ্বরের কোনো বিরোধ নেই।

তারপর বললেন, পাকিস্তানের ফিজিসিস্ট নোবেল লরিয়েট আবদুস সালাম সাহেব একবার কোলকাতাতে এসেছিলেন। তাঁর ছাত্র পাইকপাড়ার রাজপরিবারের আণবিক-বিজ্ঞানী ডঃ বিকাশ সিনহা তাঁর বাড়িতে তাঁর সম্মানে আনন্দবাজারের সরকারদের সঙ্গে মিলে এক বিরাট পার্টি দিয়েছিলেন— ককটেইলস অ্যান্ড ডিনারের। উস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ সাহেব সরোদ বাজিয়েছিলেন সেই সন্ধেতে সালাম সাহেবের খাতিরদারিতে। সালাম সাহেবের সঙ্গে সেই রাতেই আলাপের সুযোগ হয়েছিল। ওঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈশ্বর মানেন কি না? উনি বলেছিলেন অবশ্যই মানি। আল্লাকে মানি এবং আল্লা ছাড়া আর কারো কাছেই মাথা নোয়াই না। আমি যদিও সামান্য জন তবু আমিও ঈশ্বর মানি এবং ঈশ্বর ছাড়া কারো কাছেই মাথা নোয়াই না।

মিসেস রফিক বললেন, আপনারা কাজিয়া করুন, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি। গোপেনবাবুর স্ত্রী রমা বললেন, আমি সব গরম করতে বলছি। আপনি আসতে আসতে হয়ে যাবে।

ব্রজ বললেন, এখানেই নিয়ে আসি করিম সাহেব, না কি পাশের ঘরে যাবেন?

গোপেনবাবু বললেন, পাশের ঘরেই চলুন। মেয়ে ফিরবে কোচিং ক্লাস করে। সে আবার ওসব পছন্দ করে না।

রমলা উঠে যেতে যেতে বললেন, পছন্দ তো করি না আমিও। তোমরা দু-ভাই কি তা শোনো?

রফিক সাহেব বললেন, আমিও পছন্দ করতাম না। কিন্তু ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এর ব্যবসা করলে এসব একটু-আধটু না খেলে কি হয়!

এসব বাহানা। স্বরাজ পাল কী জিৎ পাল কী রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা কী সাধন দত্ত না কি শ্রীলেদার্স এর সত্যব্রত দে এক্সপোর্ট এর ব্যবসা করেন না?

আমাদের তো আর ওঁদের মতো এলেম নেই। তাই হয়ত আমাদের করতে হয়।

রমলা বলল, আমি তাহলে রান্নাঘরে যাই?

অবনী বললেন, আসুন। তারপর ব্রজ, ব্রজর দাদা গোপেনবাবু এঁরা করিম সাহেবের সঙ্গে পাশের ঘরে গেলেন। সেলার ঐ ঘরেই।

কী খাবেন আজ রফিক সাহেব?

যা খাওয়াবেন।

একটা সিংগল-মল্ট-হুইস্কি আছে, মাস তিনেক আছে অস্ট্রেলিয়াতে গেছিলাম, নিয়ে এসেছিলাম। আজকে অবনীবাবুর অনারে সেটাই খুলি। কী বলেন? অবনীবাবু হাসলেন। বললেন, আমি কিন্তু সোডার মধ্যে এক ফোঁটা অ্যাঙ্গুস্টুরা বিটার্স ফেলে খাব। এইটা কোলকাতার টুটু বোস-এর স্টান্ট।

কেন? উনি খান না?

একসময় খেতেন। ডায়াবেটিস হয়েছে তাই লোক-ঠকাবার জন্যে এই রকম করেন। রঙটাও হুইস্কির মতোই হয়।

বাবাঃ জানেন তো দেখি সবই।

জানলে ক্ষতি কী?

সিংগল মল্ট-এর বোতলটা সেলার থেকে বের করে দিলেন গোপেনবাবু। ব্রজ ড্রিঙ্কস তৈরি করতে লাগল। করিম সাহেব, আপনায় তো একটু সোডা একটু জল এবং বরফ্, চার কিউব, তাই না?

রাইট। মুখস্ত করে রেখেছেন দেখছি।

অবনী লক্ষ করলেন যে রফিক সাহেবের গলাতে পূর্ববঙ্গীয় টান এখনোও আছে। পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা বললেও অ্যাকসেন্ট-এ বোঝা যায় অরিজিন।

ব্রজ বললেন, কাল যে বললেন অবনীদা আপনাদের দ্যাশের লোক?

রফিক সাহেব বললেন, দ্যাশের লোক তো অবশ্যই। কিন্তু আমার নয়, আমার বিবির, উদামার।

অবনী অবাক হয়ে বললেন, ওঁদের দেশ কোথায় ছিল?

রংপুর।

রংপুর? রংপুর জেলাতে? না কি রংপুর শহরেই?

শহরেই।

কোন পাড়ায়?

ধাপ-এ।

ধাপ-এ। আমাদের বাড়িও তো ছিল ধাপ-এই।

নইলে আর 'দ্যাশের লোক' হয় সে ক্যামনে?

ভাবির বাবার নাম আছিল কি?

অবনীমোহন উত্তেজিত গলাতে বললেন।

জনাব সিরাজউদ্দিল হক। তার বাবার নাম আছিল গিয়া জনাব বদরুদ্দিন হক।

চকিতে অবনীমোহনের মাথার মধ্যে ফ্ল্যাশবাল্ব জ্বলে উঠল। যে বদু মিঞার বকরি চিনুকাকু বডিগ্রো দিয়ে ধরতো সুনসান দুপুরে সেই বদু মিঞারই নাতনি এই উদামা নাম্নী মহিলা! কিন্তু উদামা বলে তো কারোকে অবনীমোহন চিনতেন না। এত সুন্দরী সপ্রতিভ কারোকেও নয়। তার খেলার সাথী ছিল বুলবুলি পাগলি আর পুঁটু আর রোজী। আমিনাই ছিল জনাব বদরুদ্দিনের বড় নাতনি। তার পরের বোনের নাম ছিল মিনু। একদিন হাসান। হুসেন হাসান। হুসেন করতে করতে যখন তাঞ্জাম যাচ্ছিল তখন মিনুর সঙ্গে খুব ঝগড়া হওয়াতে মিনুর কান কামড়ে দিয়েছিল পুঁটু। সে জন্যে পুঁটুকে খুব মেরেছিলেন অবনী। প্রেম কাকে বলে তা জানতেন না অবু তখন, তার পরেও যে কখনো জেনেছেন তা বলা যায় না যদিও অনেক নারীর সান্নিধ্যেই তিনি এসেছেন এ জীবনে কিন্তু মিনুর কথা ভোলা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

এই কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাবে হয়ত অনেকেরই কাছে কিন্তু কথাটা সত্যি। কত কথাই যে মনে ভিড় করে আসছিল অবনীর। আশ্চর্য! দশ বছর বয়স

অবধি জীবনে যা কিছুই ঘটেছিল, যাদের কাছাকাছি এসেছিলেন, সেইসব পরিবেশ, প্রতিবেশ, অনুষঙ্গ, মানুষজনের কথা, মেঘলা দুপুর আর শীতের বিকেল আর বসন্তের সকালবেলাগুলোর জীবন্ত রূপ তাদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ আর শব্দের ঝুমঝুমি বাজাতে বাজাতে সর্বাঙ্গ অবশ করে ফিরে আসে। ঠাকুমা, বড়কাকু, সেজকাকু, ছোটকাকু, কাকিমা, নির্মলকাকু, এবং বাবাও যেন জীবন্ত হয়ে ফিরে আসেন। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয় যে তাঁরা আজ আর কেউই নেই।

রংপুরের অনুষঙ্গে বাবার স্মৃতি অবশ্য স্পষ্ট নয় কারণ বাবা রংপুরে খুব কমই আসতে পারতেন কোলকাতার সরকারি চাকরি ছেড়ে। একবারের কথা মনে আছে। ঢেঁকি ঘরের পাশের গোয়ালঘরের মধ্যে ফুলমণি এবং অন্যান্য গরুরা যেখানে থাকত সেই গোয়ালঘরে একজোড়া গোখরো সাপ এসে ফুলমণির পায়ে বেড় দিয়ে সব দুধ খেয়ে যেত। বাবা এসে সে কথা শুনে আলুখেতের মধ্যের ইঁদুরের গর্ত, যার মধ্যে সাপেরা থাকত, খুঁড়িয়ে ছিলেন। প্রায় পাঁচশ গজ মতো খোঁড়া যখন হয়েছে তখন বাবা একটা মোড়া নিয়ে গরুর ঘরের মধ্যে বন্দুক হাতে বসে থাকলেন। আলুখেতের দিক থেকে তাড়া খেয়ে সাপ দুটো গোয়ালঘরের মধ্যে একের পর এক ফণা তুলে বেরোতেই বন্দুকের এক এক গুলিতে বাবা তাদের ধরাশায়ী করলেন।

আরেকবারের কথা মনে আছে। বাবা সাইকেলের রড-এ অবনীকে বসিয়ে তাজাহাটের হাটে নিয়ে গেছিলেন। বাবার কলেজ, কারমাইকেল কলেজ দেখিয়েছিলেন। তারপর ছটি হাঁসা আর হাঁসীকে কিনে পায়ে দড়ি বেঁধে সাইকেলের স্টিয়ারিং রড-এর সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ধাপ-এর বাড়িতে। হাঁসগুলো পা ওপরে মাথা নিচু করে এতক্ষণ ঝুলতে থাকাতে ওদের মাথাতে নিশ্চয়ই রক্ত উঠে গেছিল। তাই বাড়ি ফেরার পরে হাঁদারা পাড়ে নিয়ে গিয়ে ওদের মাথাতে অনেক জল ঢেলেছিলেন মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে। শিশু অবনী।

সেইবারে যে হাঁসগুলিকে কিনেছিলেন বাবা তার মধ্যে দুধ সাদা একটা হাঁসী ছিল। অবনী তার নাম রেখেছিলেন দুধলি। ভোরের আলো ফুটতেই হাঁসের ঘর থেকে সব হাঁসগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতেন হরিসভার পুকুরপাড়ে। তারা সামনে সামনে চলতো প্যাকা-প্যাঁক প্যাকা-প্যাঁকা করতে করতে। অবনী তাদের জোরে তাড়া দিতেন। তারা হেলতে দুলতে দৌড়তে দৌড়তে পুকুরপাড়ে গিয়ে যখন উঁচু পুকুরপাড় থেকে ডানা ছড়িয়ে ঝুপ্পুস ঝুপ্পুস করে ঝাঁপ দিতো জলে, যখন রোদের মধ্যে ছিটকে-ওঠা জল লক্ষ লক্ষ হীরে হয়ে ঝিকমিক করত ঠিক তখনই সেই হল্লা-গুল্লাতে বিরক্ত হয়ে নদীপাড়ের মাদার গাছের ডালে বসা

একজোড়া নীল-সাদা মাছারাঙা হাঁসেদের খুব জোরে বকে দিত।

একদিন যা কাণ্ড ঘটেছিল এক গরমের দুপুরে তা শুধু অবনীই জানেন। সেই কথা কারোকেই বলা যায়নি। বলেছিলেন শুধু মিনুকে। একমাত্র মিনুকে। তার সবচেয়ে আপন জনকে। মিনু বলেছিল, চোখ বড় বড় করে তার পাজামার দড়ি টাইট করে বাঁধতে বাঁধতে— বলেছিল, বাজে কথা কওনের আর জাগা পাস নাই? তুই কি ফরিস্তা?

ফরিস্তা শব্দটার মানে জানতেন না অবনী। তবে বুঝেছিলেন যে পবিত্র ও অলৌকিক কোনো জন হবেন।

ঘটনাটা ছিল এই। ঝুরিনামা অশ্বত্থগাছের নিচে মোড়ের মুদির দোকান থেকে মায়েরা চায়ের সঙ্গে বিকেলে খাবেন বলে শুকনো লংকা দেওয়া লেড়ো বিস্কুট কিনতে যাচ্ছিলেন অবনী। তখন অকারণ পুলকেই যখন তখন দৌড়তেন। পাখির মতো হালকা ছিল শরীর। ময়ূরের হাড়ের মতো পাতলা ছিল হাড়গোড়। দু'পাশের গাছ-গাছালি ভরা আর ঘুঘু আর বুলবুলি আর দোয়েল ডাকা গাছের মধ্যে দিয়ে সটান চলে যাওয়া পথ দিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে অবনী উড়তে লাগলেন। কতখানি পথ যে উড়ে গেছিলেন। হরিসভার পুকুরের কাছাকাছি এসে মোড়ের আগে ইচ্ছে করে নেমে এসেছিলেন মাটিতে। পাছে কেউ তাঁকে উড়তে দেখে ফেলে।

পুঁটুর মিনুর কান কামড়ানোর জেরে সেদিন হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা লেগে যেতে পারত যদি না অবনী পুঁটুকে বেধড়ক পিটত সঙ্গে সঙ্গে। পারলে ওকে থলের মধ্যে পুরে ঝিকার ডাল দিয়ে পিটত যেমন করে চিনুকাকুরা গোমস্তাপাড়ার নরেন ঘোষকে পিটেছিল পুজোর সময়ে পুঁটুর পিসিকে চোখ-মারার জন্যে। চোখ মারাটা কী জিনিস জানতেন না অবনী কিন্তু চোখ মারার জন্যে এমন করে মারাটা অনুচিত বলেই মনে হয়েছিল অবনীর। বাহ্যত কোনো ক্ষত হয় না নাকি ঝিকার ডাল দিয়ে মারলে কিন্তু শরীরের সব হাড্ডি-গুড্ডি নাকি পরশুরামের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় "পিলপিলাইয়া" যায়। পরশুরামের গড্ডলিকা পড়েছিল অনেক পরে, কোলকাতাতে এসে, কিন্তু ছানুকাকুর মুখেই তখন শোনে হাড্ডি পিলপিলানোর কথা।

এমন সময় শাড়ি বদলে একটি গাঢ় সবুজ চুনী রঙের শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ পরে উদামা এলেন ও ঘরে।

ভাবি একটু বিয়ার খাবেন নাকি?

ব্রজেন বলল।

না। সুক্রিয়া।

শ্যান্ডি করে দিই একটু? নয়ত একটা গিমলেট বা ব্লাডি মেরী?

না। থ্যাঙ্ক উয়ু।

উদামা বললেন।

তারপরই অবনীর দিকে ফিরে উদামা বললেন, এই তোর ভালোবাসা? কী রে ফরিস্তা?

অবনীর হাত থেকে গ্লাস পড়ে যাচ্ছিল, যদিও তিনি কোনো অ্যালকহলিক ড্রিঙ্কই খাচ্ছিলেন না। চমকে উঠে বললেন উনি, আপনেই কি কানকাট্টি মিনু?

আজ্ঞা। আপনে যদি ফরিস্তা হন তবে আমিই সেই কানকাট্টি মিনু।

চিননই যায় না। আমার দোষ কী?

ক্যান চিনন যায় না ক্যান? দ্যাশের ভাষায় কথা কয়েন। আইসেন আমরা সেই ছোটবেলায় ফিইর‍্যা যাই অবনীমোহনবাবু

অবু কইর‍্যাই ডাক। শুইন্যা কান দুইডা জুড়াউক।

ক্যান চিনোনই যায় না ক্যান? মাথার চুল পাইক্যা গ্যাছে বইল্যা?

নারে। তার লাইগ্যা না। তুই কী সুন্দর যে হইছস।

অন্য কথা ক।

তারপর মিনু বলল, তোরেই কি চিনন যায় না কি?

যায় না চিনোন? ক্যা?

তুই এক্কেরে হাইলি হ্যান্ডসাম হইছস এরফান চাচার মতো। মনে আছে তর এরফান চাচারে? তক্ষণকার দিনে বিলাইত থিক্যা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস কইর‍্যা আইস্যা বর্মা মুলুকের মউলমিনে কারখানা খুলছিল না! যখন রংপুরে আইতো আমাগো লাইগ্যা সুইস-চকোলেট আর শুটকি মাছ লইয়া আইত গাদা গাদা। মনে নাই তর?

আছে। আছে। থাকব না ক্যান!

হাসি হাসি মখে বললেন অবনীমোহন।

কেমন আছেন এহনে চাচা? আছেন কুথায়?

আরে স্যা বাঁইচ্চা আছে নাকি আর। কবেই পটল তুলছে। পার্টিশানের আগেই তো মইর‍্যা ভূত হইয়া গেছে। জাপানিরা বম ফ্যালাইয়া তার কারখানা আর তারে ধুলায় মিশাইয়া দিছিল।

করিম সাহেব বললেন, একটা কথা কম্যু উদি। তুমি আর তোমার ছুটবেলার প্রেমিক বসার ঘরে যাইয়া রংপুরের স্মৃতিচারণ করো গিয়া, আমরা অ্যাডাল্টরা

এখানে অ্যাডাপ্ট-কনভার্সেশানে ব্যস্ত আছি। আমাগো বিরক্ত লাগতাছে। SHOP TALK কারে কয় তা জানি। কিন্তু এমন রংপুইর‍্যা প্যাচাল আর সহ্য হয় না আমাগো।

ব্রজ বলল, ইস্ট বেঙ্গলের সব ডায়ালেক্টই দেখছি ইকুয়ালি প্রিমিটিভ।

অবনীমোহন কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, ওয়াচ ইউর মাউথ ব্রজ। রাগটা যে কপট এমন ভাব করলেন কিন্তু মনে মনে সত্যিই রেগে গেলেন। ভাবছিলেন অবনী, নেবু, নঙ্কা, নুচি, আঁব, করি নি কো, যাই নিকোওয়ালারা এই প্রাণবন্ত ভাষার কী বুঝবে! 'আইসেন আইসেন' 'বসেন বসেন' বললে যা ভালোবাসা প্রকাশ পায় তা কি কখনও আসুন বসুন-এ পায়?

কেন কী হলো?

কী আবার হবে! তোমার মুখের জিওগ্রাফি পাল্টে যাবে। আফগানিস্তানের রিলিফ ক্যাম্প বানিয়ে দেব মুখটাকে। অবনীমোহন বললেন।

খানদানি ঢাকার বাঙাল রফিক সাহেব বললেন ব্রজকে, আরে ছাড় তো ভাই। রংপুরে আবার ভদ্রলোক থাকতো না কি? বাহেদের দেশ।

খবর্দার! এবার বললেন উদামা, এবারে সিরিয়াসলি। উ্যও আর সারপাসিং ইউওর লিমিটস। দ্যাট কমেন্ট ওজ ইন আটার ব্যাড টেস্ট জনাব।

তারপরই বললেন, আমরা পাশের ঘরেই যাচ্ছি।

উদামা আর অবনী পাশের ঘরেই এসে বসলেন।

এমন সময়ে একটি মেয়ে, সম্ভবত এ বাড়িতে কাজ করে, এসে বলল, আপনারা কখন খাবেন মা জিজ্ঞেস করতে বললেন। সেই মতো খাবার গরম করবেন।

মিনু হাত দিয়ে পাশের ঘর দেখিয়ে মেয়েটিকে বলল, আমরা তো এখনই খেতে পারি। তুমি ও ঘরের ওদের জিজ্ঞাসা কর গিয়ে।

অনেকক্ষণ অবনী এক দৃষ্টে উদামার দিকে চেয়ে রইলেন। নিজের দু'চোখ উদামার দু'চোখে টায় টায় রাখলেন যেন একটু চাউনিও উপচে না পড়ে।

দ্যাখো কি অবুদাদা? ঢং।

বিশ্বাসই হইতেছে না। সত্যি কইতাছি, বিশ্বাসই হইতাছে না। আমার সেই মিনু....। ভাবন যায় না। তারপর বললেন, ছাওয়াল মাইয়া কি তুমার?

নাই।

নাই?

ভালোই হইছে। আমারে তুই অ্যাডাপ্ট কর। রফিক সাহেবরে আব্বাজান

আব্বাজান কইরা ডাকুম তারপর স্যা কাজে বারাইলেই মায়েরে জড়াইয়া শুইয়া থাকুম।

খুব জোরে হেসে উঠলেন উদামা। বলল, সখ দেখি পুরাই আছে।

তারপর বলল, ভাবির নাম কী কও? তোমার কয় ছাওয়াল-মাইয়া?

হ! বিয়াই করি নাই।

ক্যান?

ছুটবেলায় এক মাইয়ারে কথা দিছিলাম যে তারে ছাড়া আর কারেও বিয়া করুম না।

হাঃ। অমন কথা কতজনকে দিছিলা শুনি।

সত্যি কইতে আছি। মা কালীর দিব্যি। তুই আমার জীবন থিক্যা হারাইয়া যাওনের পর আর একজন মাইয়ারেও চোখে ধরে নাই।

মিথ্যা কথা যেমন ছুটবেলায় কইতা এহনেওতো দেখি তেমনই কও।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুমার।

তারপরই বললেন, চাচা চাচি কেমন আছে তাই ক? আর জুবের ভাই?

জুবের না, কও জুবাইয়্যের।

ক্যান?

ছুটকালে আমরা অজ্ঞ আছিলাম। এই সকল নামই আরবি নাম। আমাগো কেউ শিখায় নাই তাই জুবের কইতাম।

জুব্যাইয়ের মানে কী? আরবি শব্দ?

হ্যাঁ তো।

মানে আমি কইবার পারুম না।

আর তোমার নামের মানে, উদামা? এই নাম কবে নিলা?

ওই। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার আগে, না টেস্ট পরীক্ষার আগে আব্বায় দিছিল মৌলবি সাহেবেরা কহনের কারণে।

উদামা মানে কি?

উদামা মানে সুন্দরী—যার গায়ের রং গমের মতো সাদা।

হঃ। তুমার গায়ের রং মুক্তার মতো সাদা। মুক্তারে কী কয় তোমাগো আরবিতে?

কইবার পারুম না।

তারপরেই বলল, সত্য কইরা কওতো, শাদি ক্যান কর নই?

সত্যিই কইতাছি।

অনেকক্ষণ মিনু অবনীর চোখে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

এই শাদিতে তুমি সুখী হইছ? মিনু?

কপালের পাশ থেকে সাদা হয়ে যাওয়া অলকগুচ্ছ বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মিনু বলল, সক্কল মানষে যারে সুখ কয় তা পাইছি।

বাড়ি, গাড়ি, টাকা, সম্মান, সম্পত্তি। তবে মা হই নাই।

সুখী হইছ কি না কও?

সুখ কারে কয়? তুমি জানো নাকি? না আমিই জানি?

বলেই রবীন্দ্রনাথের গান আবৃত্তি করে বলল, 'সুখ যারে কয় সকল জনে, বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে, চাইনে চাসনে গভীর সুরে বাজে অবিশ্রাম, যদি জানতেম আমার কীসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।'

তুমি এখনেও গান গাও?

গাই। ক্বচিৎ কদাচিৎ। যখন মনটা খুব খুশি খুশি লাগে নয়ত যখন খুব মন খারাপ হয়। চানঘরে গাই। খালি গলায়। কুনো সাথ সঙ্গত ছাড়াই। তুমি গাও?

অবনী বলল, আমিও গাই, ঐরকমই। চানঘরেই।

তুমি একটা গান গাইতা, মনে আছে আমার, 'সুখের কথা বোলো না আর, জেনেছি সুখ কেবল ফাঁকি, দুঃখে আছি আছি ভালো, দুঃখেই আমি ভালো থাকি।' তার পরের লাইনগুলান যেন কী ছিল?

"দুঃখ আমাব প্রাণের সখা
সুখ দিয়ে যায় চোখের দেখা
দুদণ্ডের হাসি হেসে
মৌখিক ভদ্রতা রাখি
দুখে আছি ভালোই আছি
দুখেই আমি ভালো থাকি।"

বাঃ। কার য্যান লিখা এই গানডা?

রজনীকান্ত সেন এর।

আরো নানা গান গাইতা তুমি মনে আছে, নজরুল ইসলাম এর, বিলকিস সেই গানডা শুইন্যাইতো তুমার প্রেমে পড়ছিল।

হঃ। যার প্রেমে আমি পড়ছিলাম স্যা ছাড়া দুনিয়ার বেবাক মাইয়াই আমার প্রেমে পড়ছিল। যার যেমন কপাল।

বাজে কথা কইবা না। তুমি য্যান জানো না স্যা কথা। পড়ছিলই তো। মাইয়ারা তো মাছি পড়ার মতো পড়তো তোমার ওপর।

তারপরই বলল, গাইবা নজরুলের সেই গানটা?

এখানে গাইতে কও? ওই ঘরে যে অসুর ব্রজ বইস্যা আছে।

শুধু ব্রজমোহন ক্যান আমার মিঞা নাই বুঝি? স্যাও তো আল-ওলহান্।

আল-ওলহান মানে কী হইল?

ওঃ। সরি। তুমি জানবা কোত্থিকা? ওজুর পানির মধ্যে যে শয়তান থাকে তারে কয় আল-ওলহান্। ফাঁটা বাঁশের মতো গলা জনাবের। না নিজে গান গায়, না অন্যের গান শোনে। এক্কেরে বেরসিক নাম্বার ওয়ান।

তো নিকা করলা ক্যান?

মাইয়াদের উপায়ডা কী? আব্বা যিখানে দিছিল সিখানেই হইছে। দামাদ লম্বা-চওড়া বড়লোক আর কী চাওনের ছিল কও? লম্বা-চওড়া মরদও যে বেকার হইতে পারে তা আমার তো বটেই আব্বারও জানা আছিল না।

তুমি কী বলতাছ মিনু?

সত্যিই কই।

ছাইড়্যা দিলা না ক্যান?

আমি কি মরদ? যে তিন তালাক দিলেই সব চুইক্যা গেল গিয়া। মুসলমান মাইয়াগো জীবন অন্যরকম।

হিন্দু মেয়েদের জীবনও তাই। আসল কথা হইতাছে ইকনমিক ফ্রিডম। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে মাইয়ার নাই তাদের সবই সইয়া থাকতে হয়।

এ তুমি আমারে কি শুনাইলা মিনু।

শুইনা তুমি কী করবা আর। এহনে তুমার আমার দুজনেরই যৌবন গেছে গিয়া।

আমার যায় নাই। তুমারে আমি জাগাইয়া লম্যু আনে।

তা আর হয় না। আমি কি তোমাগো অহল্যা না কি যে লাথি খাইয়াই প্রাণ পামু? আমি প্রস্তরীভূত হইয়া গেছি চিরডা কালের জন্যে।

থাউক। থাউক। ওসব আর কইও না।

জুরে জুরে গানডা শুনাইবা অবুদা? নজরুল এর সেই গানডা? তারপরে বলল, না, নিচু গলাতেই গাও। অরা শুনবো না। এতো কথা কইতাছে তারা যে শুনব না।

"সখি জাগো, রজনী পোহায়
মলিন কামিনী ফুল যামিনী গলায়,
সখি জাগো রজনী পোহায়

চলিছে বঁধূ সিনানে
বসন না বশ মানে
শিথিল কবরী টানে পথের কাঁটায়।
সখি জাগো, রজনী পোহায়"

বাঃ সকালের রাগে বাঁধা, না? কী কও?

হ।

এই গানডা আমি খালার বাড়িতে ফর্টি-এইট-আর পি-এম ডিস্কে শুনছি।

কার গলায়?

ইন্দুবালা।

তাই কও।

খেয়েদেয়ে ফেরার সময়ে অবনী ব্রজকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে দেখলাম না যে?

আসেনি।

কেন? শরীর খারাপ? রিনির?

শরীর ঠিকই আছে।

তবে?

সত্যি বলি? না মিথ্যা?

মিথ্যা তো ইনকাম-ট্যাক্স সেলস-ট্যাক্স অফিসারদের কাছে অনর্গলই বলছ, ফর অ্যা চেঞ্জ, সত্যিই বলো না একবার।

বলেই বললেন, আস্তে চালাও ব্রজ।

ঠিক আছে দাদা। ড্রিঙ্ক করলেই আমি গাড়ি ভালো চালাই।

সব মাতালেই এ কথা বলে। মত্ত অবস্থাতে একটি Split-Second-এর শ্লথতার জন্যে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। Reflex ঢিলে হয়ে যায়। বোঝা পর্যন্ত যায় না।

বাংলা ভাষার মধ্যে এতো ইংরেজি বলেন কেন আপনি দাদা?

সাধারণ মানুষে যেমন করে কথা বলে আমি তেমন করেই বলি। আমি তো BASE-এ কথা বলা সর্বজ্ঞ কোনো বৈয়াকরণ অথবা ভাষাতত্ত্ববিদ অথবা অভিনেতা নই।

তারপরে বললেন, এবারে তোমার বউ এলো না কেন সেটা বল। আমাকে কি সে পছন্দ করে না?

কী যে বলেন দাদা, আপনাকেও অপছন্দ করতে পারেন এমন কোনো মহিলা

কি আছেন? আপনি তো রমণীরঞ্জন।

বলেছ ভালোই। জীবনে যে এবারও রমণী-রমণ হতে পারল না সে-ই যদি রমণী-রঞ্জন হয় তবে আর কথা ছিল কি?

আপনাকে পছন্দ খুবই করে। আপনার সঙ্গে আমার বাড়িতে এসেই দেখা করে যাবে। কিন্তু ও একেবারেই পছন্দ করে না উদামাকে। ওরা আসার পরে একবার দাদার বাড়িতে দেখা হয়েছিল। সেই প্রথম, সেই শেষ।

কেন? কারণটা কী? উদামা তো মেয়ে খারাপ নয়।

আহা সে কথা নয়। মেয়ে মাত্রই যে ভালো, বিশেষ করে পরনারী হলে, এত ঘাটের জল খেয়ে এলাম আমি, এটুকুও কি বুঝি না?

তারপরে বলল, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম! দেবা ন জানন্তিঃ কুতো মনুষ্যা। মেয়েদের চরিত্র দেবতারাই জানেন না,আর মানুষ তো কোন ছার। তবে আমি বুঝতে পেরেছি কেন পছন্দ করে না।

কেন?

একজন সুন্দরী মেয়ে অন্যজনকে পছন্দ করে না।

এটা কি সমস্ত প্রাণির স্ত্রী লিঙ্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য?

তা বলতে পারব না। তবে মানুষীদের কথা জানি। মানুষীরা খুব কম সময়েই করে।

কেন?

তা মনস্তাত্ত্বিকেরাই বলতে পারবেন। মেয়েদের ব্যাপার মেয়েদেরই বোঝার।

তাই?

কিন্তু উদামা তো তেমন মেয়ে নয়।

মেয়ে আবার কী? বুড়ি বল। বয়স তো পঞ্চাশ হবে, না কি?

বেশিই হবে। কিন্তু বয়স, নারী এবং পুরুষকেও যা দেয়, তা তাদের যৌবনও দিতে পারে না। প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যে, যৌবনের সৌন্দর্য এক অন্য দীপ্তি পায়। যৌবনের জ্বালার সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের রুহ খস্‌স্‌ মিশে যায়।

কী যে বলেন দাদা তা আপনিই জানেন।

এই ব্রজ! অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে যে। দাও, স্টিয়ারিং আমাকে দাও।

জীবনে কোনোদিনও অ্যাকসিডেন্ট করিনি আমি।

ব্রজ স্টিয়ারিং জোরে আঁকড়ে ধরে বললেন অবনীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে।

জীবনে সব জিনিসই একদিন প্রথম করে মানুষে। কাগজে পড়ছ না একুশ বছর আগে মত্ত অবস্থাতে গাড়ি চালানোর জন্যে আমেরিকার প্রেসিডেনসিয়াল

ক্যান্ডিডেট জর্জ বুশ এর ফাইন হয়েছিল বলে আজ তার নির্বাচনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। তাও অ্যাকসিডেন্ট তিনিও করেননি, শুধু মত্ত অবস্থাতে গাড়ি চালিয়েছিলেন, তাই এই বে-ইজ্জত। একুশ বছর পরে। তোমরা সব ভালো আছ তো জ্যোতিবাবুর দেশে। রাজ্যের সব পুলিশ তো জ্যোতিবাবুর যাতায়াতের পথের দু'পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে, তোমাকে ধরবে কেডায়? যারা থাকে আদৌ তারা ট্যাক্সি, ট্রাক এবং অন্য কোনো উৎস থেকে টাকা রোজগারেই ব্যস্ত থাকে।

থাক গে, ঐ তো বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

'ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া, ভ্রমরাতে করছে গুনগুন কোকিলাতে দিচ্ছে সাড়া'

গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন অবনীমোহন।

খেইয়েচে! বললেন ব্রজমোহন।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথচ গান গায়, পুলিশ অথচ ভদ্রলোক, কমিউনিস্ট অথচ কপট নয়। আপনি দেখালেন দাদা। কিন্তু আপনার এই গুণটি তো কখনো পেকাশ করেননি আগে।

তোমার কাছে প্রকাশ করে কী করব? তুমি যে অ্যাকাউন্ট্যান্ট-শ্রেষ্ঠ! আমার প্রাণের এবং গানের উৎসমুখে অনেক ধুলো বালি পাতা-পুতা জমে ছিল। উদামার সঙ্গে আজ দেখা হওয়াতে এত বছর পরে সেই উৎসমুখ হঠাৎ খুলে গিয়ে তা দিয়ে গান নতুন করে উৎসারিত হলো।

অ্যাই যে! আপনাকে সেফলি ইন ওয়ান পিস, কেমন নিয়ে এলাম বলো তো।

ব্রজ, সেরিমনিয়াসলি বললেন—

বলেই, গ্যারেজে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলেন।

চিন্তা গেছে তো আপনার? মরার এতো ভয় কেন?

মৃত্যুভয় আমার নেই, কারণ আমার টাকা নেই, দু'নম্বরের টাকা তো নেই-ই।

টাকার সঙ্গে মৃত্যুভয়ের কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক নেই? তারপর বললেন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বললেন, 'The fear of life increases in direct proportion with the money one posseses' অর্থাৎ একজন মানুষের টাকা যে অনুপাতে বাড়তে থাকে তার মৃত্যুভয়ও ঠিক সেই পরিমাণেই বাড়তে থাকে। যে গরিব, তার অত মৃত্যুভয় কখনোই থাকে

না।

ভালো নেশা হয়েছিল ব্রজমোহনের। দোতলার সিঁড়িতে যখন উঠছিলেন তখন বেশ বোঝা যাচ্ছিল। নেশা অবনীমোহনেরও হয়েছিল। তবে সেটা মদ্যপানের কারণে নয়। মদ্যপান তো করেনই নি তিনি। তারচেয়েও অনেক কড়া নেশা উদামার সঙ্গ....।

কত কথাই যে মনে আসছিল ভিড় করে।

ব্রজ বললেন, রফিক সাহেব একটা শায়েরী বললেন ভালো।

কী?

না পীনা হারাম হ্যায়, না পিলানা হারাম, পীকর হোঁসমে আনা হারাম হ্যায়। ভালো না?

ভালো।

অবনী বললেন।

তারপর ব্রজমোহন বললেন, তাহলে আমি আজকের মতো ছুটি নিলাম।

গুডনাইট দাদা! বলে, ব্রজ চলে গেল নিচে। তার বউ রিনি কালও আসবে না, আসবে পরশু। উদমা ও রফিক সাহেব কোলকাতা চলে গেলে। ব্রজ রফিক সাহেবদের এবং তার দাদাবৌদিকেও অবনীমোহনের সম্মানে কাল রাতে ওর বাড়িতেই খেতে বলেছে। রিনিহীনই হবে সে জমায়েত। মাতালদের অবশ্য বিশেষ কোনো জায়গা লাগে না। একটা কোথাও বসতে পেলেই হলো। তারপর তার চারধারেই তারা তাদের নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নেয়। কিছুক্ষণ পর তারা সোনার খাটে বসে আছে না ছেঁড়া মাদুরে সেই বোধটুকুও চলে যায়। তাই পূর্ণিমা-অমাবস্যাতে বিশেষ ফারাক হয় না তাদের। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে মাতালরাই সর্বশ্রেষ্ঠ সোস্যালিস্ট, সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান, কারণ জাত-পাত তারা সত্যিই মানে না। সকলেই সত্যিই সমান। অমন বিরাদরি, রিয়াকৎ কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়।

জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরে অবনী শুয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ বারান্দাতে বসে থাকবার পর। বেশ অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। ভিতরে ভিতরে খুবই উত্তেজিত হয়ে ছিলেন উনি। এমন কী, রফিক সাহেব আর উদামার দাম্পত্য নিয়েও ভাবলেন কিছুক্ষণ উনি। সম্পূর্ণ বে-এক্তিয়ারের ভাবনা। উদামা কি সুখী হয়নি? হয়নি তো এ বাঁধন ছেঁড়েনি কেন? শুধু টাকা-পয়সা বাড়ি-গাড়ি নিয়েই কি জীবনে বাঁচে কেউ? কিন্তু ও সুখী না হলেই বা কী করতে পারেন অবনীবাবু। সব জিনিসেরই এক বিশেষ সময়সীমা থাকে, সেই সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে

আর কোনো লাভ হয় না।

উদামা আজকে একটা দারুণ কথা বলল। বলল, হোসেনুরের জীবন জীবিকার ভারে চাপা পড়ে গেছে। নিরানব্বুই ভাগ মানুষই ভুলে যায় যে জীবিকাটা জীবনেরই জন্যে, মানে জীবনকে সুন্দর করে উপভোগ জন্যে। কিন্তু জীবিকা অক্টোপাসের মতো, বিষাক্ত অক্টোপাসের মতো, তার জাল এমনভাবে মানুষকে জড়িয়ে ফেলে যে জীবন সেই জালের মধ্যে ছটফট করতে করতে কখন যে দমবন্ধ হয়ে মারা যায় জীবিকামগ্ন মানুষ তা টের পর্যন্ত পায় না।

আজকেও অনেকক্ষণ বিছানাতে এপাশ ওপাশ করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন অবনীবাবু। আর ঘুমিয়ে পড়তেই তার রংপুইর‍্যা ছোটবেলাটা একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো চোখের সামনে ফুটে উঠল স্বপ্নে।

আহা! জীবনটা যদি স্বপ্ন হতো তবে কী ভালোই না হতো!

অবনীমোহনের ভীষণ জ্বর। বিছানাতে শুয়ে আছেন। ম্যালেরিয়া। ওরা বলতো 'ম্যালোরি'। মুঠো মুঠো কুইনিন ট্যাবলেট এবং নীল-রঙা টিনের কৌটোর রবিনসন বার্লি একটু লেবু আর একটু নুন দিয়ে গ্লাস গ্লাস খেতে হতো। জ্বর একশো চারের বেশি উঠলে মাথার তলে কলাপাতা দিয়ে ঘটি ঘটি জল ঢালতেন মাথাতে মা-পিসিমা ঠাকুমারা। তাঁরা অবনীর মুখের ওপরে ঝুঁকে উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে থাকতেন। তাতেও যদি জ্বর না কমত তবে শহরে খবর দেওয়া হতো ডাক্তারকে। ডাক্তার ভূপতি মৈত্রকে। ফর্সা, বেঁটে, পাতলা-চুলের পান-খাওয়া ডাক্তারবাবু, ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আসতেন। তারপর বরেন্দ্র ভূমের বিশুদ্ধ ভাষাতে নাকি নাকি স্বরে বলতেন, জ্বঁর কত? থার্মোমিটার কখন দিঁছিলেন? তারপর ঠাকুমাকে বলতেন, ছাওয়ালের অবস্থাতো ভালো দেঁহি না মাসীমা। এই জ্বঁরের রকম আর আমার ভালো ঠাঁহর হইতেছে না। তারপর বড়কাকুকে বলতেন—টোনা, একবার ড. নিযামুদ্দিনরে খবর দাও গিয়া, সাইকেলডা লইয়া যাও আর আমার এই চিঠি খান। আমার মন ভালো কইতাছে না,য্যান।

রুগী যেন ছাগল বা গরু, তার সামনেই রোগী ও রোগ নিয়ে আলোচনা করছেন ডাক্তার। ডাক্তার কথাও যেন কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে বলেন। হয়ত পান খাওয়ার জন্যেই জিভটা মোটা হয়ে যাওয়াতে কথা ওরকম অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

বেলা বাড়ে। আকাশে মেঘ। ঝুরু ঝুরু হাওয়া বয়। কাঁঠাল আর লিচুর শুকনো পাতা গোবর-নিকোনো উঠানে সেই হাওয়াতে এক্কা দোক্কা খেলে। চ্যাগারের ওপরে বসে দাঁড়কাক কা-খা-গা-ঘা-খবা-ক্কা করে আরোহণ অবরোহণে গলা

সাধে। অবনীমোহনের দ্যাশের দাঁড়কাকদের গলাতে এক অদ্ভুত বিষাদ ও অমঙ্গল জড়িয়ে ছিল। তাদের ডাক শুনলেই মন কারাপ হয়ে যেত অবনীমোহনের।

পিসীমা স্বগতোক্তি করলেন, আকাশের দিকে চেয়ে, আইতাছে আবার।

আজ এক্কেরে ভাসাইব।

ঠাকুমা বললেন।

এমন সময় দরজায় কে যেন উঁকি দিল। যদিও দরজা খোলা তবুও মেঘে ঢাকা আকাশের পটভূমিতে ত্রস্তে সরে যাওয়া সেই ভীরু ছায়া চুড়ির রিনঠিন আর পায়ের পায়জোরের শব্দ কয়্যা দিল যে য্যা আইছে স্যা মাইয়া।

ক্যারে ছেমরী! তুই কার বিটি? ঘরে আসস না ক্যান?

আসবে কী করে? কানকাট্টি মিনু যে তার আগে কোনোদিনই আসেনি অবুদাদের বাড়ির ভিতরে যেমন অবুও যায়নি ওদের বাড়ির ভিতরে। ওদের সখ্য ছিল প্রকৃতির মধ্যে, মেঘ-রোদ্দুরে, নানা গাছের পাতার ছায়ায়, প্রজাপতি আর কাঠবিড়ালি, আর শামুক আর ঢোঁড়া সাপ আর কাঁচপোকা আর কুঁচফলের ঝাড়ের মধ্যেমধ্যে কাশবনে আর নীলকণ্ঠ আর বসন্ত-বৌরি-পাখিদের রাজত্বে। নানা সাপের ফেলে-যাওয়া খোলসের মাঝে মাঝে রোদ ছায়ার সাদা-কালো ডোরাকাটা গালচের ওপরে বসে।

কথা কস না ক্যানরে ছেমরী? তুই কার বিটি?

অবু অর্ধনিমীলিত চোখে শুয়ে শুয়ে বলার চেষ্টা করছিল মিনুর পরিচয়। কিন্তু দুর্বলতা এমনই, যে কথা বলার কোনো উপায়ই ছিল না। এমন সময়ে মিনু বলল, জনাব সিরাজুদ্দিন হক।

সেডা আবার কেডা?

বদরুদ্দিন হক-এর ছেলে।

ওঃ আমাদের বদু মিঞার নাতনি তুই!

মিনু এসে অবনীর বিছানার পাশে দাঁড়াল।

ঠাকুমা বললেন, চাস কী? আইছস ক্যান?

চাই না কিস্যু। শোনলাম অবুদার ভারি জ্বর তাই দ্যাখতে আইলাম।

তরে কইল কেডায়?

পুঁটু দাদায়।

আরে! ওদিক কই যাস ছেমরী। ও দিকে আমার নারায়ণ আছেন। মোসলমানের মাইয়া, বলা নাই কওয়া নাই ফটাস কইর‍্যা ঘরে ঢুইক্যা আইলি! তর আক্কেল বইলা কি কিসসুই নাই!

বরেন্দ্রভূমির ব্রাহ্মণ ভূপতি ডাক্তার পান খেতে খেতে পুঁচুক শব্দ করে একটু হেসে উঠে বললেন, আক্কেলই থাকব তো মুসলমান হইব ক্যান?

রাগে লজ্জায়, অসুস্থ অবুর কান গরম হয়ে উঠল। আর মিনুর বুকের মধ্যে কী হচ্ছিল তা কে জানে। ওর কামরাঙ্গা লাল বুকটা বুঝি দুঃখে ফেটেই গেল। ধীরে অসুস্থ শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অবু বলল, তুই যারে মিনু, চইল্যা যা। আমি ভালো আছি।

মিনু থতমত খেয়ে চলে গেল, জলভরা চোখে।

বুকটা ভেঙে গেল অবুর।

স্বপ্নের মধ্যেই ভাবছিলেন অবনীমোহন, এই দেশ ভাগ হয়েছে ভালোই হয়েছে। কিছু বি. এ, এম. এ পাস করা অশিক্ষিত, উদ্ধত, অকারণে গর্বিত মানুষ অন্য মানুষদের মানুষের সম্মান যদি না দেয় তবে তাদের বুকে বাজবে না? বেশ হয়েছে জিন্না সাহেব পাকিস্তান বানিয়েছিলেন বলে। অপমানিত অত্যাচারিত ইহুদিরা যদি নিজেদের মান-সম্মান ও আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্য ইজরায়েল গড়ে নাৎসী জার্মানদের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে তবে মুসলমানরাই বা কেন অন্য দেশ গড়ে নিতে পারবে না? হিন্দুরা নাৎসীদের মতো শারীরিক অত্যাচার করেনি মুসলমানদের উপরে কিন্তু যুগ-যুগান্তর ধরে যে মানসিক অপমান, অসম্মান করে যে উচ্চমন্যতাতে ভুগে এসেছে, তার কোনো তুলনা নেই।

ইংরেজিতে "Slight" বলে একটা শব্দ আছে। এর কষাঘাতের নীরব জ্বলন শঙ্কর মাছের চাবুকের জ্বলনের চেয়েও অনেক তীব্র। যাদেরই আত্মসম্মান আছে, তারাই এ কথা জানে। তাই যুগ-যুগান্তর ধরে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও অভিমানে অপমানে হিন্দুসমাজকে পদাঘাত করে গিয়ে ইসলামের উদারহৃদয় বিরাদরী আর রিসালত-এর পতাকার নিচে জমায়েত হয়েছে। "History repeats itself" যা ভবিতব্য ছিল তাই ঘটেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটা মস্ত বড় অংশই ধর্মের এই খারাপ দিকটিকে উপেক্ষা করতে শিখেছে। শিখছে। এখন কোনো মিনু কোনো অসুস্থ অবুকে দেখতে গেলে আর অপমানিত হবে না। হবে না যে, এটাই আশার কথা, মানবজাতির ভবিষ্যতও তাই ধীরে ধীরে সুরক্ষিত হবে। সবাই একদিন মীরসাহেবের মতন বলবে,

"না হিন্দু হ্যায়, না মুসলমান
ইনসান কি আওলাদ হ্যায় ইনসান হি বনে গা।"

হঠাৎই অবনীমোহন তাঁর সেজকাকুকে দেখতে পেলেন। খদ্দরের ধুতিকে লুঙ্গির মতো পরে উবু হয়ে বসে আলুখেতে আলু তুলছিলেন। একেবারে একা। সকালের রোদ নীলাকাশে ঝকঝক করছে, ঘোঘটের ক্যানাল দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে কুলকুল শব্দ করে, একজোড়া বুলবুলি চালতা গাছের ডালে বসে ফিসফিস, ফিসফিস করে এ ওকে আদর করছে। মদ্দাটা সিপাহি বুলবুল। তার মেজাজ এমনিতে ভীষণই কড়া কিন্তু আজ এই শীত সকালে তাকে খুব নরম দেখাচ্ছে। নানা-রঙা ক্ষুদে ক্ষুদে মৌটুসকি পাখিরা রঙ্গনের ডালে বসে থোকা থোকা ফিকে লাল ফুলের উপরে জমে থাকা রাতের শিশির নাচানাচি করে ঝরিয়ে দিচ্ছে। বড় গাছের ছায়াতে দাঁড়াতে এখন শীত লাগে। ছায়াচ্ছন্ন জায়গাগুলি সকালে গাছের পাতার গা থেকে ঝরে পড়া শিশিরে ভিজে থাকে। একটা বড় দাঁড়কাক গলা তুলে তার অলুক্ষণে ডাক ছড়িয়ে দিচ্ছে দিগ্বিদিকে সকালের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিকে বিঘ্নিত করে। চিত্র বিচিত্র দারাজ সাপ তার দীর্ঘ শরীরটাকে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে বড় জলপাই গাছটার দিকে। যার নিচে ওর বাসা। আলু খেতে মেঠো ইঁদুর অনেক সময়ে যে সব আলু খারাপ হয় সেগুলো ছুড়ে ফেলে দেয়, সেগুলো খায় মেঠো ইঁদুরেরা রাতের অন্ধকারে আর রাতের বেলা পেঁচারা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় তাদেরই। অবুর সবচেয়ে ভয় করে বাদুড়দের। সন্ধে হবার মুখে মুখে তাদের বড় বড় ডানা সপসপিয়ে তারা দুটি চারটি করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় আর ঠিক সেই সময়েই বুলবুলি পাগলি তার লালকালো ডুরে ছেঁড়া শাড়ির আঁচল খসিয়ে সন্ধের মনখারাপকে গভীরতর করে তার চিকন কিশোরী গলায় গান গাইতে গাইতে যায়—

'সন্ধ্যা হলো গো মা, আমার এখন বিপদ ভারী
সন্ধে হলেই তরাস জাগে আমি যে এক যুব-নারী
বলে দে মা আমারে তুই কোথায় আমি পালাতে পারি।
যৈবন যে নিষ্ঠুর অতি ছাড় পায় না এই ভিখারি
নাই যে আমার একখান শাড়ি।'

ভারি মন খারাপ হয়ে যায় অবুর বুলবুলির গান শুনে। সন্ধে শুধু বাইরের প্রকৃতিতেই, গাছগাছালি ঝোপে-ঝাড়েই নামে না। অবুর হৃদয়ের অলিগলিতেও নেমে আসে। যে আসা অমোঘ।

অবুর সেজকাকু এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। দেশকে ভালো এমন করে আর কারোকেই বাসতে দেখেনি অবু। দাড়ি রেখেছিলেন ব্রিটিশের পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে পালাবার জন্য। এক রাতও এক জায়গাতে থাকা তাঁর পক্ষে

নিরাপদ ছিল না। কতদিন দেখেছে অবু যে, তাদের রংপুরের বাড়ি ও কোলকাতার বাড়ি শেষ রাতে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। কিন্তু কী করে যে সেজকাকু জানতে পারত, ষষ্ঠবোধে, ঠিক পালিয়ে চলে যেত তাদের চোখে ধুলো দিয়ে। কোলকাতাতে শেষের দিকে তো বাড়িতে রাতই কাটাতেন না। দেশ যখন স্বাধীন হলো, দু ভাগ হলো, সেজকাকু বললেন, এই স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়। যেদিন দুই বাংলা এক হবে সেদিনই আমি দাড়ি কাটব। সেই দাড়ি আর কাটা হয়নি। অকৃতদার, নিজের হাতে কাচা খদ্দরে ধুতি আর পাঞ্জাবি আজীবন পরে কাটানো সেজকাকুর সাদা চাদরে ঢাকা চেহারাটা, কেওড়াতলার ইলেকট্রিক চুল্লিতে ঢুকে যাওয়ার আগের মুহূর্তে বৈদ্যুতিক আগুনের আভাতে লাল দেখাচ্ছিল। অবিবাহিত সেজকাকুর সঙ্গে, তার দাড়ির সঙ্গে, দুই বাংলা এক হওয়ার স্বপ্নও ছাই হয়ে গেল।

একদিন, মনে পড়ে, মিনু আর অবু জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কুড়োতে গেছিল খোটেদের আমবাগানে। তখন কালবৈশাখীর সময়। ঝড়ে নারকেল গাছের মাথা, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচুর ডাল আন্দোলিত হচ্ছে, কানালের জলের মাথায় হাওয়া উড়ন-চাঁটি মেরে জলকে নাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে জলকণা উড়িয়ে আর টপাটপ করে ঝড়ে পড়ছে আম—কত রকমের আম। তার মধ্যে সবচে' পছন্দ ছিল মিনুর সিঁদুরে আম। সত্যিই সিঁদুরের মতো দেখতে। অবুদের বাড়িতেও একটা ছিল ইন্দারার পারে। কিন্তু পরের বাগানেব ঝড়ে-পড়া আম খাওয়া আর নিজেদের আম খাওয়া কি এক হলো?

সেদিন বিকেলে উথাল-পাথাল কালবৈশাখি তার উড়াল চুল উড়িয়ে ক্রমে এলেবেলে করে দিল দুনিয়াদারি কিন্তু পরক্ষণেই অন্য কারো ডাক শুনেই কোথায় যেন উড়ে গেল। রেখে গেল মেঘের ঘনঘটা। সূর্য ঢেকে গেল সন্ধে হওয়ার দেড়ঘণ্টা আগেই। চারধারে ভুসা কালি অন্ধকার। মিনু অবুর বুকের কাছে ঘন হয়ে এসে বলল, অবুদা, বড্ড ভয় করতাছে আমার। চলো, তাড়াতাড়ি বাড়িত যাই।

তবু তার হাত মিনুর সরু কোমরে জড়িয়ে বলল, আমি আছি না! কোনো ডর নাই তর। কোনো ডর নাই।

তারপর মিনুর হাত ধরে ওরা যখন ওদের দু'জনের বাড়ির দিকে এগোল তখন হঠাৎ মনে পড়ল যে, সেই বড় বাঁশঝাড়টার পাশের সরু পথ দিয়েই তাদেব যেতে হবে দু'জনের বাড়ির দিবে। এ বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে যেতে দিনের বেলাও ভয় ভয় করত অবুর। গা ছমছম করত। আর অন্ধকার হয়ে

গেছে তো কথাই নেই। কতরকম যে শব্দ ওঠে। হাওয়াতে খসখস করে বাঁশের গায়ের শুকনো ছাল, আস্তে জোরে, কটকটি শব্দ হয় কঞ্চিতে কঞ্চিতে ঘষা লেগে। ওদের বাড়ির মুনিষ-খাটা হরজীবন বলে, উ ঝাড়ডার মধ্যে আস্ত আড়াইখানা পালোয়ান ভূত আছে। একা যাইও না। একা পাইলেই তোমাকে কুস্তি লড়তে কইব। যদি না লড় তো তোমার মুণ্ডখান ধড় থিক্যা খুইল্লা লইয়া চইল্যা যাইব ভূতেরা।

আর তারও পাশে যে পুকুরডা, সেই পুকুরে জিন থাকে। এটা অবশ্য মিনুর কাছ থেকেই শুনছে অবু। মিনু শুনেছে রমজান এর মায়ের কাছ থেকে। রমজানের মা হাজাম। এ বাড়ি সে বাড়ির মাইয়াদের পা ঘসয্যা দেয়, পিঠে সাবান দিয়া দেয়, চুলেতেল লাগাইয়্যা দেয়, নখ কাইট্যা দিয়া যায়, বগলতলির চুল কাইট্যা দেয়, আত্তর দিয়া ঈষদুষ্ণ জলে জান করায়। সবই জানে রমজানের মা। জিনেরা জব্বর সুন্দরী হয়। পুরুষগো ভুলাইয়া লইয়া জলের নিচে লইয়া যাইয়া ডুবাইয়া মারে তাগো।

আজ কী হয় কে জানে। ভাবে অবু। কিন্তু তাও ভাবে এই আঁধার য্যান না কাটে। মিনু য্যান তার উপর ওমনি কইর‍্যাই নির্ভর কইর‍্যা থাকে সারাডা জীবন। তার শরীলডার ফিরদৌস আতরে গন্ধ য্যান এমনি কইর‍্যাই অবুর পরাণডারে অবশ কইর‍্যা রাখে চিরডা কাল।

"ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে পরাণডারে গামছা দিয়া বান্ধি...
ইচ্ছা করে
আইরন, বাইরন পরাণড়ারে মসল্লা দিয়া রান্ধি...
ইচ্ছা করে"

বহরমপুরের অফিসের নতুন ছেলেদের মধ্যে দুটি ছেলেকে মনে ধরেছে খুব অবনীমোহনের। মনে ধরেছে মানে জামাই করবেন এমন নয়। মেয়েই নেই, জামাই করার প্রশ্নই উঠে না। তবু মেয়ে থাকলে হয়ত সে কথা ভাবতেন। একজনের নাম নজরুল ইসলাম। অন্যজনের নাম শান্তনু দাস। নজরুলদের বাড়ি লালগোলাতে। লালগোলার এ বছরের বন্যায় খুবই ক্ষতি হয়েছে। এ বছর তো হবে না, তাই নজরুল পরের বছর তাদের ওখানে বেড়াতে যেতে নেমন্তন্ন করল অবনীকে। বলল, কষ্ট দেব না স্যার। নদীর উপরেই থাকবেন বড় নৌকোতে। দিনে পাঁচদশ মাইল ভাটিতে বা উজানে নৌকো নিয়ে যাবেন আসবেন। কাছেই বাংলাদেশ। মাঝি-মাল্লা বাবুর্চি খিদমদগার সব ফিট করে দেব আমি। তা ছাড়া আমি নিজেও থাকব আপনার খিদমদগারিতে। নদী, আপনার সঙ্গে কথা বলবে,

কথা বলবে হাওয়া, ফিসফিস করবে ধুধু চরের মিহি বালি। চখাচখির স্বগতোক্তি আর ধূসর উড়ন্ত রাজহাঁসেদের কোঁয়াক কোঁয়াক শব্দ আপনার পুরনো সব স্মৃতিকে গন্ধরাজ লেবুর গন্ধের মতো উড়িয়ে আনবে। তবে শীতে আসতে হবে। শীতে নদী বিবাগী হয়ে যায় যখন, তখন পীরের আবাসস্থানের মতো মনে হয় নদীকে। যেন দরগা হয়ে যায় নদী।

নজরুলের বাবার তেজারতি কারবার এবং বেশ কিছু জমিজমা আছে। ছেলেকে সি. এ বানাবার ইচ্ছা তাঁর কিন্তু ছেলে মনে মনে কবি। একথা নজরুলের সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছেন অবনী।

ব্রজ বলছিল, এ এক বিচ্ছু দাদা। মক্কেলের অডিট করতে পাঠানো খতেন— জবেদাতে, পেটি ক্যাশ বুকে ছবি এঁকে রাখে। কবিতা লিখে সি. এ. পরীক্ষার ফারস্ট গ্রুপে তিনবার ফেল করেছে তবু বিকার নেই।

অবনী হেসে বলেন, সি. এ পরীক্ষা পাশ করাটাই মানুষের জীবনের পরম ও চরম গন্তব্য নয় ব্রজমোহন। মানুষের জীবনে অনেক মহত্তর গন্তব্য থাকে। থাকা স্বাভাবিকও। সি. এ. পাশ করতে না পারলে কি ওর জীবন বৃথা হয়ে যাবে? মানুষের জীবন মস্ত বড়, অনেকই আঁটে সেখানে। ও চাষবাস করবে, বাঁশি বাজাবে, কবিতা লিখবে। না হয় একটু কমই খাবে, খারাপই পরবে কিন্তু তার বুক তো আনন্দে ভরে থাকবে। ব্রজ বললেন, কী যে উল্টো-পাল্টা বলেন দাদা! দিনে দিনে ছোঁড়া অধঃপাতে যাচ্ছে।

অবনী বললেন, পতন তো চিরকাল অধঃলোকেই হয়। কে আর কবে ঊর্ধ্বলোকে পড়েছে বল? তারাশঙ্করের দুই পুরুষের সুশোভনের সেই ডায়ালগ মনে নেই?

কার? শংকরের?

আরে না না, শংকরের নয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নামই শোনোনি?

নাম শুনিনি, তা নয়। আমাদের পাড়াতে একজন খুব ভালো গাইনী আছেন ঐ নামে।

অবনী হেসে ফেললেন ব্রজর কথা শুনে। আহত যেমন হলেন তেমন মজাও পেলেন।

মনে মনে বললেন, Ignorance is bliss! এ জন্যেই বলে। তুমিই যথার্থ অ্যাকাউন্ট্যান্ট ব্রজ।

তারপর বললেন, তোমার প্রিয় লেখক শংকরের কোন কোন উপন্যাস পড়েছ তুমি?

কোন কোন মানে, একটাই মাত্র পড়েছি।

ও জীবনে তুমি একটাই মাত্র উপন্যাস পড়েছে তাহলে?

তা কী করব। সময় পাই কোথায়? তাও সেদিন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে একদিন একটা মোষ চাপা পড়ে ট্রেন আটকে গেছিল। বেলডাঙ্গা স্টেশনের আগে দাঁড়িয়েছিল ট্রেন। একজন কো-প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে বইটা চেয়ে নিয়ে পুরোটা পড়ে ফেললাম। জীবনে ঐ আমার প্রথম এবং শেষ মলাট-টু-মলাট উপন্যাস পাঠ। নইলে সাহিত্য-ফাহিত্য ইজ নট মাই কাপ অফ টি।

অবনী বললেন, ভালোই হয়েছে যা হয়েছে। সাহিত্যও বেঁচেছে, তুমি বেঁচেছ।

তারপর বললেন, বইটার নাম তো বললে না।

রূপতাপস। দারুণ না নামটা?

দারুণ। তবে ওর চেয়েও ভালো অনেক বই আছে শংকরের। কত অজানারে, চৌরঙ্গী, নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ইত্যাদি।

আর কিছু পড়েননি?

না। বললামই তো আমার কিছু প্রিয় কবি-সাহিত্যিক আছেন, মানে যারা ক্ল্যাসিক হয়ে গেছেন। তাঁদের লেখা ছাড়া পড়ি না। তাঁদেরই আমি আদ্যোপান্ত পড়ি।

তাঁদের ছাড়া কারো লেখাই পড়েন না?

পড়ি না তা নয়। নতুন যারা লিখছে তাদের লেখাও পড়ে দেখি, মানে স্যাম্পলিং করি আর কী। পড়তে তো হয়ই। আগেকার দিনে বলত Literature makes a makes a man. এখন বলা উচিত Person. সাহিত্য, যে-মানুষ না পড়েন, গান না শোনেন, তাঁর সঙ্গে জানোয়ারের তফাত কী?

একেবারে জানোয়ার বানিয়ে দিলেন আমাকে?

Leterally নয়। Physically-ও নয়। তবে মানসিকতায় অবশ্যই।

অন্য ছেলেটি, শান্তনু সাহা। বাড়ি ছিল বরিশালে। শহরের উপান্তে আমানতগঞ্জে। ওর বাবা চলে আসেন উনিশ শ আটচল্লিশে। ওই বড় ছেলে। মস্ত পরিবার। বাবা এখনও আছেন। তবে বয়স হয়েছে। পঁচাত্তর। বাবা গত হবার পরে ওর ঘাড়েই পড়বে পুরো পরিবার। পাটের ব্যবসা আছে বাবার। জঙ্গীপুরে শান্তনুদের সব আত্মীয়স্বজনই ব্যবসায়ী। ও বলল, সি. এ পাস করতে পারলে, আত্মীয়স্বজনের ইনকাম ট্যাক্সের কেস আর অডিট দেখেই আমার চলে যাবে।

অবনী বলেছিলেন, ভুলেও ও কর্ম করো না। ব্যবসা বা পেশা থেকে আত্মীয়স্বজনদের দূরে রাখবে। তাদের কাছ থেকে কোনো উপকার নেবেও না তাদের আগ-বাড়িয়ে উপকার করতেও যাবে না।

কেন? অবাক হয়ে বলেছিল শান্তনু।

সে অনেক কথা। তবে যদি বদনাম কুড়োতে চাও, তাহলে করো। যা বলছি, সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা ভুলও হতে পারে।

তারপর বলেছিলেন, তুমি তো খুব এনার্জেটিক শান্তনু। তুমি কী খাও?

কী খাই মানে?

মানে, রোজ কী খাও?

শান্তনু হেসে বলল, সকলে যা খায়। ডাল-ভাত তরকারি, কখনও সখনও মাছ পেলে মাছ। তবে যাই খাই না কেন, তার সঙ্গে মেলা পেঁয়াজ রসুন খাই। সকালে উঠে এককোয়া রসুন খাই। তারপরে দুবেলা খাবার সময়ে একটা আস্ত কাঁচা পেয়াজ খাই আর দুটো করে কাঁচালঙ্কা।

বল কী?

হ্যাঁ, স্যার।

এ জন্যেই অত খাটতে পারো তুমি। আমার বাবা বলতেন, আমাদের গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান চাষীরা সবাই সমান গরিব ছিল কিন্তু তফাতেই মধ্যে হিন্দু মুসলমানের প্রতিদিনের STAPLE FOOD-এর রকম। মুসলমানেরা যে ঘনঘন মাংস খেতো তা নয়। টাকা পাবে কোথায়? গরুও খেতো কালেভদ্রে ওদের পালা-পার্বণে। রোজ রোজ পাঁঠা কিংবা মুরগি খাবার সামর্থ্যও ছিল না। তবে ডিমটা খেতো অবশ্য। তবে কেনা ডিম নয়। বাড়িতে পোষা মুরগির। ওরা সকলেই মুরগিপালক। কিন্তু রিলিজিয়াসলি খেতো পেঁয়াজ রসুন আর লঙ্কা, বিশেষ করে কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা। বাবা বলতেন, আমার দৃঢ় ধারণা এই পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা খেয়েই মুসলমান চাষীরা এত বেশি খাটতে পারত।

শান্তনু হাসল। বলল, হবে হয়ত। আমাদের বাড়িতে কিন্তু পেঁয়াজ রসুন লঙ্কার চল আছে ছেলেবেলা থেকেই। তাই অভ্যেস হয়ে গেছে। বরিশাল ছেড়ে চলে এসেছি বটে কিন্তু অভ্যেসটা রয়ে গেছে।

তাই এতো খাটতে পারো তুমি। অবনী বললেন, খুবই ভালো।

ব্রজেন পাশ থেকে বললেন, ভদ্রলোকে কাঁচা পেঁয়াজ খায় না। রসুন খেলে মুখ দিয়ে রসুনের গন্ধ বেরোয়। ঘামেও রসুনের গন্ধ হয়ে যায়। ছিঃ!

অবনীমোহন বললেন, তোমরা আলু পোস্ত, কলাই-এর ডাল খেয়ে গন্ধহীন এবং বর্ণহীন ভদ্রলোক হয়েই থাকো।

মুসলমানেরা টক খায় না কেন, জানেন দাদা? তাদের রান্না-বান্নার এত নাম ডাক, অনেক ঈদ, বকরা ঈদ, শবেবরাতের, অনেক ইফতারের খানা খেয়েছি কিন্তু কখনও টক কিছু খেয়েছি বলে মনে তো পড়ে না।

তাই তো। এটা কিন্তু লক্ষ করি নি আমি। তোমার অবসারভেশান খুব স্ট্রং।

ভেরি গুড। কী হে নজরুল? তুমি জান নাকি তোমরা কেন টক খাও না?

ঠিক জানি না। তবে আমাদের পাড়ার এক হাজি সাহেবের কাছে শুনেছিলাম টক খেলে বীর্য তরল হয়ে যায়। তাগৎ কমে যায়।

তাই?

অবনীমোহন এবং ব্রজমোহন একসঙ্গে চোখ বড় করে বলে উঠলেন।

কোলকাতার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টরা কি সকলেই খুব টক খান? দাদা?

ব্রজেন জিজ্ঞেস করলেন অবনীকে।

কী করে বলব। তবে আমি মাঝে মধ্যে খাই। কিন্তু আমি তো তোমার ক্রসিবল নই ভায়া, আমি তো ব্যাচেলর।

ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে হবে তো। করে দেখি, তারপর যদি বুঝি যে নজরুল যা বলছে তার পেছনে সার আছে তাহলে কোলকাতার রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর প্রেসিডেন্টকে বলে একটা সার্কুলার ইস্যু করাব টক খাওয়ার কুফল সম্বন্ধে। তারপর থেকে প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের গণ্ডা গণ্ডা ছেলে হবে এবং পার্টনারেরও অভাব হবে না কোনো।

শোভন ও নজরুল একই সঙ্গে হেসে উঠল এই কথাতে।

ব্রজেন বলল, কয়েকটা লিমিটেড কোম্পানির রিপোর্ট দুপুরের খাওয়ার পরে ড্রাফ্‌ট করে দিতে হবে দাদা।

দেব এখন।

এবারে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

কী কথা?

আমরা যে ট্যাক্স অডিট রিপোর্টে বলে দিই কত টাকার ক্যাশ পেমেন্ট আছে, মানে section 40A (3) এর জন্যে। সে কারণেই কি ইনকাম ট্যাক্স অফিসারেরা সেই পুরো অ্যামাউন্টটাই যোগ করে দিতে পারেন? ওঁরা বলেন, ট্যাক্স অডিট রিপোর্টে section 40 (A), -তে যা দেখানোর তাই তো ট্যাক্স অডিট রিপোর্টে

অডিটরেরা দেখিয়ে দেন।

ভুল কথা। ট্যাক্স অডিট রিপোর্ট ইনট্রড্যুস করেছিল সরকার ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টেরই সাহায্য জন্যে নিজেদের যাতে গমের বা চালের পোকা বাছার মতো ক্যাশ পেমেন্টগুলো বেছে বের করতে না হয়। কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, ক্যাশ পেমেন্ট কোয়ান্টিফাই করলেই ডিসঅ্যালাউড হবে। Rule 6-এর Exception-এর আওতায় পড়লে তা ডিসঅ্যালাউ করা যাবে না। অ্যাসেনমেন্ট এর সময়ে এ ব্যাপারে আর্গু করতে হবে বৈকী।

সেকী! অফিসারেরা যে বলেন আপনারাই রিপোর্টে বলছেন ডিসঅ্যালাউবেল আর আপনারাই নিজেদের কনট্রাডিক্ট করছেন?

তা তো নয়। অডিটরদের যে হাত বাঁধা। ক্যাশ পেমেন্টের অ্যামাউন্ট কোয়ান্টিফাই করতেই হবে। তার মানে ঐ অ্যাকাউন্ট 40 A (3) -এর আওতাতে আসবে যদি না Rule 6D-তে তাকে বা তার কোনো অংশকে ছাড় দেওয়া যায়। একটু ভালো করে খাটলে, প্রতিটি ক্যাশ পেমেন্টকে আলাদা করে দেখিয়ে কেন তা ক্যাশেই করতে হলো তা গুছিয়ে লিখে দিলেই হয়। তারপরও অফিসার না দিলে তো কমিশনার (অ্যাপীলস) আছেনই। তারও পরে ট্রাইবুনাল।

তাই?

দেখি এবার থেকে তাই করব।

করো। লড়লেই পাবে। লড়াকু বুলবুল হতে হবে। প্রফেশানের মজাটাই তো সেখানে। মক্কেল কত ফীস দিল সেটা গৌণ, Job satisfaction-টাই আসল।

তা ঠিক।

সেদিন রফিক সাহেবের সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়নি। আজ হলো। কারণ সকলেই বসার ঘরে বসে ছিলেন একসঙ্গে। ওঁরা পান করছিলেন আর অবনী এবং উদামা নুন-চিনি-লেবুর শরবত। উদামাই বলেছিল কোক-ফোক খাইব না আমি। কখনই খাই না। এক গ্লাস কোকে যা ক্যালরি তা এক গ্লাস মদেও হয়তো নাই।

তাই?

বলেছিলেন অবনীবাবু অবাক হয়ে।

তারপরে বলেছিলেন, তোমার সামনে বইস্যা রইলেই তো আমার ন্যাশা হইব, মদ খাওনের কাম কী? তাছাড়া মদ-ফদ খাইল্যে ব্যাবাক মানষে খারাপ কয়।

খারাপ বললে কী হয় অবনীবাবু? মির্জা গালিব সেই কবে বলে গেছেন,

'বুরা না মান গালিব যো দুনিয়া বুরা কহে।
অ্যাইসা কোই হ্যায়, সবহি ভালো কহে যিসসে?'

বাঃ।

বললেন। অবনীবাবু।

তারপর বললেন, আপনে কি কবি নাকি রফিক সাহেব?

কবি সকলেই জনাব। জীবনানন্দ যা কয়্যা গেছেন তা পুরাপুরি ঠিক না। কবি হক্কল মানষেই। কবিতা কেউ মুখে ল্যাখে। কেউ কাগজে, কেউ বা আবার ল্যাখে তাগো মনে মনে।

উদামা বলল।

ঠিকই বলেছেন। গোপেনবাবু বললেন।

রফিক সাহেব ব্রজকে বললেন, আজ আমাকে প্রথমেই আপনাদের একটা 'পাতিয়ালা পেগ' দিন। বড় ধকল গেছে সারাটা দিন। সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে বান ও ভাঙা রাস্তা বেয়ে এতকানি পথ আসা আর যাওয়া। হাড্ডি-গুড্ডি সব চুরচুর হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, দেখে মন ভরে গেছে মুর্শিদাবাদ। নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাজার দুয়ারি।

হাজার দুয়ারি তো প্রত্যেক মানুষের মনও।

ব্রজেন সকলকে অবাক করে বললেন।

সাব্বাস। সাব্বাস বলে উঠলেন রফিক সাহেব। ইনি তো শায়ের, দেখা যায়।

দার্শনিকও বটে।

উদামা বিবি তো বললেনই যে সকলেই শায়ের।

তা তো হলো কিন্তু আপনাদের 'পাতিয়ালা পেগ'টা কী জিনিস?

গোপেনবাবু হেসে ফেললেন। বললেন, নর্মাল পেগ এর তিনগুণ ঢাললে একটি পাতিয়ালা পেগ হয়। তবে পাতিয়ালার মহারাজের নামই যে যেন কলঙ্কিত করে এল এতোদিন ধরে মাতালেরা তা বলতে পারব না। সে বেচারি, মানে সেই সময়কার মহারাজ হয়ত জানতেও পারলেন না কত বড় বদনাম সারা দেশের মানুষে দিচ্ছে তাঁকে।

যাকগে থাক। মহারাজ আর নবাবেরা চিরদিনই সাধারণের কাছে এক অলীক অস্তিত্ব। তাঁদের খুব কাছ থেকে জানে না বলেই তাদের সম্বন্ধে ভালো-মন্দ অনেক কিছুই সাধারণে বানিয়ে এসেছে চিরদিন।

ব্রজ বললেন।

তারপরে বললেন।

বাচ্চাওয়ালি কামান দেখেছেন?

বাচ্চাওয়ালি কামান? না তো!

সেকী! সকলেই তো তা দেখে আসেন।

অমন নাম হলো কেন কামানের?

ব্রজেনবাবু বললেন, একজন গর্ভবতী মহিলা ঐ কামানের তোপ এর শব্দ শুনেই বাচ্চা প্রসব করে দেন।

তারই সঙ্গে কত হৃদরোগী যে অক্কাও পেয়েছিলেন তাদের কেউ মনে রাখল না।

কত বড় কামান?

নিশ্চয়ই দেখেছেন। No one can miss it. ১৬৪৭-এ জনার্দন কর্মকারের তৈরি ১৮ ফিট লম্বা ঐ কামানে ১৮ সের বারুদ লাগত একবার গাদতে। ১৬৮৮০ পাউন্ডের কামান।

বলেন কী কর্তা?

রফিক সাহেব বললেন,

তা নইলে আর বলচি কি?

রফিক সাহেব মানুষটি ভারি মজার। মোটা সোটা মানুষেরা সাধারণত মজারই হন। হাসি শুনেই মানুষ কেমন, তা বোঝা যায়। যারা মন খুলে দরজা হাসি হাসেন না তাঁরা মানুষ কখনও ভালো হন না। অনেক কামিনা এ কথা জানে বলেই অট্টহাসির অভিনয় করে কিন্তু তাদের সে অভিনয় ধরা পড়ে যায়। হাসি আর চোখই মানুষের মনের আয়না।

ভাবছিলেন অবনী।

এতো কথা, এবং অপ্রয়োজনীয় কথাও হুইস্কি সোডা অথবা রাম-পানি থেকে উৎসারিত এই কিছুক্ষণের উল্লাসের মধ্যে বসে থেকে ভালো লাগছিল না অবনীর। উনি ভাবছিলেন উদামার সঙ্গে যদি একা কিছুক্ষণ থাকতে পারতেন। উদামারা আগামী কালই চলে যাবেন কোলকাতা। তারপর সেখানে একদিন থেকে, ঢাকা ফিরে যাবেন প্লেনে। কিন্তু অবনীবাবুর পক্ষে এখনি ফেরা সম্ভব হবে না বহরমপুর থেকে।

হঠাৎই উদামা বলল, ঢাকা আইবা কবে, তাই কয়্যন অবুদা? গুলশান-এ আমাগো বাড়ি। স্যাতো ট্যুওরের উপরই থাকে। আমি আর তুমি অনেক গল্প করুম। আপনারে গামছায় দই পাইত্যা খাওয়ামু, ত্যাল-কই, চিতলের পেটি।

ঢাকা! বলেই উদাস হয়ে গেলেন অবনীবাবু।

সাহিত্যিক সমরেশ বসু একদিন এক ঘরোয়া আড্ডাতে বলেছিলেন, "ঢাকা জায়গাটা দেখার বড় ইচ্ছে ছিল"। প্রথমে অবনী বুঝতে পারেননি সমরেশ বাবুর PUN। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ঘরসুদ্ধ সকলের সঙ্গে জোরে হেসে উঠেছিলেন।

না, ভালো মানুষ, অবিবাহিত অবনীবাবুর ঢাকা জায়গাটা এখনও দেখা হয়নি, দেখা যে কখনও হবে এমনও মনে হয় না। ঢাকাতে যাবার ইচ্ছাও নেই। তবে পারলে একবার রংপুরে যেতেন এবং বরিশালেও। ঐ দুই জায়গাতেই তিনি ছিলেন ছেলেবেলায়। রংপুর তো তাঁর শেষ দেশও।

মুখে বললেন, রংপুর যাইতে ইচ্ছা করে। আমাগো বাড়ি ঐ পাড়া সব কেমন হইছে এহনে তা কে জানে! জিলা স্কুলের সামনের পথ বাইয়া ধাপ-এ আমাগো তোমাগো বাড়িত আসতে হইত। এস. পি. সাহেব না ডি. এস. পির বাড়ি ঠিক মনেও পড়ে না এহনে, ঐ পথের ওপরেই ছিল। ডিমলার রাজবাড়ি, পাঠশালা, শঙ্কামারীর শ্মশানের পথ.....

হাঃ। ওসব কিসস্যুই নাই এহনে অবুদা। তোমাগো বাড়ি, সামনের গোলাপ বাগান, পেছনের ও পাশের মস্ত বাগান, কিছুই নাই। আমাগো বাড়িও নাই। ঐ খানেই নাকি এয়ারপোর্ট হইছে এহনে। আমিও বহুদিন যাই নাই রংপুরে। নাই কেউ, আর যাইয়া কী হইব।

কও কী তুমি উদামা! তবে আর রংপুরে যাইয়া আমারই বা লাভ কি?

লাভ কিছুই নাই। তবু দ্যাশের মাটি বইল্যা কথা। মাটিতে হাত ছোঁওয়াইয়া আইতে পারতা। ও আমার দ্যাশের মাটি তোমার গায়ে ঠেকাই মাথা। তাইতেই আলাদা আনন্দ।

রফিক সাহেব খুব দ্রুত খাচ্ছিলেন আজ। গ্লাস এর পাতিয়ালা প্রায় তলায় এসে ঠেকেছে। বললেন, কোনো কিছুই অবিকৃত, অবিকল থাকে না অবনীবাবু। বদলেরই আরেক নাম জীবন।

তা ঠিক।

তারপর রফিক সাহেব বললেন, আসুন আপনি একবার বাংলাদেশে। শুধু রংপুর বরিশালই কেন, আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাব। চিটাগং হয়ে আরাকান— তারপর বার্মা, সরি মায়ানমারেও যেতে পারেন। ভিসাটা করে নিয়ে আসবেন শুধু ইন্ডিয়া থেকে আসার সময়ে। আর নিয়ে যাব আপনাকে সুন্দরবনে— আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের সৌখিন সুন্দরবন নয়, আসল সুন্দরবন। আপনাদের

সুন্দরবনেও আমি গেছি। সে তো ফুলের বাগান।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আপনাদের সুন্দরবনে নাকি সুন্দরী গাছই নেই? সত্যি নাকি অবনীবাবু?

কী জানি! বন-বাদাড়ের আমি কিছুই জানি না। একবার মধ্যপ্রদেশের এক মক্কেল কানহাতে নিয়ে গেছিল। গেছিলাম। ব্যস ঐ।

আপনাদের কানহাতে আমিও গেছি। দূর দূর, রেডিও-কলার পরা বাঘে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বেঁধে রাখা মোষ খেয়ে পেট-সাদিয়ে যখন ঘুমায় তখন হাতির পিঠ থেকে ট্যুরিস্টরা বাঘ দেখে কিরর র-র কিরর-রর করে ফোটো তোলে আর কোলকাতা দিল্লি বোম্বে ফিরে গিয়ে শালীর কাছে বাঘ দেখার গল্প করে। আমাদের বাখেরগঞ্জ সাবডিভিশনের সুন্দরবনের বাঘ হচ্ছে আসল বড় মিঞা। তার তুলনা ভূ-ভারতে নাই। বাঘ তো দেখাবই আর মাছও খাওয়াব। গলদা চিংড়ি, ভেটকি, পার্শে, পাবদা। কাঁকড়া আর কাছিম খাওয়াব রান্না করে। আপনাদের এখানে তো মানেকা গান্ধীর কল্যাণে কাউঠ্যা খাওয়া বন্ধ। আসুন, আসুন একবার। ওয়াইফ-এর ওল্ড ফ্লেসকে ভালো করে খাতির-যত্ন করি।

সুন্দরবনে লঞ্চ থেকে টেনে কুমিরের মুখে পেলে দেবেন না তো?

ছিঃ। আমি কেমন হোস্ট তা আমার গেস্টদেরই জিজ্ঞেস করুন। কী বলুন গোপেনবাবু?

সেটা ঠিক। রফিক সাহেবের গেস্ট হয়ে বাংলাদেশে গেলে একটামাত্র প্রাণ পকেটে করে যাওয়াটা বিপজ্জনক। সেটা খাতিরদারির চোটে সেখানেই রেখে আসতে হবে।

সকলেই এই কথাতেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

রিনির বাড়িতে অতিথি এল তাও রিনি এল না। এটা অভব্যতা।

ব্রজেনের বাড়িতে সেলার নেই। বসবার ঘরের সেন্টার টেবল এর ওপরে হুইস্কি রাম এবং জিন এর বোতল সাজানো আছে।

রফিক সাহেব মানুষটি খুব দিলদরিয়া এবং রসিক। সব ব্যাপারেই 'যানে দো কনডাক্টর' ভাব। অবনীকে বলছিলেন, অবনীবাবু আপনি মদের মতো চমৎকার জিনিস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখলেন সারাটা জীবন? কাজটা কি ভালো করলেন? মদ কে খায় না বলুন তো। পণ্ডিত নেহরু বা জ্যোতিবাবু তো রোজই স্কচ খান অথবা খেতেন। জ্যোতিবাবু তো শুনেছি জনি ওয়াকার ব্লু-লেবেল খান। কে তাঁকে কেস কেস যোগান তাঁর নামও জানি আমি। পণ্ডিত নেহরুর সময় ব্লু-লেবেল বেরেয়ই নি—তাই সম্ভবত ব্ল্যাক লেবেলই খেতেন।

আর পাকিস্তানের আয়ুব খাঁ সাহেব খেতেন ব্ল্যাকডগ। উইনস্টন চার্চিল তো হুইস্কি-ড্রাম্বুই এবং সিগারের উপরে ভেসেই জার্মানিকে যুদ্ধে হারালেন। আর এই জিনিস আপনি ছুঁয়েই দেখলেন না! কাজটা ভালো করলেন না। আপনার ওল্ড ফ্রেস এর অনারে হয়ে যাক না এক পেগ।

থাক থাক জোর করবেন না।

গোপেনবাবু বললেন।

আহা! জোর করব কেন? জোর করেই যদি কিছু করতে যাই, তবে কোনো পছন্দসই তরুণীকে বলাৎকারই করব। আপনার ভাইয়ের পার্টনারকে হুইস্কি কেন খাওয়াতে যাব জোর করে?

ওঁর কথাতে সকলেই হেসে উঠলেন, উদামা ছাড়া।

উদামা বললেন, এই রকম বাজে ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না। চলেন অবুদা আমরা নিজেরা গল্প করি গিয়া।

অবনী বলল, আপনার আপত্তি নেইতো রফিক সাহেব?

আপত্তি? আপত্তি কীসের? চিরদিনের মতো নিয়ে যান, আপনাকে এক লাখ টাকার চেক লিখে দেব।

এক লাখে কী হবে?

হানিমুন-এর খরচ। তাও প্রথম কিস্তি।

ঠিক আছে। ভেবে দেখি।

ওরা সকলেই হেসে উঠলেন, অবনী সুদ্ধ, শুধু উদামা হাসল না।

উদামা আর অবনী এসে অবনী দোতলার যে ঘরে ছিল তার বারান্দাতে এসে বসল। পথের ও পাশে একটা মস্ত বড় শিমুল গাছ, নারকেল গাছ কয়েকটি, সামনের বাড়ির হাতার মধ্যে। চাঁদের আলোতে চকচক করছে শিমুলের সাদা শরীর আর বাহু আর নারকেল গাছের পাতাগুলি। যেন রুপোঝুরি হয়ে গেছে। চাঁদের আলোর সাদা বেড়াল যেন চাঁদের আলোর সাদা ইঁদুরদের ডালে ডালে ঝুপ ঝুপ করে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এমনই এক চিত্রকল্প শিশু অবনীর চোখে ফুটে উঠছিল রংপুরের ধাপের বুলবুলিদের বাড়িতে। সত্যি! কতদিনের কথা। একেবারে শিশুবয়সের কত কথাই যে এমন স্পষ্ট মনে আছে অবনী কী করে যে থাকে তাই আশ্চর্য। অথচ পরবর্তী জীবনের খুব কম কথাই মনে আছে তেমন করে।

মনে আছে, সেই এক শীতের সকালে অবুদের বাড়ির পেছনের বাগানের মস্ত জলপাই গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে কানকাটি মিনুর পেঁয়াজ রসুনের গন্ধভরা

মুখটি বড় আদরে সোহাগে দু হাতের মধ্যে নিয়ে চুমু খেয়েছিলেন। ভালো লাগাতে চোখ বুজে ফেলেছিল মিনু। সারা শরীরে এক দারুণ অস্বস্তিবোধ করেছিল অবু। সেই অস্বস্তির ব্যাখ্যা নেই ওর কাছে। তার পরে কিশোরী মিনু, যুবতী মিনুর মুখে কত পুরুষেই হয়ত চুমু খেয়েছে। ভারি জানতে ইচ্ছে করে অবুর যে সেদিনের মতো ভালো আর কি লেগেছিল ওর কখনও? অবিবাহিত হলেও অবু তার যৌবনে আরও দু-একজনকে চুমু খেয়েছিল—বলতে হয়, জীবন খাইয়েছিল—অনেক কিছুই মানুষের জীবন ঘাড়ে ধরে করিয়ে নেয় মানুষকে—যদিও তার দায়-দায়িত্ব জীবন নেয় না, সেই মানুষের ঘাড়েই তা বর্তায় তবু জীবন না করিয়ে নিলে অনেক কিছুই হয়ত ঘটত না অবুর জীবনে, মিনুর জীবনে, কারোর জীবনেও।

কও। কথা কও অবুদা। দ্যাখো কি আমারে অমন কইর‍্যা?

তুমি বুঝবা না।

হ। আমি তো এহনেও তোমার হেই ছোট্ট মিনুই আছি কি না।

আছই তো।

তুমি বড় এড্ডুও হও নাই।

হ। তোমারে কইছে!

অবু বলল, আচ্ছা মিনু, এখনও সন্ধ্যার মুখে, শহরে দুধ বেইচ্যা তাগো লালচে-কালো ছোট ছোট পোড়া মাটির হাঁড়ি বাজাইয়া গান গাইতে গাইতে শঙ্কামারীর শ্মশানের নির্জন পথ ধইর‍্যা নিজের নিজের ঘরত যায়, সেই ছুটো ছাওয়ালেরা সন্ধ্যার সায়ান্ধকাররে তাড়াইয়া দিয়া?

উদামা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার মনে আছে স্যা সব কথা!

আশ্চর্য। এত বছর পরেও!

তারপরে বললে, তুমি শঙ্কামারীর শ্মশানে গেছিলা কি কখনও?

নাঃ। আমার দৌড় আছিল খোঁয়ার অবধি!

তারপর বললেন, তহনে বুঝতাম না কিন্তু এহনে বুঝি যে জীবনের কোনো পথেই গন্তব্য অবধি না যাওনই ভালো।

ক্যান?

গ্যালে, রহস্য মইর‍্যা যায় মিনু। রহস্যহীন জীবন ব্রজেনের ড্রাফট-করা বালান্স শিটেরই মতো। পাই-পয়সারও মিল সিখানে।

মিল থাকন ভালো না কইতাছ তুমি?

না। ভালো না। তুমার সঙ্গে আমার যে মিল হয় নাই সেই লগ্যেই তুমার আমার সম্পর্কটা সেই শিশুবয়সেরই মতো মিষ্টি আছে, মিষ্টি থাকব। চিরডা

কাল। যতদিন বাঁচি।

মিনু চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, তুমি ছুটো বেলায় যেমন কথা কইতা হেঁয়ালি হেঁয়ালি, বোঝন যাইত না, এহনেও তেমনই কও দেহি। মনে আছে তুমার অবুদা, আব্বাস ভাই কইত অবুদা বড় হয়্যা রাইটার হইব? দেইখ্যা লইস তরা। সত্যি! তুমি রাইটার হইল্যা না ক্যান অবুদা? তুমার কত নামডাক হইতো। সমরেশ মজুমদার, সুনীল গাঙ্গুলির মতো তুমারে বাংলাদ্যাশ সরকার ইনভাইট কইর‍্যা লইয়া আইত আর আমার কী গর্বই না হইত তখন। আমার অবু দাদার সম্মান দেইখ্যা।

সকলেই কি সব হইতে পারে মিনু? যা ইহতে চাইছিলাম তা যে হই নাই এডাই ভালোই হইছে।

ক্যান? ইটা আবার ক্যামন কইল্যা?

ঠিকোই কইলাম। পথের শেষ গন্তব্যস্থানে না পৌছাইলেই ভালো। ঠিক বুঝাইয়া কইতে পারলাম না তুমারে। যা হইছে ভালোই হইছে।

যাউকগা। তুমি রাইটার হও নাই। তুমারে আমি ইনভাইট করতাছি। তুমি কবে আইবা কও। তুমারে মন ভইর‍্যা আদর যত্ন করম।

উত্তর না দিয়ে অবনী বললেন, তোমাদের বাড়ির গেটের পাশে যে দুইডা মস্ত মস্ত কৃষ্ণচূড়া গাছ আছিল, এহনেও আছে কি?

হ্যাঃ। তারা তো কবেই মইর‍্যা গেছে গিয়া।

তাই? আর কাজী ওদুদের বাড়ির সামনের মস্ত কদম গাছটা?

সেটা খান সেনারা কাইটা ফ্যালাইছে।

ক্যান?

তা ক্যামনে কমু। তাগো ইচ্ছা হইছিল তাই।

গাছ কি কেউ কাটে? যারা গাছ কাটতে পারে তারা মানুষও কাইট্যা ফ্যালাইতে পারে।

তাইতো ফ্যালাইছে।

আচ্ছা, তোমার মরিয়ম খালার বাড়ির বারবাগানে যে মস্ত টোপাফুলের গাছ আছিল সেটায় আজও কি টোপাফুল হয়?

আস্তা পাগল দেহি তুমি। সে সব কি আউজকার কথা?

আচ্ছা আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে যে চালতা গাছটা ছিল, যার নিচে শীতকালে মাদুর বিছাইয়া বইস্যা রাঙাপিসি, ছবি দিদি, সেজকাকিমারা ধইনা পাতা, কাঁচালঙ্কা আর সন্ধব লবণ মাইখ্যা চালতা মাখা খাইত জিহ্বায় টাক-টাক আওয়াজ কইর‍্যা, সেই চালতা গাছটা আছে এহনও?

কইতে পারুম না। মুসলমানের মাইয়া তাই তোমাগো বাড়িতে আমি যাইতাম আর কোথায়?

সে কথা ঠিক। তবে একবার আইছিলা আমার খুব জ্বর হইছে খবর পাইয়া আর ঠাকুমা তোমারে অপমান কইর‍্যা....

থাউক। স্যা কথা থাউক। তুমি তো অপমান করো নাই তাইলেই হইল। বুলবুলি কেমন আছে জানো না কি মিনু?

জানুম না? বুলবুলিরে শ্যাখেরা ক্যাম্পে লইয়া গিয়া তারে ক্যামে সাবান দিয়া চান করাইয়া তিরিশ জনে মিল্যা রেপ কইর‍্যা মাইর‍্যা ফ্যালাইছিল।

ধাপের ছাওয়ালেরা করতাছিল কী? শ্যাখেদের বস্তায় পুইর‍্যা ঝিকার ডাল দিয়া পিটাইতে পারে নাই?

রাইফেলের লগ্যে ঝিকার ডাল! তুমি এক্কেরে আনরিজনেবল কথা কও দেহি।

তারপর আগে কও।

আগে কী কমু। তারে একটা কোরা শাড়িতে জড়াইয়া লাইয়া বলহরি বোল কইর‍্যা মতিন, রমেশ, যতীন, আসাদুল্লায় মিল্যা শঙ্কামারীর শ্মশানে লইয়া গিয়া জ্বালাইয়া দিছিল।

তাই? ঈসস!

বুলবুলি একটা গান গাইত না, যৌবন ভিখারি মাইয়ারে ক্ষমা করে না ক্যান? যার পরনের শাড়ি নাই একখান তার পক্ষে যৌবন যে হত্যাই এক বিষম জ্বালা। রংপুরে এখন বড় বড় মাল্টিস্টোরিড বাড়ি হয়ে গেছে?

হয় নাই? চিনোনই যায় না। বড় বড় গাড়ি যাইতাছে হুস-হাস কইর‍্যা। ইন্ডিয়ারই মতন। সিখানেও আমার সোয়ামি হোসেন-উর-রফিক এর মতো বড়লোক যেমন আছে, যার চারখান গাড়ি, তেমন বুলবুলিরাও আছে। আজও আছে। ইন্ডিয়ায় আর বাংলাদ্যাশে তেমন তফাত নাই কুনো। কাইলকা আর আইজে তফাত নাই কুনো। মনে হয় যে আছে কিন্তু আসলে নাই।

তাই?

হ্যাঁ।

অবনীবাবু চুপ করেই রইলেন।

এবারে কবে আইবা কও?

পশ্চিমবঙ্গীয় অবনী বললেন, তোমরা একবার শান্তিনিকেতনে এসো। আমার ছোট্ট একটি পর্ণকুটির আছে। করিম সাহেবকে বলবে ব্যবসা করা চলবে না কোনোরকম সেবারে। শুধুই গল্প, গান, রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া।

আসব একবার। এবার তো আসতে পারব না। মিঞা সাহেবের যখন সময়

হবে। তখন আসব।

একা এলেই বা কি? শরীরকে তো এখন ভয় করার নেই আমাদের। আর মন তো শুধু আনন্দই দিতে পারে। তাকে ভয় কীসের?

সেই সহজ কথাটা তো তোমরা পুরুষ মানুষেরাই বোঝনি কোনোদিন। শরীরের সংযম কাকে বলে বোঝ নি, মনেরও আগল খুলতে শেখোনি। নিজে যদি স্বাবলম্বী হতাম তবে কি এই বাঁদীগিরি করি চিরটা কাল!

তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে না কেন মিনু?

ভারি আহ্লাদের কথা তো। তুমি আমার সঙ্গে রাখলে না কেন?

তা ঠিক।

তারপর অবনী বললেন, আসল বাঁধনটা, মেয়েদের উপরে বাঁধনের কথা বলছি, ধর্মের অনুশাসনের নয়। সেদিক দিয়ে হিন্দুত্ব ও ইসলামে তফাত বিশেষ নেই। আসল বাঁধনটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার। যতদিন না পৃথিবীর সব মেয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হবে ততদিন দেশে দেশে তোমাদের এই বাঁদীগিরি ঘুচবে না মিনু।

ছাড়ান দাও ওসব বড় বড় কথা। তুমি কবে আইবা কও অবুদা?

আমি যাম্যু না।

ক্যান?

কী হইব গিয়া? আমার সে রংপুরই নাই। যে রংপুরের ছাও আমি। মা নাই, বাপ নাই, সেইসব গাছ নাই, মিষ্টি ধুলার গন্ধমাখা পথ নাই, ঘরদোর নাই, এমন কী, বুলবুলিও নাই। কী হইব যায়্যা?

তুমি তো ঢাকাতে আসবা। ঢাকাতেই তো আসতে কইত্যাছি। গুলশান-এ। গুলশান ঢাকার সবচেয়ে পশ যায়গা।

ঢাকা আর ঢাকা নাই। একটা খোলা জাগা হইয়্যা গ্যাছে। ওই ঢাকায় যামু কিসের লিগ্যা? ছাড়ান দাও। অন্য কথা কও।

মিনু থুড়ি উদামা অবনীর দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইল। তার চোখে কী যেন কী চকচক করছিল রাগ, অভিমান, না হতাশা ঠিক বুঝতে পারলেন না ইন্ডিয়ার অবনীমোহন ঘোষ।

অবনী ভাবছিলেন, যা হারিয়ে যায় তা যায়ই। জীবনও কাচের বাসনেরই মতো। যে জীবন তাঁর এবং মিনুর এবং তাঁদের অনেকের হাত থেকেই পড়ে ভেঙে গেছে তাকে অ্যারালডাইট দিয়ে জুড়লেও তার সেই পুরনো দিনের চেহারা সে আর ফিরে পায় না।

তাই, কী হবে আর মিছিমিছি.....

স্বপ্নিল

লোকে বলত পিচার সাহেবের বাংলো। সেসব অনেক আগেকার কথা। লোকমুখে শোনা কথা। তারপর কলকাতার খুব নামকরা একজন ডাক্তার সে-বাড়ি কিনে নাম দেন 'কণিকা'। তাঁর চলে-যাওয়া স্ত্রীর নামে। তারপর তিনিও গত হওয়াতে তাঁর ভাইপোরা রাঁচির এক বড় বাঙালি ব্যারিস্টারকে বিক্রি করে দেন। 'কণিকা' নেমপ্লেট উঠিয়ে সেখানে সাদা মার্বেলের ওপরে কালো অক্ষরে লেখা হয় The Retreat।

মধুপুর, গিরিডি, দেওঘর, শিমুলতলা, হাজারিবাগ, হাজারিবাগ রোড (সারিয়া) ইত্যাদি জায়গাতে মার্বেলের বিরাট বারান্দাওয়ালা কত বাঙালির বাড়ির নামই যে 'The Retreat' তার ইয়ত্তা নেই। সেই মার্বেলের চাতালে কখনো নাদির আলপনা দিয়ে লম্বকর্ণ চরে বেড়ায়। নয়তো তাস-দাবার আড্ডা বসে। কোথাও-বা চুন্নুর ঠেক। কিন্তু হাজারিবাগ শহরের এই অঞ্চলে রাঁচির ব্যারিস্টার শ্রীধীরেন রায়-এর The Retreat সেই পর্যায়ের বাড়ি নয়। ঝকঝক তকতক করে বাড়ি। দেখাশোনার জন্যে চারজন লোক আছে। দুজন মালি, একজন কুক, একজন বেয়ারা, দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর। রায়সাহেব আগে বছরে চার-পাঁচবার আসতেন। এখন ঝাড়খণ্ড হয়ে যাবার পরে, রাঁচিতে পার্মানেন্ট হাইকোর্ট বসাতে, তাঁর প্রচণ্ড পসারের চাপে, অতবার আর আসতে পারেন না। ক্রিসমাসে অবশ্যই আসেন। অন্য সময়ে ওঁর পরিচিত বা আত্মীয়স্বজনরা আসেন।

আমার কাকাও উকিল বলে কাকা রায়সাহেবের খোঁজখবর তো রাখেনই এবং তিনি সে বাড়ির বিনি-মাইনের কেয়ারটেকারও বটে।

হাজারিবাগ সেশানস কোর্ট থেকে যেসব আপিল রাঁচির হাইকোর্টে যায় সেগুলো কাকা সব রায়সাহেবকেই দেন। রায়সাহেব আমার কাকা শ্রীগোপেন সামন্তকে বিশেষ স্নেহ করেন বলে অতি অল্প ফিস নিয়েই কাকার আপিলগুলো করে দেন।

আমি কাকার জুনিয়র হয়েছি বালিগঞ্জের ল কলেজ থেকে পাস করে এসে দুবছর হল। সেজন্যেই এসব খবর রাখি। আসলে The Retreat-এর কেয়ারটেকিং আমাকেই করতে হয়, কাকা সময় পান না। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে গিয়ে লোকজনের মায়না, কুকুরের খাবারের টাকা দিয়ে আসি। ইলেকট্রিক ও টেলিফোন বিল, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স ইত্যাদি যখন আসে তখনও আমিই দিয়ে থাকি। রায়সাহেব মাঝে মাঝে থোক টাকা পাঠান। একটা আলাদা খাতাতে জমাখরচের হিসেবও

আমাকেই রাখতে হয়। তাতে অসুবিধে হয় না কোনও। কারণ, আমি বি কম পাস করেই ল পড়ি। ইচ্ছে ছিল সি. এ. পড়ার। কলকাতার একটি নামী ফার্মের সঙ্গে বাবা কথাও বলে রেখেছিলেন। কিন্তু যেবার এন্ট্রাস পরীক্ষা দেব সেবারই বাবা একদিন হঠাৎ অফিসেই স্ট্রোক হয়ে চলে যান। তাঁর রিটায়ার করার কথা ছিল পরের বছর।

মা, বাবার মৃত্যুর পরেই বারবার বলতে লাগলেন, সি. এ-র মতো কঠিন পরীক্ষায় পাস করতে অনেকদিন লাগবে। তাও শুনি, অনেকে পাসই করতে পারে না। তুই আমার বড় ছেলে, রোজগার যত তাড়াতাড়ি করিস ততই ভাল। বাবার মৃত্যুর পরই কাকা বাবার কাছে এসে মাকে বলে গিয়েছেন যে রন্টুর ভার আমাকেই নিতে দাও বৌদি। আমার তো ছেলে নেই। মিনতিও তো স্কুলে পড়ায়। বিয়ে করবে না বলেছে। ফাইনাল ডিসিশন। তা আমার প্রফেশন বাইরের কেউ নিয়ে নেবার চেয়ে দাদার ছেলেকেই তৈরি করে দিয়ে যাব। হাজারিবাগ ছোট জায়গা হলেও কোনও জায়গাই এখন আর ছোট নেই বৌদি। জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে। তাছাড়া ঝাড়খণ্ড আলাদা রাজ্য হয়ে যাওয়াতে স্কোপও বেড়েছে অনেক। রন্টুকে আমি রাঁচিতে পাঠাব হাইকোর্টে। ভগবান করলে ও-ও রাঁচির নামী উকিল হয়ে উঠবে একদিন। আমি তো সারাজীবন সেশানস কোর্টের ঘানি টেনেই মরলাম। এত কেস, কিন্তু সবই ছোটোখাটো। সামান্য ফিস। গরিবদের তো ফেলা যায় না। ওরাই বা যাবে কোথায়, কেউ না দেখলে। তাদের ভিড়েই হিমসিম খাই। হাইকোর্টে আর এ জীবনে যেতে পারলাম কই? রন্টুর তো ল-এর দু-বছর হয়েই গেছে। ফাইনাল পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দাও হাজারিবাগে। প্রথমবার তুমি নিজেও সঙ্গে এসো। ছেলে কোথায় থাকবে, কী করবে সব দেখে যাবে। এতবার বললাম, তোমরা তো একবারও হাজারিবাগে এলে না দাদা থাকতে।

তোমার দাদা ছুটি পেলেই তো সব ধর্মস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। জানোই তো সে কথা গোপু।

তা আমাদের হাজারিবাগ কি অধর্মের জায়গা। সত্যি! দাদার কতকগুলো ফিক্সেশন ছিল বটে।

কাকা নাকি বলেছিলেন মাকে।

সেই সূত্রপাত, এই অধম রথীন সামন্ত বি কম, এল. এল. বি-র হাজারিবাগে মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসার। দেখতে দেখতে দুবছর হয়েও গেল। হিন্দিটা ভালই রপ্ত করেছি তবে হাজারিবাগী হিন্দি বলতে আরও সময় লাগবে।

বিমল বসাক যখন পাটনা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন তখন রাঁচিতে এলে ছুটি-ছাটা পড়লে কখনও কখনও রায়সাহেবের 'The Retreat' -এ এসে থাকতেন। ওঁরা একসঙ্গে ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন বিলেতে। ভারি ভালমানুষ ছিলেন। আমার

সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেছিল। রাঁচিতেও বিহার চিফ জাস্টিসের একটা সুন্দর বাড়ি ছিল। আমাকে বসাক সাহেব একবার সে-বাড়িতে নিয়েও গেছিলেন। জাস্টিস বসাক রিটায়ার করার পরেই মারা যান কলকাতায়।

কাকা বলতেন, বসাক সাহেব একটু বেশি ভাল মানুষ ছিলেন এবং জাগতিক ব্যাপারে বুদ্ধি খুব কমই রাখতেন নইলে মানুষ এমন করে ঠকায় ওঁকে।

কেন বলতেন জানি না। কিন্তু বলতেন। কে ঠকালো, কেন ঠকালো তা বিস্তারিত বলতেন না।

কাকা আজকাল লাঞ্চ অবধি কোর্ট করেন। বড় মামলা সব সকাল সকালই হয়ে যায়। যদি নাও হয় তবে আমি সামলে নিই। লাঞ্চ-এর সময়ে বাড়ি এসে প্রায় তিনটে নাগাদ খেয়ে উঠে দুঘণ্টা ঘুমোন। তারপর উঠে চা খেয়ে চেম্বারে বসেন।

কোর্ট থেকে, দেওয়ানি ফৌজদারি সব কেস সেরে আমার বাড়ি ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বাজত। চা-টা খেয়ে আমিও সেরেস্তাতে হাজির হতাম। শনিবার বিকেলে এ রবিবার বিকেলে একটু ছুটি পেতাম। এক আধজন বন্ধু-বান্ধব জুটেছে।

আমার খুড়তুতো দিদি মিনুদি কথাবার্তা কম বলে। কানাঘুষোয় শুনেছি, কোডারমার এক মাইকা মারচেন্টের সঙ্গে ভাব হয়েছিল মিনুদির। ভদ্রলোক ভাল মানুষ এবং দেখতেও ভাল ছিলেন, অবস্থাও ভাল। কিন্তু আমাদের পদবি সামন্ত আর তাঁর পদবিও সামন্ত ছিল। এই কারণেই কাকা বেঁকে বসেছিলেন। বিয়ে দেননি। সেই অভিমানে মিনুদি বিয়ে করেনি। আর সে ভদ্রলোকও বিয়ে করেননি। ভদ্রলোকের নাম নাকি সুব্রত সামন্ত। পড়াশুনাও কলকাতাতেই করেছিলেন। মাইকার ব্যবসা এখন রং চটে গেছে তবে সব মাইকা খাদানের মালিকেরাই এক সময়ে পিটিয়ে পয়সা বানিয়েছেন। সুব্রতবাবুদের পারিবারিক অবস্থা খুবই ভাল। তাঁরা এক ভাই এক বোন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে জামশেদপুরের টেলকোর এক অফিসারের সঙ্গে। সুব্রতবাবু এখনও অবিবাহিত। হয়তো মিনুদির জন্যেই। মিনুদির নামে মোটা খামে চিঠি আসে প্রায়ই। আর কাকা যখন ঘুমোন তখন টেলিফোনও আসে কোডারমা থেকে। আমি ধরেছি দু-একবার। চমৎকার গলা, কথা বললেই বোঝা যায় অত্যন্ত মার্জিত, শিক্ষিত মানুষ।

মিনুদির বয়স এখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে হয়তো। এখানেই মেয়েদের একটা স্কুলে পড়ায় সকালে। কেমন টিপিক্যাল দিদিমণি দিদিমণি ভাব হয়ে গেছে। বাড়িতে যখন থাকে, হয় স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখে নয় লাইব্রেরি থেকে আনা বাংলা বই পড়ে। টিভি তো একেবারেই দেখে না। মিনুদি কথা খুবই কম বলে, তাই বাড়িতে আমার দমবন্ধ লাগে। মিনুদি কিন্তু আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করে। খুব কড়া ঘুমের ওষুধ দিলে যেমন মস্তিষ্কে ঘা দিয়ে মানুষ ঘুমোয় কাকার সিদ্ধান্তটাও মিনুদির

স্বাভাবিকতাকে খানিকটা রুদ্ধ করে দিয়েছে।

কাকিমা তো চলে গেছেন দশবছর হল মোটর অ্যাক্সিডেন্টে। ধানবাদ থেকে চাস হয়ে হাজারিবাগে আসছিলেন। মিনুদিও সংসারের কিছুই দেখে না। তাই বাড়িতে কাজের লোকেদের মোচ্ছব। ইচ্ছে হলে খেতে দেয়, নইলে দেয় না। তাই ছুটি পেলেই এবং যখন কোর্ট বন্ধ থাকে তখন আমি হাজারিবাগের চারদিকে ঘুরে বেড়াই। এখানে অনেক জঙ্গলও আছে। দু'একজন বাঙালি ও বিহারি বন্ধুবান্ধব হয়েছে। যে কথা পরে বলছি।

সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে চা-জলখাবার খেয়ে সেরেস্তাতে যেতেই কাকা বললেন, রন্টু, তোর এখন সেরেস্তা করতে হবে না। একবার এক্ষুনি The Retreat-এ যা। স্যার রাঁচি থেকে ফোন করেছিলেন। কাল ভেস্টিবিউলে বিকেলে কোডারমাতে এসে নামবেন স্যারের ছেলের শালীর মেয়ে এবং তার এক বন্ধু, মানে বান্ধবী। তোকে রিসিভ করতে যেতে হবে। মগনলালকে বলে দিয়েছি একটা ভাল কন্ডিশনের গাড়ি আমার এখানে দুপুরে পাঠিয়ে দেবে। তুই গাড়ি নিয়ে চলে যাবি কোডারমা স্টেশনে। ওঁরা যতদিন থাকবেন গাড়িটা ওঁদেরই ডিউটি করবে এবং The Retreat-এই থাকবে। মগনলালকে আমি সে কথা বলে দিয়েছি। আর এই কদিন তোর কাজ আমিই না হয় সামলে দেব, তুই ওদের দেখাশোনা করবি। স্যার আমাদের জন্যে অনেক কিছু করেন। আমরা বটগাছের ছায়াতে আছি। উনি মাথার উপরে থাকলে তোর ভবিষ্যতের চিন্তা নেই।

ভাবলাম, স্যার কি সত্যিই বটগাছ, যে একশো বছর বাঁচবেন। সত্তর তো পেরিয়ে গেছে। আর কদিন বাদেই তো ফট হবেন। এমন লং-টার্ম প্ল্যানিংয়ের কী মানে হয় কে জানে! আর কারও উপরেই অত নির্ভর করতে আমার ভাল লাগে না। সেটা অসম্মানেরও।

আমি শুনে বললাম, মিনুদিকে বলো না কাকা! আমি মেয়েদের কী দেখাশোনা করব? পারব কি? তাঁদেরও অসুবিধে হবে হয়তো।

তোর মিনুদিকে আমি কোনও অনুরোধই করি না। তুই তো সব জানিস। তাছাড়া স্যার তোর কথাই বলেছেন।

মনে মনে ভারি বিরক্ত হলাম। স্যার ব্যারিস্টার হতে পারেন, কাকার সিনিয়রও হতে পারেন, কিন্তু এ কি ঝক্কি! আমি ওঁর বাড়ির দেখাশোনা করি বলে কি ভদ্রলোকের ছেলেকে দিয়ে চাকর-বাকরের কাজ করাবেন। দুজন কলকাতার মেয়ে। কী স্যাম্পল এসে হাজির হবে কে জানে। স্যারের ভাইয়ের শালীর মেয়ে এবং তার বান্ধবী! তাদের কী বলে সম্বোধন করব? ম্যাডাম?

কলকাতাতে যে কতরকম মাল থাকে। কী ধরনের মাল আসছে কে জানে!

ডিলাক্স গাড়িটা সম্ভবত সপ্তাহে তিনদিন আসে কোডারমাতে। যায় দিল্লি। এটা কি রাজধানী এক্সপ্রেস? হতেই পারে। আমি সেই যে এসেছি আর যাইনি কলকাতাতে। এইবার গরমের ছুটিতে যাব। আমার ছোটবোন চামেলি দুটি টিউশনি করে। সেই টাকা দিয়ে আমার জন্যে প্যান্টালুন থেকে একটি নেভি ব্লু রঙা গেঞ্জি আর জিনস পাঠিয়েছিল আমার জন্মদিনে। আমি প্রতি মাসেই মাকে দশ হাজার করে পাঠাই। বাবার সঞ্চয় তো আছেই। পুরোনো দিনের ভাড়ার বাড়ি। ভবানীপুরে। বাড়িওয়ালা খুবই ভাল। বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাই মা আর বোনের চলে যায়। কখনও-সখনও বেশিও পাঠাই। মায়ের ও চামেলির জন্মদিনেও টাকা পাঠাই। কিন্তু মাকে পাঠিয়ে আমার হাতে পাঁচশ টাকাও থাকে না। থাকা-খাওয়া অবশ্য ফ্রি কাকার বাড়িতে।

সামনেই চামেলির জন্মদিন। এখানে তেমন কিছু বিশেষ জিনিস নেই পাঠাবার। চামেলিকে, এবারে যখন আসব কলকাতা থেকে, তখন নিয়ে আসব। চারধারের জঙ্গল পাহাড় দেখিয়ে দেব। মিনুদিকেও জোর করে সঙ্গে নেব। চোখের সামনে একজন সুন্দরী প্রাণবন্ত মেয়ের এমন শুকিয়ে যাওয়াটা চোখে দেখা যায় না। কাকা অন্য প্রজন্মের মানুষ। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারেননি। বলি, একটা কম্পিউটার কিনি—কেবলই বাধা দেন, বলেন এই টাইপ মেনিশনেই তো চালিয়ে এলাম এতকাল। ডিক্টেশনও দেন না। স্টেনো নেই। বুঝতে পারি কিছুদিনের মধ্যেই কাকার সঙ্গে আমার ফাটাফাটি হয়ে যাবে। মিনুদিও একটা কারণ।

ট্রেনটা এসে গেল। এই স্টেশনে তেমন বেশি ঝিং-চ্যাক মানুষ নামে না। দুজন মেয়ে নামলেন। দুজনের পরনেই ফেডেড জিনস এবং কটনের টপ। মাসটা মার্চ কিন্তু এখনই বেশ গরম পড়ে গেছে। তবে সন্ধের পরে খুব প্লেজেন্ট। মেয়েদুটির মধ্যে একজন খুব ফর্সা অন্যজন কালো। দুজনকেই সুন্দরী বলা চলে। অবশ্যই সৌন্দর্যের চেয়েও যা বড় কথা, আলগা চটক সেটা অবশ্যই আছে। ওয়েল-অফফ পরিবারের মেয়েরা আবার যদি লেখাপড়াতেও ভাল হয় তবে এই নারী প্রগতির দিনে তাদের ওপর একটা অন্য ধরনের ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়। অবশ্য পড়াশোনাতে ভাল কি না জানি না। আমার কল্পনা। বড়লোক হওয়াটাই যথেষ্ট কোয়ালিফিকেশন। বড়লোকেরা মনে করেন না তাঁদের অন্য কোনও কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন আছে।

আমি এগিয়ে হাত জোড় করে বললাম, নমস্কার।

আমিও একটু মাঞ্জা দিয়েই গেছিলাম। মানে, জন্মদিনে চামেলির দেওয়া জিনস আর নেভি ব্লু গেঞ্জিটা। আমার বিহারি বন্ধু, হর্ষদ যে ডি ভি সি-তে কাজ করে, এই গেঞ্জিটা পরলে বলে তুঝকো তো আজ শাহরুখ খান যেইসা লাগ রহা হায় ইয়ার। ছোকরিয়োকি হালত খারাপ কর দেগা তু আজ।

সিনেমা-টিনেমা আমি দেখি না, টিভিও না, বি বি সি আর দিল্লির খবর দেখি। ই টিভিতে এবং ঋতুপর্ণ দেখি, ব্যস। তবে গত রবিবারেই হর্ষদদের পাল্লাতে পড়ে "কভি খুশি কভি গম" দেখলাম। শাহরুখ খান আছে বলেই দেখার ইচ্ছা ছিল। তবে বিজ্ঞাপনে দেখেছি ওকে, আর রানি মুখার্জিকে। কাজলকে এই প্রথম দেখলাম। ভালই। বেশ ভাল।

আমার বাবা বলতেন সৌন্দর্য ভগবানের এক বিশেষ দান। নির্গুণ সৌন্দর্যেরও এক বিশেষ দাম আছে কারণ গুণ মানুষ ইচ্ছে করলে অর্জন করতে পারে সৌন্দর্য শুধুমাত্র বিধাতাই দান করতে পারেন।

আমার মা পরমা সুন্দরী তাই বাবার এই কথার পেছনে এক তাৎপর্য ছিল। মায়ের অবশ্য গুণও ছিল অনেক। খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। এখনও মন খারাপ হলে অথবা খুব আনন্দ হলে গান করেন। ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। চামেলিও খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। গীতবিতান থেকে ডিপ্লোমা পেয়েছে। সত্যিই ভাল গায়। নিজের পয়সা দিয়ে হাজারো 'আর্টিস'-এর মতো ক্যাসেট বের করেনি যদিও।

আমার নমস্কারের বদলে মেয়ে দুটি হাত নেড়ে বলল, হাই!

আমি নমস্কার বলে ফেলেছি, তাই চুপ করে রইলাম।

তারপর ফর্সা মেয়েটি, যে বেশ লম্বাও, বলল, আপনি?

আমার নাম রথীন সামন্ত।

অন্যজন বলল, সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিভূ বুঝি?

মুখের উপরে ফটাস করে যোগ্য জবাব দিতে পারতাম কিন্তু এঁরা যে কাকার স্যার, ব্যারিস্টার ধীরেন রায়ের ভাইয়ের শালীর মেয়ে এবং তার বন্ধু। কে কোনজন জানি না অবশ্য। আমার যে তাদের সবসময়েই যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে হবে।

আমি ওদের ছোট স্যুটকেস দুটো দুহাতে তুলে নিয়ে বললাম, ম্যাডাম, আমাদের ওভার ব্রিজ পেরোতে হবে।

লম্বা মেয়েটি বলল, ম্যাডাম আবার কী সম্বোধন? আপনি কি ফাইভস্টার হোটেলের বেল বয়? নাম ধরে ডাকবেন আমাদের। বয়সে আমরা আপনার চেয়ে ছোট অথবা সমান বয়সীই হব।

অন্য মেয়েটি বলল, আমার নাম শেলি আর ওর নাম মলি। মলিই হচ্ছে রায়সাহেবের নাতনি আর আমি ওর বন্ধু।

মলি আর শেলি শুনে আমার হাত থেকে স্যুটকেস দুটো খসে যাচ্ছিল। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, সুন্দর নাম।

মলি বলল, আপনি যে কুলি ডাকলেন না, নিজেই স্যুটকেস দুটো তুললেন তা

দেখেই বুঝতে পারছি আপনি ফিউডাল নন। ভেরি মডার্ন। আপনি কি স্টেটসে ছিলেন কখনও?

স্টেটসে না থাকলে কি মডার্ন হওয়া যায় না?

মলি চকিতে শেলির দিকে তাকাল।

শেলি বলল, প্রশংসা করলে আপনি চটে যান দেখছি। অদ্ভুত তো আপনার স্বভাব!

এমনই স্বভাব। কী করা যাবে বলুন? কথায়ই বলে, স্বভাব যায় না মলে।

মলে মানে?

মলে মানে মরণে।

হাউ নাইস।

শেলি বলল।

আমি বললাম, আমরা ওভারব্রিজ পেরিয়ে যেদিকে নামব সেদিকটা কিন্তু কোডারমা নয়।

আমরা কি ভুল ডেস্টিনেশনে এলাম?

তা নয়, এদিকটার নাম ঝুমরি তিলাইয়া।

মলি বলল, আরেকবার বলুন। হাউ সুইট নেম।

বললাম, ঝুমরি তিলাইয়া। আর উল্টোদিকটা কোডারমা। অভ্রর জন্যে একসময়ে বিখ্যাত ছিল।

অভ্র মানে?

মানে, অভ্র।

শুভ্র জানি। অভ্রটা আবার কী জিনিস?

মাইকা।

ও মাইকা। তাই বলুন!

এমন সময় মলি বলল, এইখানেই তো সুব্রতদা থাকেন। সুব্রতদারও পদবি সামন্ত। ওঁদেরও মাইকা মাইনস ছিল এক সময়ে। চেনেন?

আমার বুক ধক করে উঠল। বলল, চিনি না ঠিক। তবে নাম শুনেছি।

চেনেন না অথচ নাম শুনেছেন কেমন?

ওই আর কী।

ওই আর কী মানেটা কী? আপনারা কি বাঙাল? বাঙালরা কথায় কথায় বলে ইসে, বলে, করে ইরে। ই-এর ভক্ত খুব।

বলেই, শেলি মলির দিকে ফিরে বলল চন্দ্রিমা বলে নারে সবসময়ে?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, না আমরা তো পুব বাংলার লোক নই।

যাকগে, সুব্রতদার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবেন?

চেষ্টা করব।

আর কী কী করবেন আপনি আমাদের জন্যে? মানে, কী কী করতে পারেন?

যা বলবেন তাই করব। মানে, করতে পারি।

শেলি বলল, আপনাকে আমরা কিছুই করতে বলব না।

কিন্তু, কোনও পার্টিকুলার কিছু করতে না বললে আপনাদের কানহারী পাহাড়ে নিয়ে যাব। সীতাগড়া এবং সিলওয়ার-এও নিয়ে যেতে পারি। হাজারিবাগ শহরের তিনদিকে তিন পাহাড়। ছাড়োয়া লেক দেখাব। হারহাত বাংলোতে একদিন পিকনিক হতে পারে। হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কে নিয়ে যাব একদিন। টাইগার ট্র্যাপ দেখাব, যেখানে রামগড়ের রাজা বাস করতেন। আর এখনি হাজারিবাগ যাওয়ার পথে দেখাব তিলাইয়া ড্যাম। ডি ভি সি-র সুন্দর সুন্দর কটেজ আছে এই ড্যামের ওপরে। ইচ্ছে করলে একদিন এরই কোনও কটেজে ডে স্পেন্ড করতে পারেন। একদিন টাটিঝারিয়াতে নিয়ে গিয়ে গোলাপজামুন আর নিমকি খাওয়াতে পারি, টুটিলাওয়া হয়ে সীমারিয়া নিয়ে যেতে পারি একদিন। চাতরাতেও যেতে পারি। দারুণ পান্তুয়া আর সিঙাড়া খাওয়াতে পারি। দুদিন সময় দিলে পালামৌ ন্যাশনাল পার্কেও ঘুরিয়ে আনতে পারি তবে ড্রাইভটা একটু লম্বা হয়ে যাবে.....

আপনি কি ট্র্যাভেল এজেন্টের লোক?

আজ্ঞে না ম্যাডাম।

আবার ম্যাডাম। আর আপনি আজ্ঞে করবেন না তো। বলেছি তো মলি আর শেলি আমাদের নাম।

ওটি পারব না। নাম ধরে ডাকতে বলবেন না। ওটি আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

কেন?

ওই যে গাড়ি সামনেই। আপনারা উঠে বসুন আমি স্যুটকেস দুটো বুটে তুলে দিচ্ছি।

আচ্ছা ম্যাডাম।

আবার ম্যাডাম!

সরি। আসলে আপনারা এত উঁচু রেফারেন্স নিয়ে এসেছেন আর আমি এতই সামান্য মানুষ যে আপনাদের নাম ধরে ডাকলে কাকা আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন।

আপনার নিজের কোনও পার্সোনালিটি নেই। আপনি কি পরগাছা? কাকা তাড়িয়ে দিলে আপনি কি না খেয়ে থাকবেন?

প্রায় তাই।

কী করেন আপনি? ট্র্যাভেল এজেন্সি চালান না তো?

আমি উকিল। আমার কাকা, স্যারের স্নেহধন্য।

স্যারটা কে?

মিস্টার ধীরেন রায়, ব্যারিস্টার।

ও বড় দাদু। বড় দাদুকে আমরা বলে দেব। উনি কি আমাদের চেয়েও আপনার কাকার বেশি আপন?

না, না, তা কী করে হবে।

অ্যাম্বাসাডার গাড়ির দরজা খুলে উঠেই মলি বলল, এ কী, এসি নেই গাড়িতে?

ড্রাইভারের নাম সামসের। জ্ঞানপাপীর মতো বললাম, ক্যারে সামসের? এসি নেই হ্যায়?

এসি গাড়ি কি লিয়ে তো নেহি বোলিন থে। ঔর এসি গাড়ি তো মগনলাল কোম্পানিকা স্রিফ দোহিঠোই হ্যায়। দোহি তো নিকাল গ্যয়া সুব্বেহি।

আমি বললাম, সরি। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। হাজারিবাগে পৌঁছেই আমি বন্দোবস্ত করব। পথ বেশি না, তিলাইয়া লেকের পাশ দিয়ে হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কের পাশ দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে চলে যাবেন, গরম লাগবে না।

শুধু কি গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই মানুষে এসি গাড়ি ইউজ করে?

তবে?

পল্যুশান, নয়েজ পল্যুশান, ধুলো। না না, উই আর ইউজড টু এসি কার।

মলি বলল, দাদুকে বলি না যে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। সত্যিই দ্যা ওল্ড ম্যান হ্যাজ বিকাম আ ফুল অ্যাজ অল ওল্ড ম্যান আর।

তা কেন। উইসডম তো ওল্ড এজেই আসে।

মিন মিন করে বললাম আমি রায়সাহেবকে শ্রদ্ধা করি বলে।

শাট আপ।

ফটাস করে বলল মলি। যেন, বেলুন ফাটল।

নিজের কাজ করতে পারেন না আবার পুটুর পুটুর করছেন।

তারপরই বলল, আপনি কী করেন বললেন না তো এখনও।

বলেছি তো।

কী করেন?

ওকালতি।

কার হয়ে?

যে পয়সা দেয় তারই হয়ে। অনেক সময়ে বিনা পয়সাতেও করি, খুব গরিব মক্কেল হলে।

আমরা যদিও গরিব নই, মিথ্যে কথা কেন বলব, কিন্তু আমাদের হয়ে ওই

ওকালতিটা দয়া করে করুন।

কোন্ ওকালতি?

এসি কার।

ওঃ। ওটা হয়ে যাবে। প্রয়োজনে হাজারিবাগ শহরের সব গ্যারাজে খোঁজ নেব। অনেকেই আমাদের মক্কেল তো। অসুবিধে হবে না। প্লিজ বিয়ার উইথ মি। এবারের মতো ক্ষমা করুন।

ওক্কে। ফাইন। উ আর আ নাইস গাই। কিন্তু আপনার ভাল নামটা বড্ড ব্যাকডেটেড। রথীন। রথীন আবার একটা নাম হল? রথীন মানে কী?

এই রে। কখনও তো মানে খুঁজিনি।

জানতাম। আপনি নিজে যেমন সাইফার, কাকার দয়াতে বেঁচে আছেন, আপনার নামটিও তাই। যে মানুষ একটা অর্থহীন নামকে সারাজীবন বয়ে বেরাতে পারে তাকে তো হিউমিলিয়েটেড হতেই হবে। ডিসগ্রেসফুল।

শেলি বলল, আপনি আলাদা চেম্বার করুন। কাকার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। বড় দাদুকে বলে আই উইল গিভ উ অল দ্যা হেল্প। আপনার লজ্জা করল না বলতে যে কাকা তাড়িয়ে দেবেন?

ওটা কথার কথা। কাকা আমার পিতৃতুল্য। আমার বাবা নেই। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমিই ওর সাকসেসর। ওঁর সব মক্কেল আমিই পাব। ও নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না।

আপনারা মানে কী? মলি বলল।

শেলি বলল, চলো ড্রাইভার। কেয়ারফুলি চালাও।

মলি আবার বলল, আপনারা মানেটা কী? আমাদের কি নাম নেই।

প্লিজ এটা আমাকে করতে বলবেন না। আপনারা রায়সাহেবের বাড়িতে না উঠে যদি অন্যত্র উঠতেন তবে অন্য কথা ছিল। আপনাদের নাম ধরে আমাকে ডাকতে বলবেন না। প্লিজ। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড!

মলি বলল।

শেলি বলল, সনির্বন্দ না কী কথাটা বললেন, তার মানে কী?

সনির্বন্দ নয়, সনির্বন্ধ।

ওই হল। মানে কী।

মানেটা ঠিক জানি না। অনেককেই বলতে শুনি, তাই বললাম।

নো ওয়াণ্ডার।

মলি বলল। যে মানুষ নিজের নামের মানেই জানে না সে যে রাইট অ্যাণ্ড লেফট ননসেন্স বলে যাবে এতে আর আশ্চর্য কি?

আমি চুপ করে রইলাম। গাড়ি চলছিল, তিলাইয়া ড্যামের পাশ দিয়ে। হু হু করে হাওয়া আসছিল। অতিথিদের চুল বিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

মলি বলল, ড্রাইভার। সিসা উঠা দো।

গরম লাগেগি মেমসাব।

তব রহনে দো।

শেলি বলল।

মলি বলল, ফ্রম দ্যা ফ্রাইং প্যান টু দ্যা আভেন।

আমি একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছিলাম। মেয়ে দুটি খারাপ নয়। বাইরের খোসাটা বড্ড শক্ত। ছাড়িয়ে নিতে পারলে শাঁস আছে। কিন্তু শেলি আর মলি। আমার কপালে কী যে আছে।

বললাম, এই যে নামের কথা বললেন, কিন্তু শেকসপিয়ার বলেছিলেন হোয়াটস ইন আ নেম।

শেকসপিয়ারও জানেন না কি আপনি?

জানাটা কি অপরাধ?

না, তা নয়। হাজারিবাগের ছোট উকিল তো। নাও জানতে পারতেন।

শেলি বলল, কলকাতায় কোন্ কলেজে পড়তেন?

সেইন্ট জেভিয়ার্স।

মলি লাফিয়ে উঠল, মাই মাই। আপনি জ্যাভেরিয়ান?

হ্যাঁ।

বি এ না বি এস-সি।

বি কম।

কোন্ ইয়ারে গ্র্যাজুয়েশন?

নাইনটিন এইট্টি সেভেন।

আমি তো এইট্টি নাইন-এ গ্র্যাজুয়েশন করে জে এন উ-তে যাই জিওগ্র্যাফিতে এম এ করতে।

এখন কী করছেন?

এম ফিল।

তারপর কী করবেন?

ইচ্ছে আছে স্কলারশিপের পরীক্ষাতে বসব। পেলে বাইরে যাব ডক্টরেট করতে কোনও আমেরিকান ইউনিভারসিটিতে।

তারপরই বলল, আপনার সঙ্গে আমার কলেজে দেখা হল না কেন?

কী করে হবে? আমার কলেজ তো সকালে ছিল।

ও তাই তো।

ল করেছেন কোথায়? পুনেতে না অন্য কোন একটা জায়গাতে শুনেছিল খুব ভাল।

বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। কোথাওই যাওয়া হয়নি। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ল কলেজে পড়েছি।

ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন না কেন?

সকলেই কি ব্যারিস্টার হতে পারে। আর হয়েই বা লাভ কী? এই আমার ইংরেজি শুনেই হাজারিবাগের জজসাহেব বলেন, সমঝে না, আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর ইংলিশ। প্লিজ স্পিক ইন ইন্ডিয়ান ইংলিশ।

মলি ও শেলি হেসে উঠল। বলল তাই?

আমি বললাম শেলিকে, তা আপনিও কি জ্যাভেরিয়ান?

না। আমি প্রেসিডেন্সি।

এখন?

দিল্লিতে ডি স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে এম এ করেছি। এম ফিল করছি এখন।

ও আপনারা তো দুজনেই দিল্লিওয়ালি তাহলে।

তাইই বলতে পারেন।

বললাম, নামের ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটা গল্প জানি। হয়তো শুনে থাকবেন।

কী গল্প?

ঠনাঠন দাস-এর।

সে আবার কী গল্প। শুনিনি।

ঠনাঠন দাস নামের একজন লোক ছিল। তার খুব দুঃখ যে বাবা-মা একটা এমন নাম দিলেন যা সমাজে অচল। সেজন্যে মনের দুঃখে সে একদিন আত্মহত্যা করতে গেল নদীতে ডুবে।

কিছুদূর যাবার পর সে দেখল একজন লোক মরে গেছে। তাকে চৌপাইতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। একটু পরে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হবে। তাকে ঘিরে আত্মীয়রা কাঁদছে।

ঠনাঠন দাস জিগ্‌গেস করল, ইনকো নাম ক্যা থা?

আত্মীয়রা বলল, অমরনাথ।

ঠনাঠন দাস একটু অবাক হল। ভাবল, যার নাম অমরনাথ সেই মরে গেল।

আরও কিছুদূর যাবার পরে পথে জঙ্গল পড়ল। জঙ্গল পেরিয়ে নদীতে যেতে হবে। ঠনাঠন দাস দেখল, একজন বৃদ্ধ লোক, শতচ্ছিন্ন একটা ধুতি হাঁটুর উপরে গুটিয়ে পরে ঘাস কাটছে জঙ্গলের মধ্যে। ঠনাঠন দাস জিগগেস করল, আপকি নাম ক্যা হ্যায়?

বৃদ্ধ বলল, ধনপত।

ঠনাঠন দাস ভাবল যে ধনপতি কুবের তার এই দশা?

আরও কিছুটা গিয়ে দেখল ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি পরে একটি মেয়ে বনপথের পাশে তিনভাগা মাছ নিয়ে বসে আছে। ঠনাঠনকে দেখেই সে বলল এক এক রূপাইয়া।

মানে একেক ভাগ এক টাকা।

ঠনাঠন জিগগেস করল, আপকি শুভ নাম?

সে বলল, লছমী। অর্থাৎ লক্ষ্মী।

স্বয়ং লক্ষ্মীরই এই অবস্থা। ভাবল ঠনাঠন।

তখন ঠনাঠন দাস আর নদীর দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে ফিরে বাড়ির পথ ধরল। বলল,

অমরনাথ যো সো মর গ্যয়ে হ্যায়
ধনপত কাটতে হ্যায় ঘাস
লছমী যো সো মছলি বিকতি হ্যায়
ভালাই ঠনাঠন দাস।

গল্প শেষ হতেই মলি আর শেলি হেসে লুটিয়ে পড়ল এ ওর গায়ে।

মলি বলল, আপনি তো খুব উইটি আছেন।

শেলি বলল, রথীন নাম নিয়ে বলাতে বেশ তো দিলেন আমাদের।

আমি বললাম, ওরকম বলবেন না ম্যাডাম। মনে পড়ে গেল তাই বলে দিলাম।

তারপর বললাম, এই যে দেখুন ডান দিকে হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কের কিছুটা। সামনেই গেট আছে ডানদিকে পার্কে ঢোকার। আর বাঁ দিকে শালপর্ণী বলে বনবিভাগের দোতলা একটি রেস্ট হাউস আছে। পার্কের বাইরে যদিও। তবে জঙ্গলের মধ্যেই। কাছেই একটি ঝরনা আছে। পিকনিকের আইডিয়াল স্পট।

নিয়ে আসবেন তো একদিন।

নিশ্চয়ই। ইওর উইশ ইজ আ কম্যান্ড টু মি। আপনাদের খিদমদ্গারি করার জন্যেই তো কাকা আমাকে ছুটি করে দিয়েছেন। কিন্তু কতদিন থাকবেন আপনারা?

বেশিদিন থাকলে আপত্তি আছে?

না, না, আপত্তির কী? আমি তো খুশিই হব। ওকালতি করার চেয়ে আপনাদের মতো সুন্দরী অ্যাকমপ্লিশড মহিলাদের খিদমতগারি তো অনেকেই ভাল কাজ। লোভনীয়।

শেলি বলল, কথা তো ভালই বলেন দেখছি।

চেহারাতেও শাহরুখ খান ভাব আছে।

সে কে?

আমি ন্যাকা সেজে বললাম।

ডোন্ট বি সিলি। আপনি শাহরুখ খানকে দেখেননি?

বিজ্ঞাপনে ছবি দেখেছি।

সিনামাতে দেখেননি?

সিনেমা আমি দেখি না।

কেন?

সময় পাই না। তাছাড়া ভাল হল এখানে কোথায়?

টিভিতে?

টিভি খুব কম দেখি আমি।

আপনার দিদির কথা বললেন, তিনি?

তিনি শুধু বই পড়েন। ইডিয়ট বক্সকে আমরা সত্যিই বয়কট করেছি।

যাকগে। দেখে থাকুন আর নাই থাকুন আপনার চেহারার সঙ্গে বেশ মিল শাহরুখ খানের।

মলি বলল, দেবদাস দেখবেন। শাহরুখ দেবদাস করেছে।

আর পারু?

পারু করেছে ঐশ্বর্য রাই। বলুন তাকেও দেখেননি?

তাকে দেখেছি ক্রিকেট খেলার সময়ে বিজ্ঞাপনে। কোক না পেপসির বিজ্ঞাপনে।

আর মাধুরী দীক্ষিত?

না, তাকে কাগজে ছবিতে দেখেছি—হুসেনের গজগামিনী ছবির স্টিল ফটো।

তারপর বললাম, পারু কে করেছে?

ওই যে বললাম, ঐশ্বর্য রাই।

আরে মাধুরী দীক্ষিত কোন্ রোলে?

চন্দ্রমুখী। দারুণ করেছে। দুজনের একটা ডুয়েট নাচ আছে, ফাটাফাটি। দেখবেন।

বাঃ মেমসাহেবদের মুখে ফাটাফাটি শব্দটা বেশ লাগল।

আপনার দিদির সঙ্গে কিন্তু আমরা আলাপ করব।

দিদি ভারি ইন্ট্রোভার্ট, লাজুক, একটা স্কুলে পড়ায়। এম এড করেছে।

আমরা বুঝি একস্ট্রোভার্ট? আলাপ না করিয়ে দিলে বড় দাদুকে রাঁচিতে ফোন করে নালিশ করব। বললাম সুব্রত সামন্তকে আপনারা চিনলেন কী করে।

আরে! সে তো অলটাইম হিরো। সে যে কী করতে কোডারমাতে বসে আছে কে জানে। আমরা কিন্তু গিয়ে একদিন সারপ্রাইজ দেব সুব্রতদাকে। খুব খুশি হবে।

বেশ তো! কোডারমা গেলে ওখান থেকে আপনাদের রজোলির বিখ্যাত ঘাট দেখিয়ে নিয়ে আসব। নাওয়াদা, পাওয়াপুরি সব।

ঘাট মানে?

ঘাট মানে পাহাড়শ্রেণী। তাতে পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে। এক সময়ে নিবিড় জঙ্গল ছিল। শুনেছি, খুব শিকার ছিল সেই সময়। হাজারিবাগ রাঁচির ছোটোপালু

ঘাটেরই মতো প্রায়ই পথে বাঘ পড়ত রাতের বেলা গেলে।

আমাদের বাঘ দেখাবেন?

বাঘ তো বাঁধা থাকে না। তাছাড়া বাঘ কি আর দেখা যায় তেমন আর এখন। জঙ্গলও শেষ, বাঘও শেষ।

দূর থেকে The Retreat-এর সাদা স্নোসেম রঙে রঙ করা মস্ত বাউন্ডারি ওয়াল দেখা গেল। দেওয়ালের উপর দিয়ে নানা ফুলগাছ উপচে পড়ছে রঙের দাঙ্গা লাগিয়ে। তাছাড়া চৈত্রমাস। বসন্ত যাই যাই করেও এঁরা আসবেন জানতে পেরেই আর যেতে না পেরে আটকে আছে। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জ্যাকারান্ডা আর বসন্তী গাছের শোভা দেখবার মতো। জ্যাকারান্ডা নাকি আফ্রিকান গাছ। হালকা বেগুনি ফুল ফোটে তাতে। গাছগুলো খুব লম্বা হয় না, মানে কৃষ্ণচূড়ার মতো হয় না আর অমন ছড়ানোও হয় না। হেড মালি অনেক কিছু জানে। সে জামতারাতে একটি নার্সারিতে কাজ করত। রায়সাহেব তাঁকে তিন ডবল মাইনে দিয়ে সেখানের চাকরি ছাড়িয়ে এনেছেন। বড়লোকদের এই দোষ। তাদের গুণও যা দোষও তাই। তাঁরা একাই সব ভোগ করবেন অন্যে কিছু পাবে না। শুনেছি, জামতাড়ার সেই নার্সারির হেড মালি শত্রুঘ্ন দাস চলে আসাতে নার্সারির প্রায় উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা। সেই নার্সারির মধ্যবিত্ত মালিকের ভারি দুরবস্থা। Have's-দের এই দোষ। Have not-দের দোষও আছে। বড়লোকবাবু টাকার থলি দেখিয়ে তু করে ডাকলেই তারা অতীত বর্তমান বিবেক সব ভুলে দৌড়ে চলে যায় টাকার লোভে। শুনেছি। জামতারার নার্সারির বটানিস্ট মালিক হাতে ধরে শত্রুঘ্নকে কাজ শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংসারে কুকুর বেড়ালের থাকলেও থাকতে পারে মানুষ প্রজাতির মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ বিরল।

বসন্তী গাছ হাজারিবাগে আর কারো বাড়িতে আছে বলে আমি জানি না। বসন্তোৎসবে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাবার বন্ধুর বাড়িতে, প্রীতিরঞ্জন রায়, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন-এর ডিরেক্টর ছিলেন, বসন্ত গাছ প্রথম দেখি। বসন্তে ভারা সুন্দর হলুদ ফুল আসে। গাছতলা ভরে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা মনে পড়ে যায় 'একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া, খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।'

মলি বলল, কী সুন্দর বাড়িটা? কার বাড়ি ওটা?

ওটাই আপনাদের বড় দাদুর বাড়ি। The Retreat। ওইখানেই তো থাকবেন আপনারা।

ওঃ গ্রেট।

দুজনেই সমস্বরে বলল।

গাড়িটা গেটের সামনে গিয়ে হর্ন দিতেই বেয়ারা নকুল, শত্রুঘ্ন এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট একেই সঙ্গে দৌড়ে এল গেটের কাছে। তাদের পেছন পেছন

অ্যালসেশিয়ান দুটোও দৌড়ে এল। শত্রুঘ্নর অ্যাসিস্ট্যান্ট কুকুর দুটোর দেখাশোনা করে। শত্রুঘ্ন অরিজিনাল মানুষ। যে তার সঙ্গে যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, বাংলা ইংরেজি বা হিন্দি সে ওড়িয়াতেই জবাব দেয়। মাতৃভাষাকে সে এত বছর যখন ছাড়েনি, চুপ পাকিয়ে ফেলেছে আর কখনও ছাড়বে বলে মনে হয় না। শত্রুঘ্ন বিড় বিড় করে বলল, মলি শেলিকে বান্ধিকি রাখিলানি কাই রে পিলা। রেধুয়া গুট্টে।

আমার মাথায় বজ্রপাত হল। কিন্তু শত্রুঘ্নর নিচু স্বরে বলা ওড়িয়া কথা মলি শেলির কানে যায়নি।

আমি জোরে বললাম, টম আর ডিককে রেঁধে রাখো নিজামউদ্দিন।

জি হজুর।

বলেই বলল, টম ডিক কওন হ্যায় হুজুর।

আমি বললাম, কুত্তা দোনোকো বাঁধকে রাখ্‌খো।

ততক্ষণে গাড়ি গেটের ভেতরে ঢুকে মোরামের লম্বা ড্রাইভওয়ে দিয়ে গিয়ে পোর্টিকোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর গাড়ির পেছনে পেছনে নিজামউদ্দিন, শত্রুঘ্ন, নকুল, বনমালী এবং মলি শেলি দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

আমি সামনের সিট থেকে মুখ বের করে গলা তুলে বললাম কুত্তা দোনোকো বান্ধো তুমলোগ পহেলে।

গাড়ি থামলে, ওঁরা নামলেন। এবার আর আমায় মাল নামাতে হল না। ক্যাপিটালিস্টদের বাড়িতে প্রলেতারিয়েতদের নানা স্তর থাকে। ক্লাস। এখানে সোপানের সবচেয়ে উপরে আমি, কেয়ার-টেকার। ওরা সব আমার অধস্তন স্টাফ।

আমি নকুলকে বললাম, বড়া সাহেবের কামরা ছেড়ে মেমসাহেবদের সব কামরা দেখাও। উপরে ও নীচে। যেখানে ইচ্ছে হবে থাকবেন ওঁরা আলাদা আলাদা ঘরে।

বড়লোকেরা এবং সম্ভ্রান্তরা আলাদা আলাদা ঘরেই থাকেন। যতই বন্ধুতা থাক, আত্মীয়তা থাক, রক্তের সম্পর্ক থাক, থাকাটা আলাদা ঘরেই। প্রাইভেসির জন্যে। যার আরও বড়লোক, রাজা মহারাজা, তারা আলাদা ঘরে নয়, আলাদা মহলে থাকেন। এটা জানি বলেই বললাম।

ওই পাহাড়টার নাম কী?

কানহারী।

আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, ওইটার?

ওটার নাম সিলওয়ার। আর সীতাগড়া এখান থেকে দেখা যাবে না, অন্যদিকে।

এমন সময়ে মগনলালের ড্রাইভার বলল, করে ক্যা? আপলোগনে তো জঙ্গলমেহি ঘুমিয়ে গা, ইকবো জিপোয়া লে কর আয়েগা ক্যা?

শেলি শুনে বলল, জিপোয়াটা আবার কী জিনিস?

জিপোয়া মানে জিপ। হাজারিবাগী ভাষাটাই এরকম। এরা জিপকে বলবে জিপোয়া, বাঘকে বলবে বাঘোয়া, টাঁড়কে বলবে টাঁড়োয়া।

মলি বলল, রথীনকে বলবে রথীনোয়া?

আমি হেসে বললাম, বললেই হয়, তাব এখনও কেউ বলেনি।

আমরা বেশ বলব।

আপনারা যা খুশি তাই বলতে পারেন। আপনারা আমার মালকিন।

হিন্দি সিনেমা না কি দেখেন না?

না। শব্দটা হিন্দি তাই জানি। মালিক—মালকিন। মক্কেলদের সঙ্গে তো হিন্দিতেই কথা বলতে হয়। এবারে ঘর দেখুন।

ঘর দেখার আগে বাগানটা দেখি।

গাড়ির কথা কী বলব? এয়ারকন্ডিশন গাড়ি তো নিয়ে আসতে পারে কিন্তু জিপ যদি আসে জিপ তো এয়ারকন্ডিশনড হবে না।

আপনি ড্রাইভ করতে পারেন?

পারি। আমাদের তো গাড়ি ছিল। বাবার মৃত্যুর পরে বিক্রি করে দিয়েছি।

তবে তো পারেনই। আমরাও পারি তবে জিপ কখনও চালাইনি।

তারপর মলি শেলির দিকে ফিরে বলল, কী করবি রে? জিপ চড়বি? উনি ড্রাইভ করবেন আমরা বদলে বদলে পাশে বসব আর ড্রাইভার পেছনে।

খুব ধুলো লাগবে কিন্তু। লাল ধুলো। যাত্রা শেষে নিজেদের আর চিনতে পারবেন না।

শেলি বলল তাই? বাঃ দারুণ হবে। আমরা বড় পুরোনো হয়ে যাচ্ছি। গেটিং টায়ার্ড অফ আওয়ারসেলভস। প্রতিবার কোথাও যাওয়ার পরে যদি বদলে যাই তো বেশ হবে।

গ্রেট।

মলি বলল।

শেলি বলল, তাই ঠিক হল তাহলে। এসি গাড়ি নয়, জিপই চাই।

জিপোয়া।

মলি বলল।

এবং রথীনোয়া।

শেলি বলল।

আমি ভাবছিলাম, কাকার জন্যে কত হেনস্তাই না সহ্য করতে হবে। নাঃ। ভদ্রলোকের ছেলের ওকালতি করা উচিত নয়। জজ সাহেবদের জি হুজৌর জি হুজৌর করতে হয় তাও বোঝা যায়। কিন্তু সিনিয়রের সিনিয়রের ভাইয়ের শালীর মেয়ে এবং তাঁর বন্ধুকেও অমন করতে হবে। নাঃ। এভরিথিং শুড হ্যাভ আ লিমিট।

এবার ঘর পছন্দ করুন।

আমরা ভাবছি এক ঘরেই থাকব। একে জায়গা হাজারিবাঘ, তারপর এত বড় বাড়ি। আমাদের আলাদা ঘরে শুতে ভয় করবে।

শব্দটা হাজারিবাঘ নয় হাজারিবাগ। বাগ মানে বাগিচা।

ওঃ তাই?

তাহলে বলুন দোতলাতে কোন্ ঘরে থাকবেন?

যে ঘর থেকে কানহারী পাহাড় দেখা যায়।

ফাইন। তারপর বললাম, এখন চা খাবেন তো?

তা খেতে পারি। আপনি খাবেন না?

আমি নীচে বাবুর্চি খানাতে খেয়ে নেব। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে রাতে কী খাবেন তার অর্ডার দিয়ে দেবেন।

নিজামুদ্দিন খুব ভাল কুক। গগনলাগ্গার রাজার বাড়ির কুক ছিল। রায়সাহেব তাকেও ডাবল মাইনে দিয়ে ভাগিয়ে এনেছেন। আসলে আপনাদের বড় দাদু এসব কিছুই করেননি, করেছেন আমার কাকা। উনি শুধু বলেছিলেন এ তল্লাটের বেস্ট খিদমদগার আমার চাই। টাকার জন্যে চিন্তা কোরো না, তুমি জোগাড় করো। আর আমার কাকা ক্যাসাব্লাঙ্কার মতো নির্দেশ পালন করেছেন।

নিজামুদ্দিন, ইংলিশ, চাইনিজ, মোগলাই সবই চমৎকার রাঁধে। ডেসার্টস যা বানায় তা ঝাড়খণ্ডের গভর্নরের কুকও বানাতে পারবে না। আপনারা শুধু অর্ডার দেবেন। আমাকেও। ইওর উইশ ইজ আ কম্যান্ড টু মি।

বারবার এক কথা বলবেন না তো। ক্লিশে হয়ে যাচ্ছে। স্টপ ইট। উই আর ফ্রেন্ডস। আপনি আমাদের নাম ধরে ডাকবেন আর আমরাও আপনাকে রথীন বলে ডাকব।

রথীনোয়া।

আপনারা আমাকে নাম ধরে ডাকলে খুশিই হব, ইজি ফিল করব কিন্তু আমাকে আপনাদের নাম ধরে ডাকতে বলবেন না।

তারপর বললাম, আমার ডাকনাম রন্টু। আমাকে রন্টু বললেই খুশি হব। আপনাদের ডাকনাম নেই!

আমাদের নামগুলো এত ছোট যে আরও ছোট করেননি কেউ সে কারণেই। মলি বলল।

তারপর বলল। বাবা অবশ্য বুড়ি বলে।

শেলি বলল, আমার বাবা ডাকেন খুকু বলে।

আমি বললাম বাঃ একজন বুড়ি অন্যজন খুকু। যদি অনুমতি করেন তো ডাকনাম ধরেই ডাকব।

দুজনেই বলল, বেশ। তাই হবে। Deal।

রায়সাহেব যে ঘরে থাকেন তার পাশের মস্ত ঘরটি পছন্দ হল ওদের। বাথরুমে দুটি ভাগ আছে। একটিতে শাওয়ার কেবিন অন্যটিতে বাথটাব।

ওঁদের ঘরে স্যুটকেস দুটো নকুল নিয়ে এল আমি বললাম, আমি এবার যাই। কাকার কাছে গিয়ে সব রিপোর্ট করতে হবে।

রাতে আসবেন না?

দরকার আছে?

কালকের এবং তারপরের সব প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে না?

কালকে যদি কোডারমা যাই সুব্রতদার কাছে?

কালকেই যাবেন? বরং হাজারিবাগ শহরটা ঘরে দেখুন। সীমারিয়াতেও যেতে পারেন। পাহাড়ের উপরে একটা বনবিভাগের বাংলো আছে। তাতে লাঞ্চ খেতে পারেন। কানহারীর উপরের বাংলোটাও দেখে আসতে পারেন। আজ থাক। আস সেরেস্তার কাজকর্ম একটু গুছিয়ে নিই। অ্যাডজোর্নমেন্ট পিটিশন-টিটিশন করতে হবে অনেক।

না যদি আসতে পারেন তাহলে ফোন করবেন। ও। আপনার ফোন নম্বরটা দিয়ে যান।

এরা সবাই জানে। নকুলকে বললেই ফোন লাগিয়ে দেবে।

ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক উ ভেরি মাচ। থ্যাঙ্ক উ। ওরা দুজনেই বলল।

নীচে নেমে, বসবার ঘরে আমি ওদের প্রত্যেককে ডাকলাম। নকুল, নিজামুদ্দিন, বনমালী ও শত্রুঘ্ন।

ওরা বলল, আপনার কোনও চিন্তা নেই উকিলবাবু। এঁদের কোনও অযত্ন হবে না।

চিন্তা আমার সে জন্যে নয়।

তবে?

চিন্তা এ জন্যে যে মেমসাহেবদের একজনের নাম মলি আর অন্যজনের নাম শেলি। তোমাদের কুকুরদের নামেই নাম। ওঁরা যদি জানতে পারেন তাহলে তুলকালাম কাণ্ড হবে। রাগ করে চলেই হয়তো যাবেন।

নিজামুদ্দিন মাথার ফেজ খুলে মাথা চুলকে বলল, ইয়ে তো বহতই খতরনাক চিজ নিকলা। অভি ক্যা কিয়া যায়?

শত্রুঘ্ন বলল, কন করিবু? সে মানে কুকুরগুলা তো নাম ধরিকি না ডাকিলে শুনিবু না। বড্ড ভারী বিপদ হেল্বা।

নকুল বলল, এ কী গেরো হল বলুন তো দাদাবাবু। লোকনাথ বাবাকে ডাকতে হবে প্রাণপণে নইলে এ থেকে উদ্ধারের আর পথ নেই।

আমি বললাম, ওদের নাম ধরে না ডাকলে কী হবে? দশদিন?

কী হবে!

নকুল বলল, হারামজাদা দুটো। নাম ধরে না ডাকলে তারা শোনেই না।

এক কাজ করো। ওদের এ-কদিন নীচের একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দাও। ভাল করে খেতে টেতে দাও।

ওদের এক্সারসাইজ? বড়সাহেব জানলে চাকরি খেয়ে নেবেন। নকুল বলল।

তোমাদের চাকরি এমনিও যাবে ওমনিও যাবে। যা বলছি তাই করো। এ ছাড়া এ বিপদের উদ্ধার নেই।

শত্রুঘ্ন বলল, হউ! আপুনি যা কহিচ্ছন্তি তাই করিবাক্ হেব্ব, আউ কন? মোর মাথ্বা তো কাম্ব করুচি নাই আর।

নিজামুদ্দিন বলল, ঠিকই বোলা আপনে। ইয়ে ছোড় কর করনা কেয়া হ্যায় ঔর। বড়ি মুসিব্বতমে গির গয়া। ম্যায় খানা পাকাউঙ্গা না ইসব সামহালেগা। বড়ি মুসিব্বত।

ওদের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা বলে যখন আমি বেরিয়ে আসছি, সামসেরকে বলেছি আমাকে বাড়ি নামিয়ে এখানে ফিরে আসতে, তখন গাড়ি পোর্টিকো থেকে বেরোতেই দোতলা থেকে মলি চেঁচিয়ে উঠল, সে কি! আপনি তো কখনই চলে গেলেন। যাননি এখনও?

না, আপনাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই ওদের বোঝাচ্ছিলাম আর কি। চা কি গাঠিয়ে দেব উপরে?

তা দিতে পারেন। শেলি কফি খায়। আর গাড়ি কি আপনি নিয়ে যাচ্ছেন?

না, না, আমার বাড়িতে পৌঁছেই পাঠিয়ে দেব। গাড়ি রাতেও এখানে থাকবে। ড্রাইভার এখানেও খেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকবে।

থ্যাঙ্ক য়ু। বাই।

সামসের গাড়ি এগোল। বনমালি গেট খুলে দিল।

ভাবছিলাম, বেশ মেয়েদুটি। আর সুব্রত সামন্তর সঙ্গে আলাপ করে গেলে একবার, মিনুদির একটা হেস্তনেস্ত হবে। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। সেটা এগজিকিউট করতে পারলে মিনুদির সঙ্গে সুব্রতবাবুর বিয়ে ঠেকায় কে? একটা কাজের মতো কাজ হবে সেটা। মিনুদির জন্যে মনটা সবসময়েই ভারাক্রান্ত থাকে। কারোকে কোনও অনুযোগ করে না। নিজের সব দুঃখ নিজেই হজম করে একা ঘরে বসে।

সবই ভাল। কিন্তু মলি আর শেলি। দুটোই মেয়ে কুকুর। কুকুরের এমন অদ্ভুত নাম হয় কখনও শুনিনি।

আসলে মলি আর শেলি হাজারিবাগে আজ পদার্পণ করার আগে অ্যাংলসেশিয়ান

দুটোর নাম নিয়ে কখনও মাথাও ঘামাইনি। সত্যি কথা বলতে কী কুকুর কুকুরই, আমাকে দেখলে লেজ নাড়ে, ঝাঁপাঝাপি করে, কখনও পকেট থেকে বিস্কিট বের করে দিই—পেছনের দুপায়ে ভর করে আমার দু উরুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কোমরের নীচে এবং বুকেও চাটাচাটি করে। অনেকে বলেন, কুকুরেরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে বেশি পছন্দ করে। জানি না, সত্যি কী না। কিন্তু মলি আর শেলি। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে তারা যে ঠিক কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে তা ভেবেই আমার রাতের ঘুম চলে গেল।

বাড়ি ফিরে কাকাকে একটা রিপোর্ট দিলাম, যতখানি ডিটেইলে সম্ভব। মলি আর শেলি কুকুরের নাম শুনে কাকারও মামলার নথি দেখা মাথায় উঠল। উকিলের ব্রেইন বলে কথা। বললেন, এখুনি রায়সাহেবকে একটা অ্যাডভান্স ইন্টিমেশন দিয়ে রাখি, নইলে পরে ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে ভেঙে পড়বে। তাছাড়া কুকুরদের নাম তো আমি বা তুই রাখিনি। যাঁর কুকুর তিনিই রেখেছেন। আমাদের কি দায়িত্ব?

বললাম, তাই করো।

কাকা মক্কেলদের বললেন, আজ আপলোগ সব আইয়ে। বহুত বড়া ইক পার্সোনাল প্রবলেম মে হামলোগোঁনে ফাঁসা হুয়া হ্যায়। কাল আইয়ে।

কাকা ফোনটার সামনে বসে রাঁচিতে রায়সাহবেকে এস টি ডি করলেন। ডায়াল করেই বললেন, দুসস। রুট বিজি হ্যায়।

তারপর বললেন, তুই পাশের ঘরের প্যারালাল লাইন থেকে চেষ্টা কর। আমি একটু ব্রিফটা পড়ে নিই। একটা মার্ডার কেসের শুনানি আছে কাল। তুই তো আবার এ-কদিন থাকবি না। লাইনটা পেলে, মানে, রিং করলে আমাকে বলবি।

চারবারের মাথায় আমি লাইন পেয়ে গেলাম। বাজতেই চেঁচিয়ে বললাম, বাজছে কাকা।

ঠিক আছে।

ওপাশ থেকে রায়সাহেবের বাড়ির অপরাটের লাইন ওঠাল।

নমস্তেজি। রায়সাহেবকা কোঠি।

নমস্তে মিশিরজি।

কাকা বললেন।

ম্যায় হাজারিবাগসে সামন্তবাবু বোল রহ্যা হুঁ।

আরে নমস্তে নমস্তে সাব। সাব তক দ্যাঁ? নেহি কামতাপ্রসাদজি কো?

কামতাপ্রসাদজি: রায়সাহেবের পি এ।

কাকা বললেন, কামতাপ্রসাদজি কো দিজিয়ে।

হাঁ জি বোলিয়ে সামন্ত সাব। বহুত রোজ বাদ আপকি আওয়াজ মিলা। বোলিয়ে, আপকি লায়েক কোই লেওয়া?

জি হাঁ। বড়া সাব কি মুড আভি ক্যায়সি হ্যায় উওতো পহিলে বাতাইয়ে।

খ্যায়ের মুডতো আচ্ছা হি হ্যায়। বহুতই বড় এক মামলাকি রায় আজ নিকলি। চিফ জাস্টিস কি জাজমেন্ট। রামগড়া কি রাজা কি বহুতই পুরানা মামলা, কলিয়ারি কি লিজ লেকর। সমঝেনাজি, কলিয়ারি কব ন্যাশানালইজ হো চুকা ঔর রায় নিকলি আজ। মগর মোটা কম্পেনসেশান মিলেগি ক্লায়েন্টকো। মুড আচ্ছা হি হ্যায়। লাইন দুঁ ক্যা?

দিজিয়ে মেহেরবানি করকে।

ইয়েস। রায়সাহেবের একটু ভারী আর ভেজা গলা শোনা গেল। চুরুট খান রায়সাহেব।

বললেন, বলো ধীরু। তোমার সব খবর ভাল তো? গাদুর শালীর মেয়ে আর তার বন্ধু পৌঁছেছে গিয়ে? ওদের বললুম রাঁচিতে আয় এখান থেকে গাড়ি দিয়ে পাঠাই, তা না তারা জেদ ধরল .....। তা রথীন স্টেশনে গেসল তো?

হ্যাঁ স্যার। স্টেশনে গেছিল, ওঁদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলও, ওঁদের সেটল করিয়ে এই তো এল।

বাঃ বাঃ। বেশ তা ওঁদের ওঁদের করছ কেন? ওরা তো ছেলেমানুষ হে।

তারপর বললেন, যাই বল, ভারি ভাল তোমার ভাইপোটি। নামধারী সেদিন বলছিল। জগমোহনজির বেঞ্চে একটা মামলার সওয়াল করতে শুনেছিল নাকি নামধারী। খুবই প্রশংসা করলে।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম।

তা তো হল স্যার কিন্তু রন্টুরই একটা প্রবলেম নিয়ে আপনাকে ফোন করছি।

কার? রন্টুর? তার আবার কী প্রবলেম?

স্যার, আপনার কুকুর দুটো, মানে অ্যালসেশিয়ানের নাম তো মলি আর শেলি?

হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ কুকুরের কথা?

স্যার। গাদুবাবুর শালীর মেয়ে আর তার বন্ধুও নামও যে মলি আর শেলি।

হো-হোয়াট? বলছ কী তুমি? আরে তাই তো! ওদের ভাল নাম তো বেশি ব্যবহার করি না, আমার মনে থাকা উচিত ছিল। আগে বলে দিলে ব্যাপারটা....

ঠিকই বলছি স্যার। আজকের মতো কুকুরদের একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে খাবার ও জল দিয়ে। কিন্তু আপনার লোকেরা বলছে ওদের এক্সারসাইজ না করালে আপনি রেগে যাবেন। অথচ ওদের বের করলে ওদের নাম ধরে ডাকতেই হবে নইলে ওরা নাকি কথা শোনে না। এদিকে গাদুবাবুর শালীর মেয়ে ও তার বন্ধু যদি শোনে তবে কী হবে স্যার?

এর জন্যে দায়ী স্কাউন্ড্রেলটা।

কে স্যার?

ঘো—ঘো—ঘোতন।

সে কে স্যার?

সে আছে এক হতচ্ছাড়া। ফোর টোয়েন্টি। পাপি দুটোকে যখন আমার অনেক টাকা ধসিয়ে কিনে আনে তখনই আমি বলেছিলুম যে আমার খুশিমতো নাম দিয়ে দেব। তা নয়, সে বললে ওই নামেই ট্রেইন করেছে ডগ-ডিলার এখন নতুন নামে ট্রেনিং দিতে হলে কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে। আমি বলেছিলাম, প্যাঁদানি দিলে মানুষেও বাবার নাম ভুলে যায় আর এরা তো কুকুরেরই বাচ্চা।

সব তো বুঝলাম স্যার, এখন কী করা যায়?

হুঁ। তা শোন ধীরু, তোমার ভাইপো রন্টু যা করেছে ঠিকই করেছে। ওই ব্যবস্থাই চলুক। আমার লোকেদের বলে দেবে যে মেয়েরা যখন বাইরে যাবে তখন কুকুরদের এক্সারসাইজ দেবে। আবার ওরা ফেরার আগেই ঘরে পুরে দেবে। ব্যাপারটাকে না ঘাঁটানোই ভাল, বুয়েচ। যদি ফাঁস হয়ে যায় তবে রন্টুকে বলবে স্ট্রেইট আমাকে ফোন করতে।

তার আগে আপনিই এখন একবার ফোন করে ওদের সঙ্গে কথা বললে ওরা খুশি হবে।

কথা তো বলতুমই, বেশি রাতে বলতুম, ওদের খাওয়া-দাওয়া কেমন হল তা জানতে। তবে কুকুরের কথাটা আগ বাড়িয়ে বলতে চাই না। ওদের খামোখা না ঘাঁটানোই ভাল।

তারপর বললেন, তুমি তো জানো, আমার ভাই নিঃসন্তান। আজ থেকে নয়, সেই ওদের ছেলেবেলা থেকেই যত আবদার, বকা-ঝকা সব আমারই ওপর। পড়াশুনোতেই ভাল দুজনে। ওদের বাবা-মায়েরাও আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না। একটু খেয়াল রেখো তো। ভাল পাত্র যদি থাকে। দুজনেই বিদেশ যাওয়ার চক্কর করছে। কী বা হল দেশের অবস্থা। তা, দেশে যদি কোনও ভবিষ্যৎ না থেকে থাকে তো যারা মেধাবী তারা এ পোড়া দেশে থাকতে যাবেই বা কেন? তারা আবার তাদের মা-বাবা বা আমার পয়সা নেবে না। বৃত্তির টাকাতে যাবে। এই জেনারেশনের এই স্পিরিটটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আমাদের সময়ে শ্বশুরের টাকাতে ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারি বা অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে যেতে কোনও ছেলের লজ্জা করত না আর এরা এখন শ্বশুর তো দূরস্থান নিজেদের মা-বাবার কাছ থেকেও কোনও সাহায্য নেয় না। এদের সেল্ফ রেস্পেক্টকে আমি অ্যাডমায়ার করি।

নিশ্চয়ই! তা তো অ্যাডমায়ার করারই মতো।

তারপর বললেন, করবেন কি ফোনটা?

আমি প্যারালাল লাইনে কথোপকথন শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, মানুষে বড় হলে, বিশেষ করে কৃতী মানুষ বড় হলে, বড় বেশি কথা বলেন।

হ্যাঁ। ইয়েস। প্রবলেম যখন একটা হয়েছে তখন এখুনি করছি। কিন্তু আমি ওদের নামে কুকুর পুষতে যাব কোন্ দুঃখে? ওরা তো আমার প্রিয়জন। ওদের ছোট করে আমার কী লাভ?

সেটা ঠিক। কিন্তু ভয়টা তো সেখানেই। স্যার। আমার ভাইপো রন্টুই তো আপনার বাড়ির সব দেখাশোনা করে কিনা। ওরা মানে কন্যারা ভাবতেই পারে যে রন্টুই ....।

ননসেন্স। রন্টু কি ওদের নাম আগে জানত? না ও ওই বিচ দুটোর নাম সে রেখেছে? ওর ওপরে রাগ করতে যাবে কেন ওরা? অনেক মানুষ অবশ্য যাদের ওপরে রাগ তাদের নামে কুকুর পোষে। আমি জানি। কংগ্রেসের জিতেন মিত্তির কলকাতাতে দুটো ল্যাব্রাডর পুষেছে সি পি এম-এর দুই মস্ত লিডারের নামে। ও হয়তো জানে না, ওর নামেও সি পি এম-এর লিডারেরা কুকুরের নাম রেখেছেন হয়তো। এই সব চাইল্ডিশ ব্যাপার-স্যাপার। কোনও ম্যাচিওর্ড মানুষ এসব করেন না।

তাহলে আমি ছাড়লাম স্যার।

হ্যাঁ ধীরু। তুমি ছেড়ে দাও আর তোমার ভাইপো রন্টু, কী যেন ভাল নাম? হাঁ রথীন, তাকে আমার ধন্যবাদ জানিও। ইটস ভেরি নাইস অফ হিম টু হ্যাভ টেকেন গুড কেয়ার অফ মাই বুড়ি অ্যান্ড খুকু। গুডনাইট।

তারপর বললেন, তবে একটা কথা। আমার এখন হুইস্কি খাওয়ার সময়। তুমি তো জানো যে হুইস্কি খেতে খেতে পরের দিনের মামলার ব্রিফগুলো দেখি। ফোনটা আমি এখুনি নাও করতে পারি। তবে করব। ডোন্ট ওয়ারি।

আবার বললেন, গুডনাইট।

মিনুদির ঘরের পর্দা টানা ছিল। ঘরের কোণে একটা তানপুরা দাঁড় করানো থাকে। খোলাই আছে দেখছি কদিন হল। ওয়াড় পরানো থাকে। ঘরে গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলে বাগান থেকে অনেক সময়ে তানপুরার তারে বসলে ঝংকৃত হয়ে ওঠে তানপুরা। দারুণ লাগে আমার। অন্য কোণে একটা ছোট অর্গান। কী ভাল যে গান গায় মিনুদি অথচ ইদানীং একেবারেই গায় না। স্কুলে যায়, বাড়ি আসে। নিজের শিক্ষকতার কিছু বই পড়ে, নইলে অন্যসময়ে সাহিত্য। মিনুদি একজন আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকের খুব ভক্ত। তাঁর যে কোনও লেখা যেখানেই বেরোক না কেন সেটা তার পড়া চাইই। আমি তা নিয়ে ঠাট্টা করাতে একদিন বলেছিল ওঁর লেখা রবীন্দ্রনাথের লেখার পরই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

সে কি? কেন? এত নামী নামী প্রাইজের পাহাড়ে ন্যুব্জ লেখক থাকতে।

ওঁর লেখা পড়লে রুচি সুন্দর হয়, মন প্রসন্ন হয়, উনি নিছক গল্প লেখার জন্যেই

গল্প লেখেন না, পাতা ভরাবার জন্যেও নয়, ওর গল্পে নানা বিষয়ের উপস্থাপনা থাকে। উনি একেবারেই অন্যরকম। তুই বুঝবি না রন্টু। সাহিত্য তো তুই পড়িস না।

মিনুদি এক সময়ে খুব ভাল গান গাইত। কলকাতাতে যখন ছিল তখন ওর গানের অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রনাথের নানা নৃত্যনাট্য বহুবার দেখতে গেছি। রবীন্দ্রনাথ ওর ভগবান। এই সময়ে মিনুদি একজন অন্যরকম, আসাধারণ মেয়ে।

পর্দার ওপার থেকে বললাম, আসব?

আয়। তুই আবার কবে থেকে পারমিশন নিয়ে ঘরে ঢুকছিস?

না, মেয়েদের ঘরে ঢোকার সময়ে জিগগেস করে ঢুকতে হয়। আমি চামেলির ঘরে ঢোকার সময়েও, মানে ও বড় হয়ে যাবার পরে, জিগগেস করে ঢুকি। মায়ের শিক্ষা।

জেঠিমার শিক্ষা খুব ভাল। তাই তোরা দুজনেই ভাল হয়েছিস। শুধু মেয়েদের কেন? ছেলেদের ঘরে ঢোকার আগেও জিগগেস করে ঢোকাটাই ভদ্রতা। এবার বল, হঠাৎ কী মনে করে? তোর সেরেস্তা নেই আজ?

না। স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টে আছি। কাকার সিনিয়র রাঁচির রায়সাহেবের ভাইয়ের শালীর মেয়ে আর তার বান্ধবী এসেছে হাজারিবাগে বেড়াতে। আমার এখন সেরেস্তা থেকে ছুটি—তাদের দেখ-ভাল করার দায়িত্বে আছি। উফ কী ঝামেলা না, কী বলব।

মিনুদি হেসে বলল, সে তো খুব মধুর ঝামেলা।

তাই ভাবছ! যা দুখানা স্যাম্পেল। বড়লোকের স্পয়েল মেয়ে সব।

ওটা ওদের বহিরঙ্গ রূপ।

কী করে জানলে? তুমি ওদের চেনো?

চেনবার দরকার নেই। সব মেয়েরাই কিছু কিছু ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে একইরকম—বাইরের রূপেই যা তফাত। তোদের চোখে হয়তো এমন মনে হয়।

তা তারা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ওরা যেসব জায়গাতে বেড়াতে যাবে তোমাকে নিয়ে যেতে চায়। তোমার স্কুল থেকে কদিন ছুটি নিতে হবে। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার দায়িত্বটা সহজে পালিত হয়। কাল থেকে লং উইকএন্ড। শনি, রবি ও সোম তো ছুটিই পড়েছে। তার সঙ্গে তিনটে দিন নিয়ে নাও।

আমার দরকার নেই বাবার সিনিয়রের নাতনিদের সঙ্গ দেবার। তাছাড়া তুই তো জানিস আমি যার তার সঙ্গে মিশতে পারি না।

ওরা যা তা নয়। হলে, সুব্রতদাকে চিনত না।

কোন সুব্রতদা?

আহা আমি এবং তুমিও যেন আড়াই হাজার সুব্রত সামন্তকে চিনি।

ওরা চেনে তো আমার কী?

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন। তুমিই তো বলো। 'হঠাৎ কোথা হইতে কী হইয়া যাইবে' কে বলিতে পারে? আমি ছোটকাকার আলমারি থেকে চুরি করে দস্যুমোহন পড়েছি। তুমি তো সিরিয়াস সাহিত্যের ছাত্রী। তুমি তো আর এসব পড়োনি।

ইতিমধ্যে কাজের মেয়ে মণিকা, সে মুখ্যত মিনুদির দেখাশোনা করে, এসে বলল, দিদি তোমার ফোন।

কে?

বললেন, আমি চিনব না।

এ আবার কী ঢঙ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, কোডারমার ফোন নয়তো? সেই সুন্দর গলার ভদ্রলোকের?

বেশি ফাজিল হয়েছিস, না?

তাহলে বল, আমি কি বলব ওদের? কাল আমরা ব্রেকফাস্টের পর বেরোব। তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

পালা তো। আমাকে বিরক্ত করিস না।

আমি চলে যেতে যেতে শুনলাম মিনুদি ফোনে খুব উচ্ছল হয়ে কথা বলছে। সে কীরে! হ্যাঁ রন্টু বলছিল বটে রায়সাহেবের নাতনিদের কথা কিন্তু আমি কী করে জানব যে, তোরা! বল বল, কেমন আছিস? কতদিন পরে গলা শুনলাম। গান-টান করছিস?

কী? ইয়ার্কি হচ্ছে।

তারপর বলল, কাল? কোন্ দিকে যাবি? কখন?

—না, রন্টু বলেছে। কিন্তু ও বাঁদরের কথা আমি সিরিয়াসলি নিইনি।

তারপর বলল; ফিরবি কখন? ঠিক নেই? সে কী রে?

না। জলে পড়িনি। এতদিন পরে তোদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভাল লাগবে কিন্তু তোরা আমাদের বাড়িতে কবে আসবি?

কী? আমাদের বাড়িতেই আছিস? রন্টু দেখাশোনা করলেই যদি 'The Retreat' আমাদের হত তাহলে কথা ছিল কী? ও বাড়িতে একটি বড় খোলা বসবার জায়গা আছে দেখেছিস? পেছন দিকে। সেদিকে স্টেজ করে পেছনের লনকে অডিটোরিয়াম করে ওখানে একবার বসন্তোৎসব করেছিলাম। তোরা তো বসন্তেই এলি—করলে হয় একটা। কী বলিস?

না, না, দেখার বা শোনার লোক এখানে অনেকই আছে। বোঝার লোকও আছে। মানে বোদ্ধা। হাজারিবাগে কম শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালি নেই কিন্তু এরকম অনুষ্ঠান দেখা বা শোনার সুযোগের অভাবে ধীরে ধীরে সকলেরই যোগসূত্র নষ্ট

হয়ে যাচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে। তোরা লাগিয়ে দে একটা। খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড হবে। এখানে অনেক ব্রাহ্মও আছেন। ব্রাহ্ম সমাজ কম্পাউন্ড বলে একটি মহল্লাও আছে।

অ্যাঁ? তা তোরা বললে গাইব।

হ্যাঁ। কাল কথা হবে।

কে?

তারপরই গলা নামিয়ে বলল, সুব্রত?

তারপরে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল না, আমি খোঁজ জানি না। তবে রন্টু হয়তো জানে। তাকে জিগগেস করিস। তোরা জানলি কী করে যে তিনি এ দিকেই থাকেন?

—কে? রন্টু বলেছে। ও। তবে তাকেই জিগগেস করিস।

—তিনি গাইবেন কি না তা আমি কী করে বলব।

—কী? শ্যামা? উনি বজ্রসেন আর আমি শ্যামা? সে কবে করেছিলাম। বিনা রিহার্সালে কি অত তাড়াতাড়ি এসব হয়? ওসব পাগলামি ছাড়। দেখা হবে, কথা হবে....। তোরা কিছু কর বরং। সোলো ও ডুয়েট গা না।

—অ্যাঁ? পথে? গাড়িতে? ঠিক আছে। গান টান হবে।

—কটাতে তুলবি বলছিস?

—সাতটাতে।

—সে কি? বললি ব্রেকফাস্টের পরে।

—ওখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করব? রন্টু কটাতে পৌঁছবে? সাড়ে সাতটা? তা সে পৌঁছক গিয়ে সে তো তোদের লোকাল গার্জেন। আমি আমাদের গাড়িতে পৌঁছে যাব চান করে আটটার মধ্যে। ঠিক আছে?

—সত্যি! হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। ভাবতেই পারছি না।

মিনুদি বলল।

ফোন সেরে ঘর থেকে বেরোতেই আমি গেয়ে উঠলাম, "মনোবীনে শিখি নেত্য করে।"

মিনুদিকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল, অমন মুডে বহুদিন দেখিনি।

মিনুদি আমার গান শুনে বলল, প্লিজ রন্টু, তুই আমার সামনে আর যাই করিস গানটা গাস না। আমাদের ক্লাসে একটি ছেলে ছিল, তাকে বিলাওল রাগের একটা ঠাট গাইতে বলেছিলেন গুরুজি। সে গাইলে বলেছিলেন, বাবা, দেখো, গত রাতে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গান শুনতে গেছিলাম। তিনি সাতটি পর্দাই বেসুরে গেয়ে শোনালেন। তোমাকে দেখে বড় বিস্ময় লাগছে আমার। উনি সারাজীবন সাধনা করে যা আয়ত্ত করেছেন তুমি তাই কত কম সময়ে তা আয়ত্ত করেছ। তোমার

জবাব নেই।

তারপরই ছেলেটি, নাম ভুলে গেছি, গান ছেড়ে দিল। তোর গলাতে একটা পর্দাও সুরে লাগে না। দয়া করে আমার সামনে তুই কখনও গান গাস না।

আমি বললাম মনে আনন্দ হলে কী করা যাবে? যার গলায় সুর নেই সে কি আনন্দ প্রকাশ করবে না?

বলেই, আবার ধরে দিলাম গান। "মনোবীনে শিখি নেত্য করে।"

বললাম, গরিবের কথা আর কে শোনে।

তারপরই গলা নামিয়ে বললাম, সুব্রত সামন্তর নামটা কেমন ম্যাজিকের মতো কাজ করল তোমার উপরে তাই দেখলাম।

সত্যি! মলি আর শেলি। কত অঘটনই যে সংসারে ঘটে।

বলেই বললাম, তুমি আরেকটা অঘটনের কথাও শুনে রাখো। ব্যাপারটা এখনও এক্সপোজড হয়নি।

কী?

রায়সাহেবের বাড়িতে জোড়া অ্যালসেশিয়ান আছে। জানো কি তুমি?

না, পেয়ার?

পেয়ার হলে দুঃখ কি ছিল? তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যেত। সে দুটোই বিচ।

তাতে তোর ল্যাঠা কি?

আমার ল্যাঠা মানে? লাঠালাঠি হবে কাল-পরশুর মধ্যে।

কী বলছিস খুলে বল।

কুকুরী দুটোর নাম মলি আর শেলি।

এ-এ-এ মাঃ-আ-আ।

মিনুদি এমন করে সামান্য হেসে, সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে এ—মাঃ শব্দ দুটো উচ্চারণ করল যে একমাত্র মেয়েরাই অমন করে উচ্চারণ করতে পারে।

তারপর বলল, এখন কী হবে?

ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে। যা টেনশনে আছি না, কী বলব!

নাম তো আর তুই রাখিসনি।

তা তো রাখিনি। সে কথা রায়সাহেবও তাদের ফোন করে বলবেন কিন্তু ভাল বাংলাতে যাকে অন্তর্বর্তী বলে, সেই সময়ে যে তুলকালাম কাণ্ডটি হবে তা সামাল দেবে কে?

সেটা অবশ্য ঠিক।

আমি মলি শেলির ডিনার খাওয়ার তদারকি করব বলেছিলাম। ওরা সে-প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেছিল যেদিন থেকে আমাদের সঙ্গেই ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, আফটার নুন টি এবং ডিনার খাবেন সেদিন থেকেই তদারকি করতে দেব। তার আগে নয়।

তাছাড়া, আমরা শিশু তো নই যে আমাদের বিব বেঁধে দিতে হবে, চামচ করে বেবি ফুড গিলিয়ে দিতে হবে। তবে বলে দিচ্ছি, আপনার কাকা এবং আমাদের বড় দাদু যখন আপনাকে চেম্বার থেকে ছুটি করিয়ে আমাদের দেখ-ভাল করার দায়িত্বই দিয়েছেন আগামীকাল থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় আপনি রিপোর্ট করবেন এবং রাত দশটাতে ছুটি। এ বাড়িতে দশটি বেডরুম। আপনার চান, বিশ্রাম কোনও কিছুরই অসুবিধে হবে না। যদি সাজতে-গুজতে চান তাহলে সঙ্গে চেঞ্জও নিয়ে আসবেন। পাউডার, ইউডিকোলোন, পারফ্যুম।

আমি বললাম, সামসেরকে কী বলব? কাল আপনারা এসি গাড়িতেই যাবেন? না জিপে?

কোডারমা যাব তো কাল। কোন্ গাড়ি সুবিধা হবে? জায়গাটা জঙ্গুলে কি?

কোডারমা থেকে তো এলেনই। না, জঙ্গলে নয়। পথের পাশে জঙ্গল পড়ে একটু। পথ পাকা। এবং ভাল। ওটাই তো গয়ার পথ। আগে বলত গয়া রোড। আমার মনে হয়, একটা কারই নেওয়া ভাল।

মিনুদিকে যদি রাজি করাতে পারি এবং সুব্রতদাও যদি আসেন তাহলে তো আপনাকে ও সামসেরকে নিয়ে ছজন হব আমরা। কারে তো আঁটবই না।

শেলি বলল।

ঠিক বলেছিস।

মলি বলল।

তাহলে একটা টয়োটা কালিস অথবা টাটা সুমো নিয়ে আসতে বলব? মাহিন্দ্রর বোলেরো বলতে পারি তবে বোলেরোতে সাতজনের জায়গা হবে না।

হ্যাঁ। কিন্তু এসি থাকবে তো?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। থাকবে। আমি এখুনি ফোন করে দিচ্ছি মগনলালকে। মগনলাল-এর না থাকলে সে অন্য কারো গাড়ি ঠিক করে দেবে—উকিল সাহেবের অর্ডার—গাড়ির বিজনেস—পুলিশ কেস ও অন্য নানা কেস তো ওদের লেগেই থাকে। আমার কথা বেদবাক্য।

বারান্দাতে বেরিয়ে বললাম, আপনাদের বড় দাদু কি ফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ। কাল রাতে। খোঁজখবর নিলেন। আপনি কেমন দেখাশোনা করছেন আমাদের তার খোঁজও নিলেন এবং সারপ্রাইজিংলি আপনার খুব প্রশংসাও করলেন।

স্ট্রেঞ্জ। তা আপনারা একটুও চুকলি করলেন না আমার নামে?

করব ভেবেছিলাম। কিন্তু তাড়াতাড়িতে মনে ছিল না। আজ করব।

কিন্তু উনি আমার কর্তব্য সম্বন্ধেই জিগ্যেস করলেন, আর কিছুই বললেন না?

আর কী বলবেন?

না, মানে যদি কিছু বলে থাকেন, তাই জিগগেস করছি আর কি?

না। আর কিছুই বললেন না। শেলি বলল।

কিছু কি বলার ছিল?

মলি বলল।

কী মুশকিল। দাদু-নাতনির মধ্যে কথা। আর কিছু বলার ছিল কি না তা আমি জানব কী করে।

আপনার কথাবার্তা বড় হেঁয়ালি হেঁয়ালি। এই জানতে চাইছেন আর কিছু বললেন কি না দাদু আবার এই বলছেন দাদু-নাতনির কনভার্সেশন। ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড।

আবার গুডনাইট বলে আমি চলে এসেছিলাম। ওরা যে মিনুদিকে অত তাড়াতাড়ি ফোন করবে বুঝতে পারিনি। তার মানে মিনুদির সঙ্গে বেশ ভালই হৃদ্যতা ছিল। বাঁচা গেল। আমার টেনশন অনেকটা কাটল।

রাতে টেনশনে ভাল ঘুম হল না। দুই কন্যাকে নিয়ে সারাদিন গাড়িতে ঘোরা, যদিও মিনুদি সঙ্গে থাকবে। নানা পিটপিটানি এদের। পথের জল খেলে কলেরা হবে, ধাবার চৌপায়াতে বসলে ভিডি হবে, ধাবার থালাতে রুটি তড়কা খেলে এইডস হবে যত উদ্ভট উদ্ভট ধারণা। কয়েক বোতল মিনারল ওয়াটার, কিছু ফল, নিজামুদ্দিনকে বলে ফ্লাস্কে কফি এবং মাঠা এই সব সকালে গিয়ে অর্গানাইজ করতে হবে।

সকাল হতেই সাত তাড়াতাড়ি উঠে এক কাপ চা খেয়ে জামাকাপড় পরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক সাড়ে সাতটায় পৌঁছলাম। শুনলাম, মেমসাহেবরা পেছনের জগিং ট্র্যাকে জগিং করছেন। এখানে জিম নেই শুনে হতাশ হয়েছিলেন কাল। আমি সামনের বারান্দাতে চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি। প্রতিদিন আজকাল স্টেটসম্যান এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া এসেছে। মেমসাহেবদের অর্ডার। হেডলাইনে চোখ বোলাচ্ছি এমন সময়ে গেটের সামনে সকালের শান্তির দফারফা করে দিয়ে একটি হোঁৎকা মতো লোক মোটরসাইকেল স্টার্টে রেখে বললেন, কোই হ্যায়? এ মালি, গেটোয়া খোল।

ছোট মালি দৌড়ে যেতেই মোটরসাইকেল ভটভটিয়ে ভদ্রলোক একেবারে পোর্টিকোর মধ্যে চলে এসে মোটরসাইকেল পার্ক করিয়ে নামলেন। ইতিমধ্যে গেটে সামসেরকে দেখা গেল একটি ঘিয়ে রঙা টয়োটা কালিস নিয়ে উপস্থিত হতে। মালি আবার গেল দরজা খুলতে। এমন সময়ে আমার পেছনে দ্বৈতস্বরে শুনলাম, গুড মর্নিং।

ওঁরা জগিং সেরে বসার ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন।

বললাম, গুড মর্নিং। এই যে কাগজ। আমি কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় রিপোর্ট করেছি।

ওঁরা মোটরসাইকেল আরোহীর দিকে এক ঝলক চেয়ে আমার পাশেই চেয়ার টেনে বসলেন হাতে খবরের কাগজ নিয়ে।

ওই আগন্তুক একটু অভব্য টাইপের। মালিকে বললেন, নকুল কাঁহা? বোলাও। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন আপনাকে চিনলাম না তো।

মালি তাড়াতাড়ি বলল, ইনোনেই তো সামন্ত সাব। ওকিল সাব।

তখন উনি হেসে বললেন, আপনার নাম শুনছি বহুদিন। কিন্তু আমি এমন এমন সময়ে আসি যে আপনার সঙ্গে দেখাই হয় না।

আপনি?

আমি বললাম।

উনি বললেন, আমার নাম ঘোতন ঘোষ।

ঘোতন নামটি শুনেই আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। রায়সাহেব কি ওঁর কথাই বলেছিলেন কুকুরীদের ব্যাপারে।

প্রচণ্ড মোটা ঘোতনবাবু কথা বলার সময় হাঁপান। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, অনেক কষ্টে আজ দুমাস চেষ্টা করে একটা দারুণ পেডিগ্রিওয়ালা জোগাড় করেছি। আজই ব্রিডিং করাব।

ইতিমধ্যে নকুল এসে উপস্থিত হতেই তিনি বললেন, নকুল এখনই চলো আমার সঙ্গে। মলি আর শেলিকে নিয়ে। সায়গল সাহেবের বাড়ি কাছেই। আজহি উন দোনোকি ফকিং হোগা।

এইটুকু শুনেই মলি আর শেলি কাগজ ফেলে দিয়ে বসবার ঘরে চলে গেল। এদিকে ঘোতনবাবু থামেন না। বললেন, ওরা যে হিট-এ এসেছে তা তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? অ্যাঁ। এদিকে আমি সাহেবের ঝাড় খাচ্ছি। চলো এক্ষুনি আমার সঙ্গে মলি শেলিকে নিয়ে। আমি আস্তে আস্তে চালিয়ে যাচ্ছি, ওই তো মোড়েই বাড়ি। চেনো না সাইগল সাহেবের বাংলো?

আমি বললাম, এখন ওরা একটু ব্যস্ত থাকবে। বাড়িতে রায়সাহেবের অতিথি এসেছেন। আপনি বরং নটা নাগাদ আরেকবার কষ্ট করে আসুন। আমি রায়সাহেবকে বলে দিচ্ছি যাতে উনি আপনার ওপর রাগ না করেন।

মুশকিল হল। আমার আরেকটা বিচ নিয়ে যেতে হবে ওঁর কাছে নটাতে। ঠিক আছে আজ তাহলে ক্যানসেল করে দিচ্ছি। নকুল তুমি মলি আর শেলিকে রেডি করে রাখবে কাল আটটার সময়ে।

আমি বললাম, কালও আটটাতে হবে না। নটা অবধি ওরা ব্যস্ত থাকবে। আপনি নটার সময়ে আসবেন।

বলছেন?

হ্যাঁ। তাই বলছি।

ঠিক আছে। দিনটাই নষ্ট হল আমার। বলে, উনি মোটরসাইকেল ভটভটিয়ে চলে গেলেন। উনি চলে যেতেই আমি বসার ঘরে গেলাম। দেখলাম দুজনের চোখ-মুখ লাল।

বললাম, চা দিতে বলি?

না। থ্যাঙ্ক উ। আমাদের জন্যে আপনার কিছুই করতে হবে না।

বললাম, দয়া করে আমার উপর রাগ করবেন না। আপনারা বরং রায়সাহেবকে একটা ফোন করুন। দোষ তো ওঁরও নয়। দোষ সব এই হোঁৎকা ঘোতনবাবুর। বিচ দুটো যখন পাপি ছিল তখন ওই ঘোতনই তাদের সাপ্লাই করে। রায়সাহেব তখনই বলেছিলেন কী মানুষের মেয়ের মতো নাম, নাম বদলে দিচ্ছি আমি। তখন ওই ঘোতনই বলে যে, ওই নামে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ওদের এখন নাকি ট্রেনিং-এর নাম বদলালে অসুবিধে হবে।

মলি কেঁদে বললেন, হাউ ইনসাল্টিং। বড় দাদুকে ফোন করতে যাব কী করতে? দাদু কি আমাদের নাম জানতেন না?

দাদু তো আপনাদের বুড়ি আর খুকু বলে জানেন। অত বড় ব্যারিস্টার, মাথাতে কত ঝামেলা, ওঁর কি তখন মনে ছিল? আপনাদের কত ভালবাসেন উনি—উনি কি নাতনিদের ইনসাল্ট করার জন্যে ইচ্ছে করে অমন করতে পারেন?

শেলি বলল, আপনি জানলেন কী করে যে উনি আমাদের বুড়ি আর খুকু বলে ডাকেন?

জানতে হয়। আপনারাই তো বলেছিলেন। ইন ফ্যাক্ট এই ক্যালামিটি...

ক্যালামিটি?

ক্যালামিটি ছাড়া কি? তার চেয়েও স্ট্রং যদি কোনও টার্ম থাকে তবে আমি তাই ইউজ করতাম—একে প্রায় ন্যু ইয়র্কের টুইন টাওয়ারের ডিভাস্টেশনই বলা যেতে পারে। উনিও রাতে ঘুমোতে পারেননি—ব্যাপারটাকে কীভাবে এক্সপ্লেইন করবেন আপনাদের কাছে। আসলে আমি কাকাকে নিয়ে গতরাতেই ওঁকে ফোন করিয়েছিলাম—তা উনি বললেন, এখুনি নয়। ওরা হাঁউ-মাঁউ করবে। ঠিক আছে।

তারপর বললাম, আচ্ছা, আপনারা না ফোন করেন আমিই করছি, করে আপনাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছি।

নাম্বারটা আমার পকেট ডায়ারিতে ছিল। ০৬৫। রাঁচির এস টি ডি কোড ডায়াল করেই রায়সাহেবের নাম্বার ডায়াল করলাম।

মিশিরজি ধরতেই বললাম, ম্যায় হাজারিবাগসে রথীন সামন্ত বোল রহা হ্যায় জি। রায় সাহাবসে বাত করনা হ্যায়। বহুতই জরুরি।

মিশিরজি একটু দ্বিধা করে বললেন উনোনে তো চায়ে পি রহ্যা হ্যায়, জব বহুতই জরুরি হায় তব দেহি দেঁতে হ্যায় লাইন। লিজিয়ে। বাত কিজিয়ে।

ইয়েস।

রায়সাহেবের গম্ভীর গলা শোনা গেল। স্মোকারদের গলা সকালে আরও গম্ভীর শোনায়।

বললাম, স্যার আমি রন্টু বলছি, রথীন, সামন্তবাবুর ভাইপো।

ও গুড মর্নিং। বলো রথীন। এত সকালে? মলি শেলির বম্ব এক্সপ্লোড করেছে বুঝি?

হ্যাঁ স্যার।

বেচারা! আই ফিল সরি ফর উ। সব দোষই ওই হারামজাদা ঘোতনের।

আপনি ওঁদের সঙ্গে কথা বলুন স্যার। ওঁরা খবুই আপসেট।

হ্যাঁ হ্যাঁ দাও। আই মাস্ট ফেস দ্যা মিউজিক।

মলি টেলিফোনে ভেঙে পড়ে বলল, হাউ ক্যুড উ ডু ইট বড়দাদু?

তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি আর শেলি আজই চলে যাব এখান থেকে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। নকুল চা নিয়ে এসেছিল,

আমি এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে বেশি করে দুধ চিনি মিলিয়ে চুমুক দিলাম। এছাড়া এখন আমার করার আর কিই বা ছিল?

প্রায় মিনিট দশেক দাদু আর নাতনিদের কথা হওয়ার পরে—আমার ডাক পড়ল ফোনে।

আমি বললাম, বলুন স্যার?

স্যার স্যার বলবে না আমায়। বুড়ি আর খুকু বড় দাদু বলে তুমিও আমাকে বড় দাদুই বলবে। আই অ্যাম ভেরি সরি ফর দ্যা এমবারাসমেন্ট উ ফেসড মাই চাইল্ড। কোনওক্রমে ম্যানেজ করেছি। এর চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জাস্টিস মানচান্দানির কোর্টে মামলা জেতা অনেক সোজা ছিল। থ্যাঙ্ক উ ভেরি মাচ। এবার থেকে রাঁচি এলে তুমি আমার গেস্ট হয়ে আমার বাড়িতেই থাকবে। আমি চাটুজ্যেকে আজই বলে রাখব। প্লিজ ফিল ফ্রি টু স্টে হিয়ার অ্যাজ মাই গ্র্যান্ড চাইল্ড। গড ব্লেস উ।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ওঁদের দিকে তাকালাম।

বললাম, কত অদ্ভুত কাণ্ডই না ঘটে সংসারে। কাল রাতে আমার তো ঘুম হয়ইনি, আপনাদের বড় দাদুরও হয়নি। বেচারা।

বলেই বললাম, দুটি সুন্দর মুখে এবার কি একটু হাসি দেখতে পারি। বাইরে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। বাইরে চলুন। চান করে তৈরি হয়ে নিতে হবে তো? সামসের গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

মলি ও শেলি স্বাভাবিক হয়ে, জগিং স্যুটের হাতা দিয়ে চোখ মুছে বাইরে এল।

নকুলকে বললাম, নকুল মেমসাহেবদের চা বানিয়ে দাও। বিস্ক ফার্মের বিস্কিট এনেছ তো হরিরামের দোকান থেকে।

হ্যাঁ সাহাব।

শেলি বলল, আমাদের চা আমরা বানিয়ে নেব।

নকুলকে বললাম, তুমি যাও, নিজামুদ্দিনকে পাঠাও। ব্রেকফাস্ট-এর অর্ডার নিয়ে যাবে।

তারপর ওদের বললাম, মিনুদি কিন্তু এসে পড়বে আটটার মধ্যে।

শেলি বলল, জানি।

আমি বললাম, আপনাদের জন্যে আজ আপনাদের দাদুকে আমি ফোন করলাম একটা ফোন কিন্তু আপনাদের করতে হবে আমার জন্যে। আমার স্বার্থে।

এখনই?

না, না, এখনই নয়। সময় হলে বলব, হোয়েন দ্যা টাইম ইজ রাইপ।

ঠিক আছে।

কথা দিলেন তো?

মলিকে বললাম।

প্রমিস।

শেলি বলল, আপনি বড়দাদুকে কী জাদু করেছেন বলুন তো?

বললাম, আমার কেরামতি ওই বুড়ো মানুষদেরই জাদু করার, আপনাদের মতো তরুণীদের তো জাদু করেছে শাহরুখ খান।

ওরা হেসে বলল, মিথ্যে বলব না, করেছে।

যখন রাত আটটা নাগাদ আমরা সবাই হাজারিবাগে The Retreat-এ ফিরলাম তখনও মিনুদি আর মলি শেলির গল্প শেষ হয় না। এও ঠিক হয়েছে যে আগামী শনিবার The Retreat-এর লনে অডিটোরিয়াম আর সেই খোলা বসার ঘরে ওরা আয়াস করে বসন্তোৎসব করবে। কোডারমা থেকে সুব্রতদাও আসবে। এও ঠিক হয়েছে যে মিনুদি আর আমি বাড়ির পাট চুকিয়ে এসে বৃহস্পতিবার রাত থেকে The Retreat-এই থাকব। শনিবার দোল পূর্ণিমা। বিহারিদের হোলি অবশ্য রবিবারে। বুড়ো দাদুকেও আসতে বাধ্য করবে বলেছে মলি আর শেলি। তার চেয়েও বড় কথা আমারই মতো বেরসিক আমার কাকাকেও ওরা আসতে বাধ্য করবে বলেছে।

কে জানে। কাকাও হয়তো আমারই মতো। গানবাজনা আমি খুব ভালবাসি। যারা ভাল গান করেন আমি তাদের প্রেমে পড়ে যাই কিন্তু বিধাতা নিজের গলাতে সুর দেননি।

মলি আর শেলি অনেকটা রানি মুখার্জি আর কাজলের মতো দেখতে। শুনেছি ওঁরাও নাকি কাজিন। আমি আর কজন মেয়ে দেখেছি জীবনে। তাই উপমাতে দারিদ্র্য আমার। হাতের কাছে রানি মুখার্জি আর কাজল থাকাতেই বললাম। কিছুদিন আগে আমার বিহারি বন্ধু হর্ষদের সঙ্গে 'কভি খুশি কভি গম' নামের একটা হিন্দি ছবি দেখাতে এঁদের চেহারাটাই মনের মধ্যে ছিল।

মলি শেলিকে নামিয়ে দিয়ে টাটা গুডনাইট টাইট করে সামসের কালিস নিয়েই আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিল। ও The Retreat-এই থাকবে যে, কদিন মলি শেলিরা থাকে।

ফেরার সময়ে আমি মিনুদিকে বললাম, আমার যে কী ভাল লাগছে তোমাকে বোঝাতে পারব না।

মিনুদি গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, কারণটা সহজেই অনুমেয়।

বললাম, বিশ্বাস করো মিনুদি, ভাল লাগছে অন্য কোনও কারণে নয়, তোমাকে এত সুখী কোনওদিন দেখিনি। তুমি কত গান গাইলে ওদের সঙ্গে সারা পথই প্রায়। আর সুব্রতদার নাম শুনেছিলাম, কখনও আলাপ তো হয়নি। কী দারুণ মানুষ গো মিনুদি। আমি তো প্রেমে পড়ে গেছি। আর ওঁর বাবা? আ গ্রেট ম্যান।

চোখের সামনে মলি শেলি থাকতে পুরুষের প্রেমে কোন্ দুঃখ প্রেমে পড়তে যাবি।

ওরকম পুরুষের জন্যে Gay-ও হওয়া যায়।

ইস-স-স। ওই শব্দটা আমার সামনে উচ্চারণ করিস না। পৃথিবীতে অনেক কিছুই হচ্ছে এখন শুনি কিন্তু আমার গা গুলোয়। আমার সামনে বলিস না।

বললাম, বলো মিনুদি? তুমি খুব খুশি হওনি আজকে? সুখী?

মিথ্যা বলব না। হয়েছি। বহুদিন বাদে সুব্রতর সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু কিছু মানুষের কাছে সুখ বসন্তী ফুলের মতো আসে। অতি স্বল্পক্ষণের জন্যে। সেই ক্ষণিক সুখ কষ্টকেই বাড়িয়ে দিয়ে যায় শুধু।

তারপর বলল, কী করব বল? মা আমাকে অন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাবাকে দেখতে বলেছিলেন। কাজ-পাগলা মানুষ। আর বলেছিলেন, যে সুখ মা-বাবার সম্মতি আর আশীর্বাদের সঙ্গে না আসে, সে সুখ চিরস্থায়ী হয় না।

তুমি বড় সেকেলে আছ মিনুদি। চিরস্থায়ী শব্দটাই আজকাল বাতিল হয়ে গেছে। একটি বোতাম টিপলেই অ্যাটম বোমা বা একটি মিসাইল যখন পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে তখন সুখের আবার চিরস্থায়িত্ব কি?

তারপর বললাম, মিনুদি, তোমার আমি মস্ত অ্যাডমায়রার। আজ থেকে সুব্রতদারও হলাম। সামান্য কাঠবেড়ালিও তো সেতুবন্ধনে কাজে লেগেছিল। আজ থেকে এই আমার তপস্যা শুরু হল। কী করে তোমাদের মিলিয়ে দেওয়া যায়।

কাকাকে কী করে ম্যানেজ করা যায় তার একটা বুদ্ধি আমাকে বের করতেই হবে।

পাগলামি করিস না। আমার সাঁইত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। আর কবছর পরেই তো বুড়ি হয়ে যাব। আমার সুখ-দুঃখ নিয়ে আর ভাবি না। ছাত্রীরা আছে, স্কুল আছে, পড়াশুনা আছে — এই নিয়েই চলে যাবে জীবন।

কষ্টটাই এখন সঙ্গী হয়ে গেছে। তাকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে।

সুব্রতার বয়স এখন কত হবে?

কত হবে? বেয়াল্লিশ হবে তেতাল্লিশ। ওর কষ্টটা আমার চেয়ে অনেক বেশি। আমার জানা কত মেয়ে ওর প্রেমে পাগল আর খেঁদি-বুঁচি এই আমাকেই ওর মনে ধরল। আসলে ও গান-পাগল। আমাকে নয়, আমার গানকেই ও ভালবেসেছে।

বাড়ি পৌঁছেই চান করে শুয়ে পড়লাম। কোডারমাতে সুব্রতদাদের বাড়িতে যা খেয়েছি তাতে রাতে আর কারও খিদে ছিল না। সুব্রতদারও মা নেই। বাবার বয়স হয়েছে কিন্তু এখনও খুব শক্তসমর্থ। এককালে ভাল শিকারি ছিলেন। সুব্রতদা যে আমাদের রজৌলির ঘাটে নিয়ে গেছিলেন তা শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, ও ঘাটে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রাতে গাড়ি করেও কেউ যেত না। বাঘ ভাল্লুক চিতার রাজত্ব ছিল। ওই ঘাটেই সুব্রতদা আমাদের খলকতুম্বি নামের একটি অভ্রখনি দেখালেন। ওটি নাকি পৃথিবীর গভীরতম অভ্র খনি। ইংরেজদের কোম্পানি ছিল ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানি—কোডারমা থেকে কিছু দূরে শিবসাগর। ভারতের সবচেয়ে বড় অভ্র কোম্পানি।

সুব্রতদার বাবা বলেছিলেন, মাইকা বা অভ্র বড় বড় চাঙ্গরে পাওয়া যায়। পাথরের স্ল্যাবের মধ্যে মধ্যে থাকে। সেই চাঙ্গরের মধ্যে অগণ্য পরত থাকে। স্থানীয় মেয়েরা ছুরি দিয়ে মাইকার স্ল্যাব থেকে সেই সব ফিনফিনে পরত যে কী দক্ষতার সঙ্গে বের করে তা দেখবার মতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মাইকার চাহিদা কমে যায়। আগে এরোপ্লেনের জানালাতে মাইকা লাগত, পেট্রোম্যাক্সের এবং ভাল লণ্ঠনেও কাচের বদলে মাইকা ব্যবহার হতো। আরও অজস্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ ছিল মাইকার।

সুব্রতদার বাবা বলছিলেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ইংরেজদের কাছে থেকে রামকুমার আগরওয়াল কিনে নেন ওই কোম্পানি। ওঁরা উত্তরপ্রদেশের আগরওয়াল—নিরামিশাষী ছিলেন। ওঁদের পাঁচ নম্বর বাংলোটি ছিল গেস্ট হাউস। তখন কলকাতা থেকে গুহসাহেব শিকারে আসতেন। সঙ্গী হতেন সুব্রতদার বাবা এবং একজন মহারাষ্ট্রিয়ান লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার বিজাপুকার। শিকারের নানা রোমহর্ষক গল্প শোনালেন উনি মলি ও শেলির অনুরোধে।

বাড়িতে স্ত্রী নেই, একজন ভদ্রঘরের বিধবা মহিলা সুরমা মাসি পুরো সংসারের দায়িত্বে আছেন। উনি নাকি ওঁদেরই এক কর্মচারীর স্ত্রী। নিঃসন্তান বিধবা। তিনিও ঘর পেয়েছেন আর সমস্ত দিয়ে সেই ঘর সামলাচ্ছেন। সুব্রতদার শিক্ষা খুব ভাল।

ভারী সম্ভ্রান্ত তাঁর আচার-ব্যবহার। সুরমা মাসির সঙ্গে ও বাড়ির অন্যান্য কাজের লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার দেখেই বোঝা যায় মানুষটা ভারী ভদ্র আর নরম।

মিনুদি আর সুব্রতদার ব্যাপারে আমার মাথাতে একটা প্ল্যান এসেছে। সেটা সময়ে খুলব। মিনুদি কাল দুপুরে খাওয়ার সময়ে আসবে The Retreat-এ। তারপর সন্ধের মুখে মুখে আমরা হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক দেখতে যাব ওঁদের দিয়ে। একটু বেলা থাকতেই বেরোব নইলে রাজডেরোয়ার টাইগার ট্র্যাপটি দেখানো যাবে না। এই পার্কের নাম আসলে রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্ক। রামগড়ের রাজার শুটিং এরিয়া ছিল এটা আগে। সেখানেই প্রায় পঞ্চাশ বছর হল পার্ক হয়েছে। কাছেই রামগড়ের রাজার প্রাসাদ। এখন সেখানে বি এস এফ বা পুলিশের অফিস হয়েছে।

আমায় অবশ্য যেতে হবে সকালেই। গিয়ে মলি ও শেলিকে দিয়ে আমার কাকা, সুব্রতদার বাবা এবং রায়সাহেবকে ফোন করাতে হবে শনিবার বিকেল বিকেল আসবার জন্যে। সবসুদ্ধ শ দুয়েক মানুষ আসবেন। সবাইকে চা এবং স্ন্যাকস দিয়ে আপ্যায়িত করা হবে এমনই মলি শেলির ইচ্ছা। তারপর ঘনিষ্ঠ জন কুড়ি ডিনার খেয়ে যাবেন। সুব্রতদার বাবা সুরমা মাসি এবং বুড়ো দাদু রাতটাও The Retreat-এ কাটিয়ে যাবেন। রায়সাহেবকে ওরা রবিবারও আটকে রাখবে বলেছে তারপর দুপুরে খাওয়ার পরে ওঁর সঙ্গেই ছোটাপালু ঘাট হয়ে রাঁচি চলে যাবে। রাঁচি থেকে রাতে হাতিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস ধরে সোমবার সকালে কলকাতা। তাই সকালে পৌঁছে বিস্তর ফোনাফোনি করতে হবে। আমি লাইন ধরিয়ে দেব গৃহকর্ত্রীরা নেমন্তন্ন করবে। মিনুদি রাত জেগে একটা লিস্ট করে দেবে আমাকে। টেলিফোন গাইড খুলে ফোন নাম্বার দেখে দেখে সকলকে ফোন করতে। মিনুদি নিজেও কয়েকজনকে ফোন করবে। আর সুব্রতদারা দুটি গাড়িতে করে তাঁর বাবা প্রশান্ত মেসোমশাই ও সুরমা মাসিমা এবং তাঁদের খুব কাছের কয়েকজন গান-পাগল বন্ধুবান্ধব, সবসুদ্ধ জনা দশেক আসবেন। এমনই কথা হয়েছে প্রাথমিকভাবে।

সুব্রতদারা সে-রাতেই ফিরে যাবেন গাড়ি নিয়ে কোডারমা। আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের বাড়িতে থাকতে বলার কিন্তু সঙ্গে অনেকে আছেন। তাছাড়া এ বাড়ি যেদিন আসবেন সেদিন সানাই যাতে বাজে তারই চক্রান্ত করছি আমি। জানি না, সফল হব কি না।

ঘুম আসছে না। কেবলই মলি আর শেলির মুখ, কথা, হাসি এবং গান ফিরে ফিরে আসছে। রানি মুখার্জি এবং কাজল। একটা ঘোরের মধ্যে আছি। অনেকে বলে কাজল রানির চেয়ে অনেক ভাল অভিনেত্রী। হয়তো হবে। কিন্তু আমার রানিকে বেশি পছন্দ। হাসিটা কী দুষ্টু এবং মিষ্টি। রানি মুখার্জিকে প্রথমে দেখি হিরো সাইকেলের বিজ্ঞাপনে। তখনও নাম জানতাম না। বিজ্ঞাপনে দেখেই দিওয়ানা হবার উপক্রম। তারপর দেখলাম কভি খুশি কভি গম। সেই ছবিতে রানিকে পছন্দ না

করে শাহরুখ কাজলকে পছন্দ করল। তা করল করুক। আমি তো শাহরুখ খান নই, ওদের ভাষায় শাহরুখের মতো। আমার রানিকেই বেশি পছন্দ। মানে মলিকে।

তারপরই একটি বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলাম। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার ইচ্ছা। কোথায় হাজারিবাগ শহরের সামন্ত উকিলের জুনিয়র সামন্ত উকিল আর কোথায় ওরা। জানি স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন দেখার মধ্যেই তো স্বপ্নর সব মজা।

তবে মিনুদি আমাকে ফিউজ করে দিয়েছে। গাড়িতে। ওদের বলল, তোরা আবার রন্টুর গান শুনতে চাস না যেন। আর যা বলিস ও করে দেবে। নাচতেও পারে, অবশ্য মুখে গরম আলু পড়লে।

মলি বলল, ওরকম করে বোলো না মিনুদি। গান না গাইতে পারে তোমার ভাই গান ভাল তো বাসে।

তা বাসে।

একটু বেশিই বাসে। নইলে তোদের কি এত পছন্দ হয়।

গান তো শুনল বেচারা আজই গাড়িতে।

ওই হল।

কিন্তু বললে কী হবে? আমরা দুজনেই বলছিলাম তোমার ভাই ভীষণ হ্যান্ডসাম। শাহরুখ খান এর মতো।

মিনুদি বলল, হ্যাঁ রাঙা মুলো।

শাহরুখ মোটেই রাঙা নয়।

তাহলে কালো মুলো।

মিনুদি বলল।

ওরা সকলে হইহই করে হেসে উঠল।

কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বলা উচিত নয়। আমি মিনুদির জন্যে জান লড়িয়ে দিচ্ছি আর মিনুদির এই কি প্রতিদান? এটা উচিত নয়।

ফোন প্রায় সকলকেই করা হয়ে গেছে। পুরো হাজারিবাগ একসাইটেড। আমার উপর ভার পড়েছে স্টেজ বানাবার ও সাজাবার। ম্যাকস-এর মেনু ঠিক করবার।

এরকম সব কাজ করে মজা আছে। যা খুশি মনের খুশিতে করো, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, থুড়ি রায়সাহেব। অর্থ যে কত বড় জিনিস তা আমাদের মতো যারা মধ্যবিত্ত তারাই জানে।

আমাদের কি সখ নেই? রুচি নেই? সবই আছে শুধু যথেষ্ট অর্থের অভাবে সবকিছুই নমোঃ নমোঃ করে সারতে হয়। তবে যাই হোক, আমরা যা আমরা তাই। বেশি অর্থ মানুষকে, অধিকাংশ মানুষকেই নষ্ট করে দেয়। সবাই রায়সাহেব বা তার নাতনিদের মতো ভাল, ভদ্র এবং সুরুচিসম্পন্ন হন না। খুব কমই হন।

দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার পরে মিনুদির সঙ্গে ওরা গান নিয়ে বসল।

শেলি বলল, সকালে আসবে তো মিনুদি। ভরপেট খেয়ে কি গান করা যায়?

সেটা ঠিকই বলেছিস। কাল থেকে তাই আসব। তোরা রাতে নিজেরাই, মানে নিজের Soloগুলো একটু প্র্যাকটিস করে রাখিস। ভুলে যাস না, সুব্রতদার সঙ্গে দুটো ডুয়েট আছে আর তোদের দুজনের একটি ডুয়েট। দুজনেরই দুটো করে Solo। তাছাড়া কোরাস তো আছেই। প্রয়োজনে সুব্রতদাকে ফোন করে ফোনেই গেয়ে নিস।

এ আবার কি! সুব্রতদা আসতে পারছে না? এমন কী দূর পথ।

সে আমি জানি না। আমি বললে আসবে না জানি। তোরা বলে দ্যাখ।

এই যে মিস্টার সামন্ত। লাইনটা লাগান না দয়া করে একটু। দিই একটু কড়কে। রিহার্স না করলে প্রোগ্রাম তো ঝুলে যাবে একেবারে।

লাইন পেলে শেলি বলল, সুব্রতদা, উ আর ওয়ান্টেড ব্যাডলি হিয়ার। রিহার্স না করলে প্রোগ্রাম ঝুলে যাবে। কালকে আসছেনই। তারপর শনিবারে তো আসতেই হবে। স্টেজ রিহার্সাল।

তারপর সুব্রতদাকে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, কালকে সকালেই চা খেয়েই চলে আসুন। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বসব। তারপর লাঞ্চ ও ডিনারও এখানে।

ওদিক দিয়ে কী বললেন উনি বোঝা গেল না।

শেলি বলল, সুরমা মাসির অসুখ? কী হয়েছে? ধরাই পড়ছে না? তাহলেও আসুন সন্ধেবেলা না হয় ফিরেই যাবেন।

তারপর শেলি বলল, ও। সকালেই ডাক্তার আনতে যাবেন।

ঠিক আছে। তাহলে আর কি হবে। প্লিজ আসার চেষ্টা করবেন।

ফোন ছাড়লে আমি জিগগেস করলাম কী হল?

না সুরমা মাসির খুব অসুখ। কী অসুখ ধরা পড়ছে না। পেটে অসহ্য ব্যথা, জ্বর। তাই সকালে ডাক্তার-বৈদ্য করে ওঁকে সুস্থ করে, মানে যদি সুস্থ হন, তবে লাঞ্চ-এর আগে এসে পৌঁছবেন।

তারপর বললেন, মিনু যেন থাকে।

বোঝো মিনুদি। আমরা সব নন-এনটিটি।

মিনুদি বলল, তুইও যেমন। নিজে তো হারমনিয়ম বাজিয়ে গায় না। আমি না থাকলে বাজাবে কে?

শেলি বলল, আহা। কী যে বল তুমি। সুব্রতদার যা গলা আর যা সুরজ্ঞান। স্বরস্থান কাঁদেন না একফোঁটা। খালি গলাতে গাইলেও বহু বাঘা বাঘা আর্টিস্ট কাত হয়ে যাবে। ওসব বোলো না।

মলি বলল, তুই কিছু বুঝিস না। মিনুদিকে একটু দেখতে পেলে খুশি হন। বাজাবার জন্যে খোড়ি বলছেন।

আমি বললাম, ঘরের মধ্যে বসন্তোৎসবের গান নিয়েই বসে রইলেন আর

আপনার দাদুর বাগানে বসন্ত, আমাদের ঋতুরাজ যে কী দারুণ সাজে সেজেছেন সেটা একবারও দেখলেন না?

মলি বলল, চলুন তাহলে ঋতুরাজকেই প্রত্যক্ষ করে আসি।

তা আমাদের চিনিয়ে দেবে কে? ঋতুরাজের সাজ?

মলি বলল।

কেন? নির্গুণ আমিই চিনবো। গান গাইতে পারি না বলে কি অন্য কোনও গুণ নেই?

শেলি বলল, গুণের দরকারই বা কি? রূপই তো যথেষ্ট।

আমি বললাম, শোনো মিনুদি। তোমার কাছে গান শিখতে আসে যে সুরাতিয়া সে নাকি আমাকে ঘোড়ফরাস-এর সঙ্গে তুলনা করেছিল।

মিনু তো হাসলই, সঙ্গে ওরাও ঘোড়ফরাস শব্দের মানে না বুঝেই শুধু শব্দটির ধ্বনির ব্যঞ্জনাতেই হেসে উঠল।

ঘোড়ফরাস মানে কী?

শেলি বলল।

আরে বিরাট বড় বড় হালকা ধূসর অথবা নীল রাঙা হরিণ, থুড়ি অ্যান্টিলোপ হয় একরকমের। কপালে থাকলে তোরা রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্কে দেখতে পাবি, ওখানে আছে অনেক, তাদেরই বিহারে বলে ঘোড়ফরাস।

বিহার কি? ঝাড়খণ্ড বলো।

ওই হল।

এটা কী গাছ? কী সুন্দর হালকা বেগুনি ফুল?

এটা জ্যাকারান্ডা। শুনেছি অস্ট্রেলিয়া না আফ্রিকান গাছ। পালাম্যুর আমঝরিয়া বাংলোর সামনে অনেকগুলো গাছ আছে। কেঁড় বাংলোর সামনেই ছিল। তা টাইগার প্রজেক্টের ডিরেক্টর সেন সাহেব কেটে দিলেন। এমার্সনের সেই একটা কবিতা পড়েছিলাম না?

কী কবিতা?

Bold at the Engineer who fells the wood
Love not the flower they pluck
And know it not
All their botany is latin name

সেইরকম বনবিভাগের আমলা আর কি। মূল বাংলোর পাশে দুটো মস্ত বয়র গাছ ছিল। রাতে হরিণেরা বয়র খেতে আসত সে দুটোকে কেটে ফেলে স্ত্রীর মর্জিমতো না কি দুটি কটেজও বানিয়েছিলেন। একেই বলে খোদার ওপর খোদাকারি।

আমাদের নিয়ে যাবেন না পালাম্যু?

এত অল্প সময়ে কী হয়? কোনওরকমে বুড়ি ছুঁয়ে বেতলা দেখে আসা যাবে কিন্তু তবুও রাতে ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে হলে তো রাতে থাকতে হবে। দুদিন তো লাগবেই।

ওখানে কী কী দেখা যাবে?

বাঘ দেখা যাবে?

টাইগার প্রজেক্ট যখন, তখন বাঘ তো আছেই। তবে দেখা যাবে কি না বলা যায় না। বাঘেরা কোর এরিয়ার মধ্যেই থাকে সাধারণত, আর সাধারণ ট্যুরিস্টদের কোর এরিয়ার মধ্যে ঢোকা বারণ। তাছাড়া ওদিকে আজকাল এম সি সি-এর দৌরাত্ম্যও কম নয়। তবে বাঘ ছাড়া হাতি, গাউর বা ভারতীয় বাইসন, শম্বর, হরিণ ইত্যাদি অবশ্যই দেখা যাবে।

তারপর বললাম, আরেকবার আসুন অনেক সময়ে নিয়ে হাতে, অন্তত দিন পনেরো। এ অঞ্চলে যা যা দেখবার সব দেখিয়ে দেব। তবে আমার কোর এরিয়ার মধ্যে যাবার সুযোগ হয়েছিল চিফ জাস্টিস বসাকের সঙ্গে। বাগেচম্পা, কুটকু, কুজরুম, সইদুপ ঘাট সব দেখেছিলাম। বাগেচম্পার সামনের কোয়েলে চান করেছিলাম। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। তবে সেই একদিনের সফরে বাঘ দেখিনি। রাতে অবশ্য আমরা থাকিওনি।

মলি বলল, এগুলো কী গাছ?

মিনুদি বলল, এগুলো আমিও চিনি। সোনাঝুরি। জামশেদপুরের সোনারি লিন-এ হাজার হাজার আছে। কাইজার বাংলোর সব রাস্তাতেই। আর ওটা ইউক্যালিপটাস। এমনিতেই হাওয়াতে সুগন্ধ ছড়ায় আর বর্ষাকালে তো কথাই নেই।

তবে এই দু গাছই ভাল নয়।

আমি বললাম।

কেন ভাল নয়? ইউক্যালিপটাস থেকে ইউক্যালিপটাস অয়েল হয়। সর্দিতে একটু শুঁকলেই সর্দি ভাল। তাছাড়া কত ওষুধে লাগে।

মিনুদি বলল।

তা লাগে। কিন্তু এসব কাছে পোকা হয় না, পোকা হয় না তাই পাখি বসে না, পাখি বাসা করে না বলে সাপ আসে না, সাপ আসে না বলে ময়ূর আসে না...

বাবা এত নটে গাছটি মুড়োলোর মতো গল্প দেখছি।

মলি বলল।

অনেকটা তাই। এসব ইকোলজিকাল ব্যালান্স-এর ব্যাপার।

বাবাঃ আপনি উকিল হলেও কত কী জানেন।

উকিলদের পেশাটাই এমন যে তাঁদের অনেক কিছুই জানতে হয়। আমি আপনার বড়দাদুকে দেখেছিলাম একটা মার্ডার কেসে জেরা করবার জন্যে রাঁচির বিখ্যাত শিকারি পরিবার ময়মনসিংহের আচার্যদের বাড়ির কারোকে ডেকে শটস আল এল জি আর বুলেট চিরে ফেলে দেখেছিলেন। কত নম্বর শটে কত গুলি ছররা থাকে—এক থেকে দশ নম্বর—তারপর এল জি, এস এস জি ইত্যাদি ইত্যাদি সব গুলি খুলে দেখেছিলেন। যে কোনও বিষয়েই জ্ঞান গভীর না হলে ভাল উকিল হওয়া যায় না।

আপনি বুঝি খুব ভাল উকিল?

শেলি বলল।

আমি বললাম, আমার তো মোটে দুবছরের প্র্যাকটিস। তবে আই এনজয় মাই ওয়ার্ক। জব স্যাটিসফ্যাকশান না থাকলে সে কাজ ভাল করে করা যায় না। তাছাড়া, আমার সামনে আমার কাকা এবং আপনাদের বড়দাদুর দৃষ্টান্ত তো আছে।

এটা কী গাছ?

মলি জিগগেস করল।

ডানহাতটা তুলে যখন গাছটার দিকে দেখাল তখন আমার মনে হল রানি মুখার্জিই বুঝি। ভাল লাগাতে মরে গেলাম।

বললাম, এর নাম বাসন্তী। এই বসন্তেই এদের হলুদ ফুল ফোটে। ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় নীচটা। আর কৃষ্ণচূড়া তো চেনেন। ওই দেখুন নীল কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া তো চেনেনই। ওই দিকে দেখুন অমলতাস। কালিদাসের মেঘদূত-এ এই গাছের কথা আছে।

তুই কি মেঘদূতও পড়েছিস নাকি?

মিনুদি বলল।

না পড়িনি। লোকমুখে শুনেছি। তবে মেঘদূত না পড়লেও যক্ষের বিরহবেদনাটা বুঝি।

মিনুদি চুপ করে গেল। মলি ও শেলি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

এই দিকে দেখুন, লালপাতিয়া বা পনসেটিয়ার ঝাড়। লালে লাল। আর এই যে ক্রোটনের বেড়। নানা রঙের ক্রোটন আছে। অর্কিডের খুব শখ রায়সাহেবের। ওই গ্রিন হাউসে এয়ারকন্ডিশনার লাগিয়ে লোলেগাঁও থেকে নানারকম অর্কিড আনিয়ে রেখেছেন। লাভা লোলেগাঁও-এর নাম লোকে অর্কিডের জন্যে জানে কিন্তু সেখানের জোঁকও যে পৃথিবীর বিখ্যাত তাক কম লোকই জানে। একটা জোঁক অর্কিডের সঙ্গে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতা এবং সেখান থেকে এয়ারকন্ডিশনড ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্টে চড়ে রাঁচি এবং রাঁচি থেকে হাজারিবাগের

The Retreat ফ্রি রাইড পেয়ে চলে এসেছিল। তার প্রথম ক্যাজুয়াল্টি হয় ওই ঘোতনবাবু। নকুলরাও ঘোতনবাবুকে দেখতে পারে না। তারা খুব আনন্দ পেয়েছিল ঘোতনের পেছনে জোঁক লেগে যাওয়ায়। ঘোতনই কলকাতা থেকে অর্কিডগুলো নিয়ে এসেছিলেন।

মলিরা খুবই এনজয় করল ব্যাপারটা। মানে, ঘোতনের দুরবস্থার কথা পুরোপুরি জেনে।

ওটা কী গাছ? শিউলি না? গিরিডিতে মামাবাড়িতে একটা ছিল। কিন্তু ফুল কই?

শেলি বলল।

শিউলির ফুল কি এখন ফোটে। শরতে ফোটে। তখন শিউলি ডাল ভরে থাকবে কমলারঙা বোঁটার সাদা ফুলে। আর এই দেখো ওটা নাগকেশর, আর ওটা নাগচম্পা।

ওমা! একটা দোলনাও আছে দেখছি।

শেলি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল।

হ্যাঁ। রায়সাহেবের নাতনিরা নাত-জামাইদের সঙ্গে দুলবেন বলে বানিয়ে রেখেছেন।

মলি বলল, আমরা নিজেরাই দুলতে পারি। নাত-জামাইদের কী দরকার।

শেলি বলল, এগুলোই কি পলাশ?

হ্যাঁ, এগুলো পলাশ, এদিকে তিন-চারটে শিমুল, আর ওই দিকে অশোক। আর দেখুন ওই গাছটার নাম অগ্নিশিখা। আসলে টিউলিপ। আফ্রিকান গাছ। রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন আকাশমণি।

দাদু এখানে যখন থাকেন তখন এই বাগানে ঘোরেন?

সময় পান কোথায়? এখানে এলে তো উকিলেরা ছেঁকে ধরেন। ঈশ্বরের এই এক বিষম অবিচার। একদিক দিয়ে দিলে অন্যদিকে দিয়ে কেড়ে নেন। যাঁকে বৈভব দেন, ক্ষমতা দেন, অর্থ দেন বিপুল, যশ দেন তাকে একটুও সময় দেন না সেসব কোনও কিছু উপভোগ করার।

ওই বিরাট গাছটা কি, নীচে ছোট ছোট ফল পড়ে আছে।

ওগুলো তুলে তোমাদের দিতে বলছি মালিদের। এর নাম ফলসা।

মিনুদি বলল।

আবার বলল, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে পড়িসনি?

কী?

মলি জিজ্ঞেস করল।

ফলসাবরণ শড়িটি চরণ ঘিরে। এই ফলসার যেমন রঙ তেমন হালকা বেগুনি

রঙের শাড়ির কথাই উনি বলেছিলেন। ফলসা ফল খেতেও ভাল।

এবারে চলো গানগুলো একটু দেখে নিতে হবে।

মিনুদি বলল।

তারপর বলল। রন্টু তুই হিমাদ্রিবাবুর ছেলেকে ওর বাঁয়া তবলাটা নিয়ে আসতে বলবি কালকে। আর মিশ্রজিকে বলতে হবে এসরাজ নিয়ে আসতে।

তবলচি কেমন বাজায়?

কাহারবা দাদরা বাজিয়ে দেয়। বাঁয়া দিয়ে খোলের কাজও সারে কিন্তু এই এক রোগ?

কী?

লয় বাড়িয়ে দেয়। অন্তরাতে যে লয়, সঞ্চারী আবেগে অন্য হয়ে যায়।

এইরে!

মলি বলল, তাহলে তো মাঝপথে আমি গানই থামিয়ে দেব।

আজই গিয়ে খবর দিয়ে আসিস। শুক্রবার স্টেজ রিহার্সালে আর শনিবার অনুষ্ঠানের জন্যেও বলে আসবি। ওঁদের সকলকেই ন্যায্য সম্মানী দেওয়া হবে।

গাড়িটা নিয়ে চলে যান না। তাড়াতাড়ি হবে। আর গাড়ির তো আমাদের দরকার নেই এখন।

ও বাবা। গরিবের ঘোড়ারোগের দরকার নেই। আমাকে এখানে এমন এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি চড়তে কেউই দেখেনি। কোর্টে যাবার সময় কোনও কোনওদিন কাকার মারুতিতে যাই বটে তবে কালেভদ্রে। আমার সাইকেলই ভাল। ক্রিং ক্রিং শুনে ওরা জানালা দিয়ে বলবে কওন হ্যায় হো। টয়োটা কালিস-এর ফিনিক হর্ন শুনে ভাববে বাড়িতে পুলিশ এসেছে। এ আমি সাইকেল নিয়েই যাব।

আমার কথা শুনে ওরা সকলে হেসে উঠল। মিনুদিও।

মলি বলল, আপনার মতো চেহারাতে সাইকেল চড়া মানায় না।

আপনার শাহরুখ খান কি সাইকেল চড়া রোল করেনি কখনও।

তাকে তো চিনি না। চিনলে, বলতাম। আপনাকে চিনি বলেই বলতে পারলাম।

মলির চোখে-মুখে সবসময়ে একটা মিষ্টি দুষ্টু ভাব থাকে রানি মুখার্জির মতো। আমার জীবনে আমি এত দুর্বল কারও প্রতিই হইনি। ক্রমশই বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছি। কপালে দুঃখ আছে। ঘুঁটেকুড়ানো ছেলের সঙ্গে রাজকুমারির প্রেম সিনেমাতে হয়। বাস্তবে হয় না। প্রেম হলেও হতে পারে কিন্তু সে প্রেম পরিণতি পায় না।

মলি শেলিরা আমার মতো সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবু যতক্ষণ কাছে কাছে থাকতে পাই ততক্ষণই সুখ।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে বসবার ঘরে ওরা গান নিয়ে বসল সকলে। মিনুদি বলল,

মলি, তুই তোর প্রথম Soloটা আগে গা। মলি একবার আমার দিকে অপাঙ্গে চাইল। কেন চাইল বুঝলাম না। মলি ধরল,

একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি,
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী ...

মিনুদি পরম নিষ্ঠুরের মতো বলল, তুই হাঁ করে কি শুনতে বসলি রন্টু। তুই গিয়ে ওদের সব খবর দিয়ে আয়। অন্য কোনও জায়গাতে বায়না নিয়ে ফেললে তো আসতেই পারবেন না ওঁরা। যা, দেরি করিস না।

আমি স্পষ্ট দেখলাম মলির মুখ কালো হয়ে গেল। একবার চাইল আমার দিকে চোখের কোণে।

আমি উঠে গেলাম। তারপর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই মুন্সালাল-এর দোকানে গিয়ে কালি পিলি জর্দা দিয়ে এক জোড়া পান খেলাম।

প্রথম দিনই ওরা বলেছিল, এ মা আপনি পান খান? কী বাজে হ্যাবিট। সিগারেটও খান নাকি।

আমি তো আসলে খাই বিহার আর্মড পুলিশের ইউনিফর্মের রঙের বিড়ি। ওদের তো সে কথা বলা যায় না।

স্মোক করলে পাইপ খাবেন। একমাত্র রেসপেক্টেবল ব্যাপার। এরিনমোর বা গোলডব্লক টোব্যাকো খাবেন। আমার বাবা খান। ভারী সুন্দর গন্ধে ভরপুর থাকে বাবার ঘর। টোব্যাকোর টিনের উপরে লেখা আছে Smoking is injurious to health। উল্টোদিকে লেখা আছে Smoking Damages the health of those around you. কিন্তু বাবা বলেন এসব বাতিকগ্রস্ত আমেরিকানদের বাতিক আর তামাক চাষ করা গরিব দেশগুলোর ইকনমি নষ্ট করার বাহানা। এত মানুষ এতদিন ধরে খেয়ে আসছে। ক্যানসার যেন শুধু লাংগস আর জিভেই হয়, অন্যত্র হয় না। স্পেইন ও মেক্সিকোতে আশিভাগ মানুষে স্মোক করে। তারা কি মরে হেজে গেছে? কিউবাতেও খায়। এ আমেরিকানগুলো শুধু দুটো জিনিস জানে, পয়সা আর স্বাস্থ্য। অত বেশিদিন বেঁচে নিজেদের ভোগ-বিলাস ছাড়া আর কোন্ কর্মটি করে তারা বলতো? তাছাড়া কিছু মানুষ থাকে, যাদের জীবন আর কাজ সমার্থক। সিনোনিমাস। কাজ না করে বেশিদিন বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না।

আপনার বাবা কী করেন?

এখন কিছু করেন না। প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন। হার্ভার্ড-এর Dean ছিলেন। দেশে ফেরার জন্যেই রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন। এখন পৃথিবীর নানা দেশে

ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ঘুরে বেড়ান। বছরের মধ্যে সাত-আট মাস বাইরেই থাকেন। কিন্তু পুজো আর পয়লা বৈশাখের সময়ে দেশে থাকার খুবই চেষ্টা করেন।

আমি বলেছিলাম, লাইক ফাদার লাইক ডটার।

জর্দার একটা বড় ঢোক গেলাতে বুকটা ধড়ফড় করে উঠল।

মুঙ্গালালকে বললাম ঔর দো পান লাগলও মুঙ্গালাল। তারপর হান্টার মার্কা বিড়িও কিনলাম দু প্যাকেট। আমি যা, আমি তা। আমি বামন, এই বিরাট দেশের আমজনতার একজন। আমি তো মলির বাবা নই, রাঁচির ধীরু রায়ও নই। আমি মরে গেলেই বা কি। দু চারজন ইয়ার দোস্ত আর দু-চারজন মক্কেলের একটু দুঃখ হবে। এই যা।

মিনুদি একটা গান গায় প্রায়ই। 'আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, দিন শেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে হুতাশে'। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ডও আছে এই গানটির। আমার দিনশেষের দরকার নেই। আমি স্বপ্ন চাই না। নইলে একে বাড়তে দিলে দুঃখই বাড়বে।

ওরা গাড়িতে, কোডারমা যাতায়াতের পথে অনেক বসন্তের গান গাইছিল। এয়ারকন্ডিশনড গাড়িতে গান গাইতে খুব মজা। গানগুলো এতবার শুনেছি কিন্তু কখনও পুরোনো হয় না। রবীন্দ্রনাথের গানের এই জাদু। 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে', 'ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি', 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় আমি করেছি যে দান', 'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে, গোপনে'। মিনুদি একটা গান খুব ভাল গায়। গানটা খুব কঠিনও। মিনুদি ঋতু গুহর কাছ থেকে গানটা শিখে এসেছিল কলকাতা থেকেই, 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী'। গানটা, শুনেছি, দক্ষিণ ভারতীয় রাগ শিংহেন্দ্রমধ্যমে বাঁধা। গানটির ছন্দ ও লয়ে খুবই বৈচিত্র্য আছে।

পান খেয়ে, একটা হান্টার মার্কা বিড়ি ধরিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলাম আমি।

বিকেলে, বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে রাজডেরোয়াতে রাজার বাঘ ধরার ট্র্যাপ দেখালাম ওঁদের। ভারি উত্তেজিত। প্রকাণ্ড একটা কুয়ো খোঁড়া। তার মধ্যে পড়ে গিয়ে উঠবার কোনও উপায় ছিল না। মোষ বা গরু বেঁধে রেখে কুয়োর উপরটা টাটকা কাটা পাতাসুদ্ধ হালকা ডাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। আর বাঘ মোষ বা গরু ধরার জন্যে এগোতে গেলেই সেই হালকা ডালের উপরে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গেই হালকা ডাল বাঘের ভার সইতে না পেরে ভেঙে যেত এবং বাঘও সঙ্গে সঙ্গে পপাতধরণীতলে। দিন তিনচার খাদ্য ও জল না পেয়ে এবং ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে বাঘ যখন নিস্তেজ হয়ে যেত তখন সিমেন্টের তৈরি যে একটা সুড়ঙ্গ কুড়ি ডিগ্রিতে এসে বাঘের সিমেন্ট বাঁধানো কুয়োতে মিলেছিল সেই সুড়ঙ্গের মুখে একটি মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া খাঁচা বসানো হত। তার তিনদিক বন্ধ।

খোলা দিকটি থাকত সুড়ঙ্গর দিকে। সেই খাঁচার মধ্যে একটি পাঁঠা বা বাছুর দেওয়া থাকত। ক্ষুধার্ত বাঘ যখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠে এসে খাঁচাতে ঢুকে পড়ত তখন খাঁচার মুখটি ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হত।

বাঘ বন্দী হলে সেই বাঘ বিক্রি করা হত। নয় অন্য রাজা মহারাজা বড়লোকেরা কিনতেন, অনেক সময়ে চিড়িয়াখানারাও কিনত।

কয়েকটি নীল গাই, শম্বর, একটি শিয়াল, একটি ভালুক এবং একটি চিতা দেখতে পেল ওরা।

মিনুদি বলল, দূর তোদের এই পার্কে কোনওদিনও বাঘ দেখিনি গত পঞ্চাশ বছরে।

পঞ্চাশ বছরে দেখেছ কিনা বলতে পারব না। আমি তো মাত্র দুবছর হলই তোমাদের রাজ্যে এসেছি। আসার পর থেকে বার পাঁচেক এসে আমিও দেখিনি। আমি চিতাও দেখিনি, এই প্রথম। তোমার লাকে।

আমার লাক নয়, বল বুড়ি ও খুকুর লাকে।

তাহলে আমরা লাকি বলতে হবে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নাতে আমরা হাজারিবাগ ন্যাশানাল পার্ক-এর পাঁচ নম্বর টাওয়ারে উঠে বনের রূপ উপভোগ করলাম। মানে, ওঁরা করলেন। আমি সকলকেই গরম জামা আনতে বলেছিলাম। জঙ্গলের মধ্যে রাতের বেলা মার্চ মাসেও দারুণ ঠাণ্ডা। যেখানে ছোট একটা লেক আছে তার পাশের ক্যাফিটারিয়া থেকে কফি খাওয়া হল।

পূর্ণিমার আর ঠিক তিনদিন বাকি। সুব্রতদা দুদিন এসেছিলেন। পুরোদমে রিহার্সাল চলছে। যন্ত্রীরাও সব আসছেন দুদিন হল। অনুষ্ঠান মনে হচ্ছে খুব ভালই হবে। অমলবাবুর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ কম্পাউন্ডে দেখা হল। উনি আসবেন। স্টেট ব্যাংকের রবীনবাবুও উৎসাহে টগবগ করে ফুটছেন। রবীন ভট্টাচার্য।

এখন রাত আটটা। ভিতরে রিহার্সাল চলছে। আমি বাগানে দোলনাতে বসে আছি। আসলে এসেছি বিড়ি খেতে। বাগানটা আট বিঘার। বিভিন্ন লেভেল-এ। নীচের লেভেল-এ একটা ছোট পুকুর মতো আছে। পুকুর ঠিক নয়, pond বলা ভাল। সেখানে কলকাতার গার্ডেন প্ল্যানার এসে জ্যাপানিজ গার্ডেন সেট-আপ করে গেছেন এ বাড়িটি রায়সাহেব কেনার পর পরই। গার্ডেন প্ল্যানারের লোক প্রতি দু'মাসে একবার করে আসেন কলকাতা থেকে। দুদিন থেকে যান।

বসে বসে মলির কথা ভাবছি, বামন ভাবছে চাঁদের কথা। এমন সময়ে হঠাৎ পেছন থেকে শোনা গেল, এখানে কী হচ্ছে? কবিত্ব?

আমার রানি মুখার্জি এসে গেছে।

পরক্ষণেই বলল, কী বোঁটকা গন্ধ একটা। বাঘ ঢুকলো নাকি বাগানে?

আমি বললাম, বাঘ তো রাজডেরোয়া ঢুঁড়েও দেখা গেল না। গন্ধ-গোকুল হবে।

নাঃ। গন্ধ গোকুলের গন্ধ আমি জানি। গিরিডিতে মামাবাড়ির বাগানে ছিল। আতপ চাল আতপ চাল গন্ধ। তাহলে হয়তো অন্য কোনও জানোয়ার। জানেন তো সুব্রত চ্যাটার্জি বলে এক ভদ্রলোক, ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস-এর অফিসার ছিলেন, ফ্যাক্টরির কম্পাউন্ডের মধ্যেই একটি বাঘ মেরেছিলেন। টাইগার। অত উঁচু দেওয়াল, তাও আবার তার উপরে কাঁটাতারের বেড়া, বাঘ যে কী করে ঢুকেছিল তাই এক রহস্য। কোনও ব্যর্থ প্রেমিক বা আত্মহত্যাকারী বাঘ হবে।

আপনার পাশে একটু বসব, দোলনাতে?

বলেন কি? এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। যেখানে নাতজামাইয়ের বসার কথা সেখানে এক উটকো প্রলেতারিয়েত বসে আছে আর আপনি বসবেন তারই পাশে? বসুন। বসুন। বলে, আমি উঠে দাঁড়িয়ে দোলনাটা পকেট থেকে রুমাল বের করে একটু মুছে দিলাম।

রুমালটা নষ্ট করলেন।

এর চেয়ে ভাল কাজে রুমাল এই কি আর লাগতে পারত?

মলি বসল। বসে বলল, দোল দেবেন?

আপনি বললে জানও দিতে পারি ম্যাডাম আর সামান্য দোল দেবার কথা কি?

সেই কবে শেষ দোলনাতে চড়েছিলাম। স্কুলে পড়ার সময়ে।

তখনও কি আপনি এমন রানি মুখার্জির মতোই দেখতে ছিলেন?

জানি না। বাজে কথা বলেন ভীষণ আপনি।

আমিই যেন প্রথমে একথা বললাম!

মলি চুপ করে রইল।

বললাম, মেয়েরাও ফুলের মতো। যখন কুঁড়ি থাকে তখন একরকম, অন্যরকম তাদের চেহারা, গলার স্বর। তারপর কুঁড়ি যেমন পাপড়ি মেলতে মেলতে একদিন ফুল হয়ে ওঠে মেয়েরাও তেমন করে বড় হয়ে ওঠে। গলার স্বর ভেঙে কোকিলের স্বর হয়।

উঃ। আপনি পারেনও বটে। ফৌজদারি উকিলের এত কবিত্ব অসহ্য। কিন্তু কথাটা আপনি ভালই বলেন।

কথা না ভাল বলতে পারলে কি উকিল হওয়া যায়? তাছাড়া, ওকালতি একটা পেশামাত্র। কতরকম পেশা থাকে মানুষের। সেটা একটা নির্মোক, মলাট। তার ভিতরে যে মানুষটা থাকে তার সঙ্গে তো কবি বা চিত্রী বা অধ্যাপকের কোনও অমিল নেই। শামলা এঁটে 'ইউর অনার' বলে নিজেকে দীনাতিদীন করি বলে কি আমি

মানুষটাও দীনাতিদীন। আমার নিজস্বতায় আমি মহারাজ।

সত্যিই ভারি সুন্দর কথা বলেন আপনি।

জানি না। তবে আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আর তেমন পেলাম কই?

পেলে কী বলতেন?

তা তো ঠিক করে রাখিনি। তবে কথা অনর্গল বলতাম, আগল খোলা উশ্রী নদীর মতো। আর সেই কথার স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম।

অ্যাই। অত জোরে দোল দেবেন না। পড়ে গিয়ে দাঁত ভাঙলে বড়দাদু দেবে আপনাকে।

উত্তর না দিয়ে বললাম, আপনার কাছে আমি দুটি জিনিস চাইব। দেবেন?

অসাধ্য না হলে অবশ্যই দেব। উ আর সাচ আ প্লেজেন্ট পার্সন। বলুন কি চাই? আমার অদেয় কিছু চাইবেন না কিন্তু।

না। আমি অবুঝ নই। তা চাইব না।

প্রথমটা হচ্ছে একটা গান।

গান তো কতই গাইছি।

সে তো সকলকে শোনাবার জন্যে গাইছেন। শুধুমাত্র আমার জন্যেই একটা গান গাইতে হবে যে গান অন্য কেউই শুনতে পাবে না। এবং গাইতে হবে এখনই।

ওরে বাবা। গান গেয়ে গেয়ে গলা ব্যথা হয়ে গেল বলেই তো কোরাসের সময়ে পালিয়ে এলুম একটু চাঁদের আলো দেখব বলে। এসে কী বিপদেই না পড়লুম।

প্লিজ। অন্য কেউ এসে পড়তে পারে। তাহলে আর গানটা আমার একার থাকবে না। এমন একটা গান করুন যে গান চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আপনি রাতের বেলা গুনগুনিয়ে গান।

তেমন আঁচড়াবার মতো চুল আবার আমার আছে নাকি? কবেই তো কেটে ছোট করে দিয়েছি।

খুবই অন্যায় করেছেন। আপনার মতো সুন্দরীর বেশ কোমর-ছাপানো সুগন্ধি চুল থাকবে. তবে না মানাবে।

আপনি বিয়ে যখন করবেন তখন কোনও কেশবরণ কন্যাকে বিয়ে করবেন।

তারপর বলল, বিয়ে করবেন না আপনি? পায়ে তো দাঁড়িয়েই গেছেন।

বিয়ে করার মতো সহজ কাজ এদেশে আর তো কিছুই নেই। কিন্তু পায়ে আমি দাঁড়াইনি। আপনার বড় দাদুও ওকালতি করেন আর আমিও করি অথচ কত তফাত। জীবনে হবার মতো কিছু না হয়ে ওঠবার আগে বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না। তাছাড়া, করলেই তো সব ফুরিয়ে গেল। সব স্বপ্ন, সব কল্পনা।

এটা খুব দামি কথা বলেছেন।

চুল যদি নাই আঁচড়ান তবে আপনি চান করতে করতে চানঘরে যে-গান গান সেইটি গান, অথবা বৃষ্টিঝরা নিশুতি রাতে ফুলের গন্ধের মধ্যে।

উঃ। পারি না আপনাকে নিয়ে। এ যুগে এমন রোম্যান্টিসজ্‌ম দেখা তো যায় না, কল্পনাও করা যায় না।

এবারে গানটা। প্লিজ!

চাঁপা গাছে অজস্র চাঁপা ফুটেছিল। পেছন দিকে দুটো মহুয়াও ছিল। গন্ধে পৃথিবী একেবারে বুঁদ। আর কী আলো সুনীল আকাশের চাঁদের। মলি হঠাৎই ধরে দিল। গানটা গাইল নিচু গলাতে।

'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে মধুপ হোথা যাসনে
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে'

গানটা শেষ হলে আমি বললাম, চমৎকার। তবে গানটা দ্ব্যর্থক।

দ্ব্যর্থক মানে?

মানে যার দুটো মানে।

মানে?

মানে, একটা রবিঠাকুর যা ভেবে লিখেছিলেন সেটা আর অন্যটা আমাকে Chastise করার জন্যে। আপনার ভয় নেই কোনও। এই ভ্রমর এত বড় ইডিয়ট নয় যে গোলাপের দিকে যাবে। সে তার অধিকার এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন।

আপনি বড় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগেন। আমি তো আপনার মতো হ্যান্ডসাম স্মার্ট, ওয়েল-মিনিং পুরুষ বেশি দেখিনি।

কিন্তু এখন একটু চুপ করুন।

কী পরিবেশ। আমার যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

স্বপ্নের মতো?

হ্যাঁ।

আমারও।

জন ডান পড়েছেন আপনি?

মলি বলল।

না। তবে 'শেষের কবিতা'তে ডান-এর একটি উদ্ধৃতি আছে সেটি পড়েছি। আপনি পড়েছেন?

আমি কলেজে ভর্তি হবার পরে আমার বাবা আমাকে জন ডান-এর কবিতার একটি লেদারবাউড এডিশন দিয়েছিলেন।

মেয়েকে জন ডান উপহার দেওয়া বাবাদের আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কী দুর্দৈবই হল।

আপনার মনে আছে উদ্ধৃতিটি।

আছে।

বলুন তো?

Please hold your toungue and let me love.

রাইট। বাঃ, আপনি তো সুন্দর আবৃত্তি করেন।

করলে কী হয়, গান তো গাইতে পারি না।

আপনি আমাদের শনিবারের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দর একটি কবিতা আবৃত্তি করবেন?

মাথা খারাপ। কাকা আসবেন। ভাইপোর এরকম অধঃপতন দেখলে কাকার হার্ট-অ্যাটাক হবে। হাজারিবাগের ফৌজদারি উকিল জীবনানন্দ আবৃত্তি করছে এত বড় সর্বনাশ কাকা বরদাস্ত করতে পারবেন না।

মলি হেসে উঠল।

বলল, উনি কি খুবই বেরসিক?

তা বলব না। বলব, প্র্যাকটিকাল। যা কিছুই পেশার কাজে না আসে, তাই ওঁর কাছে বাহুল্য।

উ হ্যাভ আ ব্যারিটোন ভয়েস।

থ্যাঙ্ক উ ম্যাডাম। যখন তাঁরা স্বর্ণরথে করে নগর পরিক্রমাতে বেরোন তখন পথ পাশের কত কিছু, কত মানুষকেই ভাল লাগে কিন্তু রাজকুমারীরা পথের মানুষদের কেউ নন। কেউ হন না। তাদের জন্যে প্রিন্স-চার্মিংরা অন্য রথে করে প্রাসাদে ঢোকেন। প্রিন্স চার্মিংদের মার্সিডিজ, লেক্সাস, বা বি এম ডাব্লু গাড়ি থাকে, সাইকেলে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে তারা যায় না।

যে-গানটা গাইলাম সেটার আপনি এমন একটা খারাপ মানে করলেন যে আপনাকে আরেকটা গান শোনাচ্ছি।

ওঃ আমার কী সৌভাগ্য।

আপনি এবার পাশে এসে বসুন। নইলে, কেউ দেখলে ভাববে ভদ্রলোকের ছেলে, এত বড় উকিলকে দিয়ে আমি নকুলের কাজ করাচ্ছি।

বেশ! বসলাম পাশে। যথা আজ্ঞা।

আমি বললাম।

এ গানটি কিন্তু শুধু আপনারই জন্যে। সত্যি!

আমি এক ঘোরের মধ্যে বললাম, গান। সত্যিই ঘোর লেগেছিল আমার। ওই রাত, ওই চাঁদ, এ ফুলের গন্ধ আর ওই নারী।

মলি গাইল।

'সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা, সে যে সৃষ্টিছাড়া॥
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী, পাতায় পাতায় কানাকানি—
'ওই এল যে' 'ওই এল যে' পরাণ দিল সাড়া॥

এই তো আমার আপনারই এই ফুল ফোটানোর মাঝে তারে দেখি নয়ন ভরে নানা রঙের সাজে। এই পাখির গানে গানে চরণধ্বনি বয়ে আনে বিশ্ববীণার তারে তারে এই তো দিল নাড়া।

সে কি ভাবে গোপন রবে ..

গান শেষ হলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, জানেন তো কারোকে কিছু সদ্‌কা করে ছেড়ে দিলে তা আর ফেরত হয় না।

সদ্‌কা করে মানে? কথাটার মানে বুঝলাম না।

কারোকে কোনও জিনিস দিয়ে ফেরত নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় তা জানেন তো?

মলি হেসে বলল, হ্যাঁ। ঠাকুমা বলতেন বটে।

এই গান আপনি কিন্তু আমাকে দিয়ে দিলেন।

গান তো রবীন্দ্রনাথের। তাঁর গান আমি দেব কী করে। তবে আমার গলাতে এ গান আর গাইব না এ প্রতিশ্রুতি দিলাম। আজকের এই গন্ধবিধুর, রাতে স্মৃতি হিসেবে এ গান রেখে দেব আমি। আপনি কখনও যদি দূর ভবিষ্যতে শুনতে চান তবে শুধু আপনাকেই শোনাবো।

এত মহামূল্য দান। এ দান রাখি এমন আলমারি তো আমার নেই। হাতের শিরা কেটে আমার রক্তের মধ্যে এ গানকে রেখে দেব আমি।

তারপর যখন রক্তপাতে মারা যাবেন তখন?

আপনি আমার হাতে একটি চুমু খেয়ে দিলেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

উঃ পারেনও আপনি। জানি না। কেন যে বাঙালি ছেলেরা চুমুর ব্যাপারে হাতের ওপরে ওঠার সাহস রাখে না।

কথা ঘুরিয়ে আমি বললাম, আপনি কি জানেন যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই হাজারিবাগকে একটি অসাধারণ সার্টিফিকেট দিয়ে গেছিলেন।

না তো। সেটা কী?

এমন সময়ে শেলিকে আসতে দেখা গেল।

শেলি বলল, তুই এখানে! আর আমরা তো প্রায় কোতোয়ালিতে খবর দিচ্ছিলাম। মিনুদি চলে গেলেন। সুব্রতদা তো চলে গেলেন বেশ অনেকক্ষণ হল।

সুব্রতদা আগে গেলেন কেন?

কেন? সরমা মাসি এখনও সুস্থ হননি?

তিনি তো সুস্থ হয়ে গেছেন। আমি বললাম।

না, সুরমা মাসি নন। সুব্রতদার বাবারই শরীরটা নাকি হঠাৎ খারাপ হয়েছে।

আস্তে গাড়ি চালিয়ে যেতে বলেছিস তো? এমন গাড়ি চালান যেন ফর্মুলা কার চালাচ্ছেন। ভয় করে আমার। মলি বলল।

বললেও কে শুনছে সে কথা। বলেই বলল, তা তোরা দুজনে এখানে কী করছিলি?

দেখতেই তো পাচ্ছিস। দোলনা দুলছিলাম।

আমি শেলিকে দেখেই দোলনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

মলি বলল, আমাকে দোলা দিচ্ছিলেন রন্টু।

তোকে একা দোল দেবেন কেন? আমি বুঝি কেউ নই?

আপনিও বসুন, দুজনেই বসুন, দোল দিচ্ছি।

তা কেন? আপনাকেও বসতে হবে। তারপর তিনজনে পায়ে ধাক্কা দিয়ে দোল খাব।

আমি বললাম, রিহার্সাল এখন শেষ। কাজের লোকেরা যে কেউ এসে পড়তে পারে। এমনকী, ঘোতনবাবুও এসে পড়তে পারেন। তাঁরা যদি আমাকে কৃষ্ণলীলায় মত্ত দেখেন আপনার বড়দাদু আমার আর রক্ষা রাখবেন না।

আবার ঘোতনবাবু?

বলা যায় না। ক্রসিঙের ফিস তো নিয়ে যাননি।

লোক দিয়ে টাকা ওর কাছে কাল সকালেই পাঠিয়ে দিন। ও লোকটার মুখ দেখতে চাই না আমরা।

আহা! দোষটা কী বেচারির? ঘটনা তো একটা দুর্ঘটনা।

লোকটার চেহারাটাই আমার পছন্দ হয়নি।

মলি বলল।

আপনি তো আর বিয়ে করছেন না তাকে।

বাজে কথা বললে রেগে যাব।

রাগলে আপনাকে খুব সুন্দর দেখি আমি।

তারপরই বললাম, এবার আপনাদের দুজনের কাছেই আমার একটা ভিক্ষা আছে।

শেলি বলল, কী? গান? গান আর গাইতে পারব না। তিনঘণ্টা রিহার্সাল দিয়েছি।

না গান নয়। বলছি।

তাড়াতাড়ি বলুন। আমি গিয়ে চান করব।

আমিও। মলি বলল।

চান করে, চেঞ্জ করে বাগানে এসে বসব।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, আচ্ছা, মুনলাইট পিকনিক করলে কেমন হয়?

খুবই ভাল হয়। আমি ওদের বলে দিচ্ছি।

আপনারা চান করতে করতে বাগানে টেবল লাগিয়ে টেবল ক্লথ পেতে দেবে।

কোনও আলো থাকলে চলবে না কিন্তু।

না, কোনও আলো থাকবে না, নট ইভিন ক্যান্ডল লাইট।

ফাইন। আপনিও চান করে আসুন।

কেন? আমার গা দিয়ে কি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে?

শেলি হেসে বলল, পুরুষের গায়ের গন্ধ সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল নই। তবে আপনার গায়ে বেশ পুরুষালি গন্ধ। আরও কি একটা গন্ধ যেন পাই।

খসস্ আতরের গন্ধ। গরমে আমি খসস্ ব্যবহার করি, শীতে অম্বর।

বাঃ আতর কখনও ব্যবহার করিনি। নিয়ে যাবেন কাল? দোকানে?

হ্যাঁ। কাল সকালে এগারোটা নাগাদ নিয়ে যাব বড়া মসজিদের কাছে মুনাব্বর আলির দোকান আছে।

যাই হোক আপনিও চানটা করে নিন। আজ রাতে আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না। এত বড় বাড়িতে আমাদের ভয় করে।

শেলি বলল।

যথা আজ্ঞা। এবারে আমার ভিক্ষার কথাটা কি শুনবেন একবার?

বলুন।

ঘোতনবাবুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনার বড়দাদুকে আমিই ফোন করেছিলাম, আমার একটা উপকার করার জন্যে আপনাদের একবার বড়দাদুকে ফোন করতে হবে।

কী ব্যাপার সেটা আগে শুনি।

আপনারা বোকা কেউই নন। সুব্রতদা আর মিনুদি দুজনকেই যে দুজনে ভীষণ পছন্দ করেন তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন।

সে কি আজ থেকে? কলকাতাতে তো আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে ওঁদের বিয়ে হচ্ছে। আইডিয়াল ম্যাচ সব দিক দিয়ে, চেহারা, গান, রুচি, মানসিকতা। কিন্তু এতদিনও যে বিয়েটা হয়নি দেখে আমরাও অবাক হচ্ছি। শেলির সঙ্গে আমি আলোচনাও করেছি এ নিয়ে।

তবে তো মিটেই গেল। বিয়েটা হচ্ছে না কাকার জন্যে।

কেন?

সগোত্র। একই পদবি দুজনেই সামন্ত সে জন্যে।

সে কি? আজকালকার দিনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বিয়ে হচ্ছে।

কাকা অনড়। এদিকে, সুব্রতদার কথা বলতে পারব না কিন্তু মিনুদির অবস্থা শোচনীয়। চোখের সামনে তার কষ্ট আমি দেখতে পারি না প্রতিদিন। আপনারা এলেন বলে কতদিন পরে যে মিনুদির মুখে হাসি দেখলাম, গান শুনলাম, উচ্ছল দেখলাম মিনুদিকে, তা বলার নয়। অবশ্য একটা বাড়তি কারণ সুব্রতদার সঙ্গে পরপর কদিন দেখা হওয়াও।

তারপর বললাম, শুনেছি সুব্রতদার বাবাও নাকি তাঁকে বিয়ে করার জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন। স্ত্রী-হীন বাড়িতে বৌমা আনতে চাওয়া তো দোষের নয়। সুব্রতদার মতো পাত্রর তো কন্যার অভাব হওয়ারও কথা নয়।

সব তো বুঝলাম। এখন আমাদের কী করতে হবে বলুন?

ওরা দুজনেই প্রায় একই সঙ্গে বলল।

আমার কাকা মাত্র একজনকে জানেন, তিনি হচ্ছেন আপনাদের বড়দাদু। তিনি যদি এ ব্যাপারে কাকাকে বলেন তবে কাকা মনে হয় রাজি হয়ে যাবেন। রায়সাহেবই কাকার ফিলসফার, গাইড, সব কিছু। উনি যদি বলেন আজকালকার যুগে এটা অন্যায়, এটা তার মেয়ের উপর অত্যাচার, তাছাড়া ছেলে যখন সবদিক দিয়ে বরণীয়...

বুঝলাম। তা আজই কি ফোন করব?

না, না। আজ করলে কম্‌প্লিকেশন হবে।

তাহলে বড়দাদু শনিবার আমাদের ফাংশন দেখতে এলেই কী বলব? সেখানে আপনার কাকা, মানে মিনুদির বাবাও তো থাকবেন।

না, না। তাহলেও কেলো হবে। কাকা বুঝতে পারবেন ও আমারই চক্রান্ত।

তবে?

ঠিক আছে। ফোনটা করবেন রবিবার সকালে।

তাড়াহুড়োতে হবে না। আমরা তো রাঁচি চলে যাব রবিবার সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই। তারপর সেখান থেকে রাতে কলকাতা।

তাহলে?

আমি বলছি বড়দাদুকে শনিবার সকালে ফোন করব। হাইকোর্টও বন্ধ আছে। আসবার আগেই জেনে গেলে উনি কায়দামতো আপনার কাকাবাবুকে মত ঝরাবেন। বড়দাদুর পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।

নাম্বার জানেন তো?

আরে নাম্বার তো মিশিরজি অপারেটর লাগিয়ে দেবেন। আমি তাহলে শনিবার ফোনটা এসে গেলেই তারপরই এখানে আসব। শনিবার তো আমার অনেকেই কাজ। স্টেজ সাজাতে হবে, লাইট, মাইক।

তা ঠিক।

তবে এই কথা রইল। আমার কালাপাহাড় কাকাবাবুর হাত থেকে মিনুদিকে বাঁচান।

কাকা মিনুদির সঙ্গে একটা কথাও বলেন না।

তাই?

হ্যাঁ।

Man proposes God disposes.

সব কেঁচে গেল। আজ শুক্রবার। আজ সকালেই সুব্রতদার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। অল্প জ্বর এবং বুকে একটু চাপ বোধ করেছিলেন, তবে ডাক্তারের নির্দেশেই সুব্রতদা সেদিন তাড়াতাড়ি চলে গেছিলেন।

কোনওরকম নেশা ছিল না। বয়স মাত্র পঁয়ষট্টি। আমার কাকা মুঠো মুঠো কালা-পিলা জর্দা দিয়ে দিনে গোটা কুড়ি পান খান। রায়সাহেব নিয়মিত প্রতি রাতে তার পাঁচটি হুইস্কি খান চেম্বার করতে করতে—জুনিয়রদেরও দেন, মক্কেলদেরও দেন। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের জুবিলি স্টোর থেকে স্কচের পেটি আসে। ছুটির দিনে দুপুরে ভদকাও খান দু-তিনটে। বয়স প্রায় সত্তর হল। তার উপরে হাবানা সিগার খান গোটা চারেক দিনে। দিব্যি আছেন।

সংসারে কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের দেখে মনে হয় এঁরা কোনওদিনও মরবেন না। মরতে হয় অন্য মানুষে মরবে। তাঁরা আনন্দ করে, হইহই করে, দশজনের উপকার করে, হাজারজন গরিবকে দেখে, দশ হাজার জন মানুষকে ভালবেসে অনন্তকাল বাঁচবেন। সুব্রতদার বাবাকে দেখে আমর তেমনই মনে হয়েছিল। সেদিন মলি, শেলি, মিনুদি, সুব্রতদা সকলের সঙ্গে গানও গাইলেন, 'পুরানো সেই দিনের কথা সেই কী ভোলা যায়'। একটি নিধুবাবুর টপ্পা শোনালেন 'মরমে মরম যাতনা ভালবাসার অযতনে'।

সেই মানুষই হঠাৎ চলে গেলেন।

অবশ্য চলেই যদি যেতে হয় তবে হঠাৎ যাওয়াই ভাল। আসতে বড় দীর্ঘদিন সময় লাগে এই পৃথিবীতে।

যাওয়ার প্রক্রিয়া যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই বোধহয় মঙ্গল, সে যায় তার পক্ষে। যাদের রেখে যান তাদের প্রস্তুতির সময় থাকে না, এইটেই দুঃখের।

সুব্রতদার বাবার এই হঠাৎ মৃত্যুতে বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান বাতিল করা হল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছাতে। তাছাড়া পুরুষকণ্ঠ বলতে তো সুব্রতদাই একা ছিলেন।

আমরা সকলেই গেছিলাম কোডারমাতে খবর পেয়ে। মিনুদিকে দেখে সুব্রতদা আবেগ সামলাতে পারেননি। কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, বাবা অনেক দুঃখ নিয়ে গেলেন মিনু।

আমি শ্মশানেও গেছিলাম। কাজ এগারোদিন পর। ওরা তো ফিরে যাবে। আমি যাব। মিনুদিকেও নিয়ে যাব—প্রয়োজনে কাকাকে অমান্য করে।

মলিদের আর কোথাওই বিশেষ যাওয়া হল না। পিকনিক টিকনিক করারও মুড ছিল না। বাগানেই সকাল বিকেল রাত কাটাত ওরা। আমি ওদের ছাড়োয়া ড্যাম, হারহাত বাংলো, যার নীচ দিয়ে হারহাত নদী বয়ে যাচ্ছে—এসব দেখিয়ে এনেছিলাম। নিয়ে গেছিলাম বগোদরের পথে টাটিঝারিয়া আর অন্যদিকে টুটিলাওয়া ও সীমারিয়া। মলি বলছিল, 'ঝরাসর' নামের একটি বই পড়েছিল ছেলেবেলায়, বুদ্ধদেব গুহর লেখা, তার উৎসর্গটা ছিল এইরকম :

'টি টি পাখি গেরুয়া মাটি, কুসুমডার নিমগাছটি, টুটিলাওয়ার চাঁদ, টাটিঝারিয়ার চা এবং হাজারিবাগের গোপাল সেনকে।'

ওদের গোপাল সেনের বাড়ি (ভাল নাম মিহির সেন) গয়ারোডের 'পূর্বাচল'ও দেখিয়ে এনেছিলাম। উনি নেই। বাড়ির আগের শ্রী আর নেই। স্থানীয় মানুষেরা বলেন। লেখক বুদ্ধদেব গুহ নাকি অনেক বছর ধরে প্রতি বছর তাঁর এই বন্ধুর বাড়িতে আসতেন যৌবনে। তাঁর অনেক লেখাতেই এই বাড়িটির উল্লেখ আছে।

মলি, শেলি, মালিকে বলে, 'পূর্বাচল' বাড়ির ভিতরের বাগানে ঢুকে দেখল। মলি ওঁর লেখাতে পড়েছে এ বাড়িতে গোপালবাবু জাপান থেকে ঘুরে এসে একটি জ্যাপানিজ গার্ডেন করেছিলেন।

বুদ্ধদেব গুহর বই আমি বিশেষ পড়িনি তবে 'ঋভু' আর 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে' পড়েছি। অটোবায়োগ্র্যাফিকাল লেখা। হাইলি ইন্টাররেস্টিং। 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে' কথাটা সত্যি নয়। একজন লেখক, গায়ক, চিত্রী বা যে কোনও উল্লেখযোগ্য মানুষকে জানতে তাঁর জীবনী পড়াটা অবশ্যই দরকার। তবে সেই জীবনী মিথ্যাচার যদি না হয়। জীবনী লিখতে বসেও যেসব তথাকথিত বড় মানুষে ভণ্ডামি করে, মিথ্যার বেসাতি করেন, তাদের বড়মানুষ বলে মানতে রাজি নই আমি। তাঁরা বাফুনস।

দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে গেল। আজ শনিবার। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ সকাল নটাতে বড়দাদু ফোন করবেন কাকাকে। আমি আমার চেম্বারে চোরের মতো প্যারালাল রিসিভার তুলে বসে আছি। সাহেব মানুষ। কাঁটায় কাঁটায় নটাতে ফোনটা এল। কাকা একটি রেপ কেস-এর আসামীকে নিয়ে বসেছিলেন। লোকটাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসাদার ফাঁসিয়েছে, পুলিশকে পয়সা খাইয়ে, মিথ্যা কেস-এ।

ফোনটা তুলতেই, রায়সাহেব বললেন, কে? সামন্ত?

হ্যাঁ। স্যার। আপনি? এই সকাল বেলায়?

গুড মর্নিং সামন্ত। ভাল আছ তো?

কাকা রায়সাহেবের এই অনভ্যস্ত আমড়াগাছিতে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে গেলেন।

রায়সাহেব বললেন, সামন্ত আমি বামুনের ছেলে। তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাইব। আজ লক্ষ্মীবার। না কোরো না। কেমন?

কী যে বলেন স্যার? আপনাকে আমি ভিক্ষা দেব?

হ্যাঁ সামন্ত। তাই?

বলুন স্যার।

তোমার মেয়ে মিনু .....

হ্যাঁ স্যার মিনু।

ওকে আমার চাই।

এমনভাবে রায়সাহেব কথাটা বললেন, সম্ভবত ইচ্ছে করেই কাকাকে আরও ঘাবড়ে দেওয়ার জন্যে যেন নিজের জন্যেই মিনুদিকে চান।

কাকা চুপ করে রইলেন।

কী হল ভায়া, চুপ করে রইলে যে।

না স্যার, ঠিক...

ওর আমি বিয়ে দেব। কোডারমার সুব্রত সামন্তর সঙ্গে।

তারপর বললেন, তুমি কি জানো যে কোডারমার বানোয়ারীলাল উকিল আমার কাছে এসেছেন তোমার বিরুদ্ধে কেস করার জন্যে? তুমি কি জানো যে তোমারই হৃদয়হীনতাতে সুব্রতর বাবা পরশুদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন? উ আর আ মার্ডারার।

কাকা চুপ করে রইলেন।

রায়সাহেব বললেন, ছিঃ ছিঃ সামন্ত। এ যুগে এমন কথা কেউ শুনেছে? জাত-পাত গোত্র-টোত্র বলে আজকাল কিছু নাকি? পুরো পৃথিবীটাই তো একটা গ্রাম হয়ে গেছে। ইয়েস। আ ভিলেজ। আর সেই যুগে বাস করে, তুমি আমার জুনিয়র হয়ে এত বড় একটা অন্যায়কে সাপোর্ট করে আসছ গত পাঁচ বছর হল।

আপনাকে কে বলেছে এসব স্যার?

তুমি যা ভাবছ তা নয়। তোমার ভাইপো রন্টু বলেনি। সে তোমাকে খুবই মান্য করে। তোমার বিরুদ্ধে সে মরে গেলেও একটি কথাও বলবে না। বললে তো দুবছর আগেই বলতে পারত। বলেছেন আমার নাতনিরা। তারা তো সুব্রত আর মিনুকে বহুদিন হল চেনে। ওরা যখন সুব্রতর বাড়ি গেসলো তখন সুব্রতর বাবাই ওদের আলাদা করে ডেকে দুঃখের কথাটা জানিয়েছিলেন। তাই তো আমার নাতনিরা বার বার বলছে যে এই কারণেই সুব্রতর বাবার এমন হঠাৎ মৃত্যু হল।

—স্যার.....

স্যার টার নয়। তুমি সোমবারে আমার সঙ্গে রাঁচিতে এসে দেখা করবে। আমি পাঁজি আনিয়ে রাখব। বাবার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না এসব আমি মানি না। আমি ওদের একটা ভাল দিন দেখে সামনের মাসেই ব্রাহ্মমতে বিয়ে দেব। আজকাল মাসতুতো পিসতুতো বোনকে বিয়ে করছে মানুষে। সত্যজিৎ

রায়ই তো তাঁর মাসতুতো দিদিকে বিয়ে করেছিলেন। তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক, আমাদের উভয়ের মিলিত জীবন ঈশ্বরের হোক এর চেয়ে কারেক্ট অ্যাপ্রোচ ম্যান অ্যান্ড উওম্যানের মিলনে আর কী হতে পারে! আমি নিজে ব্রাহ্ম। আমার মেয়ের বিয়ে ব্রাহ্মমতেই হবে। তুমি কোনও ট্যা-ফোঁ করবে না।

স্যার।

আর শোনো। আমার স্ত্রী তোমার মেয়ে মিনুকে খুবই পছন্দ করত। তুমি জানো যে আমার কোনও মেয়ে নেই। মিনুর বিয়ের সব খরচ আমি দেব। আমার হাজারিবাগের বাড়িতে গ্র্যান্ড স্কেল-এ বিয়ে দেব। এখন থেকে নেমন্তন্নের লিস্টি তৈরি করো। হাজারিবাগের সব ভাল হোটেলে আর ফরেস্ট বাংলো বুক করে দিতে হবে। আমার আত্মীয়রাও সব আসবেন। আমার ভাই, ভ্রাতৃবধূরা, নাতি-নাতনিরা। এই দুই নাতনিও আসবে যদি বাইরে ইতিমধ্যে পালিয়ে না যায়।

স্যার।

আরেকটা কথা শুনে রাখো।

কী স্যার।

তোমার ভাইপো রন্টুকে আমার নাতনিদের খব পছন্দ হয়েছে। অনেক করেছে ছেলে ওদের জন্যে।

স্যার।

তাহলে আমি ছাড়ছি। গড ব্লেস উ।

রবিবার সকলে আমি দ্যা রিট্রিট-এ ওদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেলাম।

রসিকতা টসিকতা সবই হচ্ছিল কিন্তু কোথায় যেন এক অদৃশ্য মেঘ ছিল। চাপা কান্নার মতো। রাঁচি থেকে উর্দিপরা একজন স্মার্ট শিক্ষিত বেয়ারা এবং উর্দিপরা ড্রাইভার এসেছিল রায়সাহেবের আকাশি নীল মার্সিডিজ নিয়ে নাতনিদের নিয়ে যেতে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হল। নকুলরা ওদের স্যুটকেস ও টুকিটাকি জিনিস নামিয়ে আনল ঘর থেকে। সীমারিয়ার হাট থেকে রুপোর গয়না কিনেছিল। আর বাঁশের কাজকরা টুপি। গাড়িতে দু বোতল মিনারেল ওয়াটার আর এক ফ্লাস্ক চা তুলে দিল নকুল।

নকুলদের প্রত্যেককে ওরা একটা করে একশ টাকার নোট বকশিস দিল। সামসেরকেও দিয়েছিল গতকাল।

আমি বললাম, আমি কি কিছুই পাব না?

মলি, আমার রানি মুখার্জি, পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার চোখে। মুখে কিছু বলল না।

শেলি বলল, আবারও আসব। তোলা রইল।

আমি জানলা দিয়ে হাতটা ঢুকিয়ে দিলাম হ্যান্ডশেক করার জন্যে। মলি হাতটা

নিয়ে মৃদু চাপ দিল। কী নরম আর গরম হাত। ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। আর ইচ্ছে করছিল ওর হাতটা ঠোঁটে লাগিয়ে চুমু খাই একটা। কিন্তু গাড়ির চারপাশে এত লোক। সঙ্কোচ হল, ভয়ও হল একটু।

শেলিও হ্যান্ডশেক করল। বলল, বাই-ই-ই।

আমি বললাম, ভাল থাকবেন দুজনেই। খুব ভাল।

মলি কিছু বলল না, আমার মুখে নয়, ওর দৃষ্টি ছড়ানো ছিল গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেদ করে, ড্রাইভে। হয়তো আমার মুখে ও চাইতে চাইছিল না।

গাড়িতে গিয়ার দিল ড্রাইভার। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল। এগিয়ে গেল গাড়িটা। নিজামুদ্দিন সেলাম করল। অন্য সকলে নমস্কার। আমি হাত তুললাম।

নকুল বকশিস পেয়েই দৌড়ে গেটের কাছে গিয়ে গেট খুলে দাঁড়িয়েছিল। আবার করজোড়ে নমস্কার করল ও।

মিনুদি খুব খুশি। আশ্চর্য! কাকাও ব্যাপারটাকে অবশেষে স্পোর্টিংলি গ্রহণ করেছেন। স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে বাড়িতে। মিনুদির সঙ্গে কাকা কথা বলছেন। সোমবার রাঁচি থেকে ফিরে আসার পরে কাকাকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। রায়সাহেব যা প্ল্যান করেছেন বিয়ের তাতে কাকা রীতিমতো ঘাবড়ে গেছেন।

মিনুদি একবার বলেছিল, আমাদের যেমন অবস্থা বিয়ে তেমনভাবেই হওয়া উচিত। কারো দয়া আমাদের নেওয়া উচিত নয়।

সেদিন খেতে বসে, কাকা বলছিলেন, আত্মসম্মান তোরও আমার চেয়ে কম নেই মিনু। মানুষটাকে আমি চিনি। বাধা দিতে গিয়ে সুব্রতর বাবার মৃত্যু ঘটিয়েছি, আরেকটা মৃত্যুর কারণ হতে চাই না। এতে দয়ার প্রশ্ন নেই। একজন মস্ত বড় মাপের মানুষের আনন্দর প্রশ্ন আছে। তিনি যদি তোকে আর রন্টুকে তার নিজের সন্তান বলে মনে করে আনন্দ পান তবে আমি এত দীন যে তাঁর সে আনন্দে বাধা দেব। রন্টুকে উনি রাঁচি পাঠিয়ে দিতে বলছেন। হাইকোর্টে ওকে Groom করবেন। রায়সাহেবের জুনিয়র হিসেবে প্র্যাকটিস করবে রন্টু এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি ওর জীবনে আর কী আছে?

আমি বলেছিলাম, আমি যাব না। তোমার কষ্ট হবে গেলে। তোমারও তো বয়স হচ্ছে।

আরে ছগনলাল, গিরিধারী ওরা তো আছে। তুই আসার আগে তো ওরাই চালিয়ে নিচ্ছিল। তাছাড়া মিনুর বিয়ে হয়ে গেলে তুইও রায়সাহেবের আশ্রয় পেলে আমার কাজ করার প্রয়োজনই বা কী? কাজ ছেড়ে না দিলেও কমিয়ে দেব।

সবাই কি টাকার জন্যে কাজ করে কাকা? অনেকেই করে না। তার মধ্যে তুমিও একজন। কাজ, তুমি কখনওই ছেড়ো না। কাজই তোমার জীবন, তোমার আনন্দ, তোমার একমাত্র সঙ্গী।

কাকা খাওয়া থামিয়ে চুপ করে রইলেন।

আগে মিনুদির বিয়েটা হোক। গ্রীষ্মে বিয়ে। এখনও দেরি আছে মাস দুই। তারপর আমার রাঁচি যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে। রায়সাহেব ডাকলেই নাচাতে নাচাতে যেতে হবে তার কোনও মানে নেই। আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত আমি এখনও নিইনি।

আবার সেই জীবনে ফিরে গেছি। সেই মক্কেল, সেই কোর্ট, সেই 'ইওর অনার', সেই ইন্ডিয়ান ইংলিশ অথবা হিন্দিতে সওয়াল। সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজে স্পোকেন ইংলিশটাতে একটু জেল্লা লেগেছিল, এখানে ইংরেজদের মতো ইংরেজি বললে জজসাহেবরা বলেন 'আপকি আংরেজি সব সমঝমে নেহি আতা'। মক্কেলদের কেস জেতা নিয়ে কথা। মারো গোলি ইংরেজিতে। যেমন করে বললে কেস জিততে সুবিধে হয় তেমন করেই বলি।

যথারীতি সাইকেল ঠেঙিয়ে কাছারিতে যাই, কেরিয়ারে ফাইল নিয়ে। বিকেলে বাড়ি ফিরে চা জলখাবার খেয়ে চেম্বারে বসি। মিনুদি নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। সুব্রতদা প্রায় রোজই একাধিকবার ফোন করেন। কাকা বলেছেন, বিয়ের আগে এ বাড়িতে ওঁর না আসাই ভাল।

মিনুদি রবিবার সকালে ওদের বিদায় নিতে যায়নি তবে শনিবার রাতে গেছিল। ওদের ধন্যবাদ দিকে গেছিল। কেঁদেছিল খুব। সুব্রতদার বাবার মৃত্যুর জন্যে এবং তার ভাগ্য যে নতুন মোড় নিল সে জন্যেও।

ওরা বলেছিল, তোমার ভাইকে ধন্যবাদ দাও। রন্টু না বললে আমরা কি এত সব জানতাম।

দেখতে দেখতে একমাস ঘুরে এল। তিনদিন পরেই পূর্ণিমা। হলুদ থালার মতো চাঁদ উঠেছে আকাশে।

আজ দু একজন মক্কেল এসেছিল আমার কাছে। তাদের বিদায় করে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মঙ্গুলালের দোকানে গিয়ে কালি-পিলি জর্দা দিয়ে দু-খিলি পান খেয়ে এবং আরও দু-খিলি সঙ্গে নিয়ে নির্জন পথে সাইকেল চালিয়ে The Retreat-এ গেলাম।

নকুল বলল, দাদাবাবু রাতে এলেন?

এমনি। বাগানে একটু বসব।

তারপর সাইকেলটা নকুলের জিম্মাতে দিয়ে পেছনে গিয়ে দোলনাতে বসে একটা বিহার পুলিশ পকেট থেকে বের করে ধরালাম।

নকুল বলল, চা কফি কিছু খাবেন দাদাবাবু?

বললাম না। কিচ্ছু না। তুমি যাও। আমি একটু একা থাকি। খুব মাথা ধরেছে।

ওরা কলকাতা থেকে ফোন করেছিল পৌঁছেই। মিনুদির সঙ্গে কথা বলল, তারপর

আমার সঙ্গেও। কেউ জানে, মিনুদিও নয়, একদিন মলি সকালে মিনুদি যখন স্কুলে তখন ফোন করেছিল আমাকে। বলেছিল, একটা কম্পিউটার কিনে নিন না, ইন্টারনেটে চ্যাট করব। খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

বলেছিলাম, আমি গরিব লোক, কম্পিউটার পাব কোত্থেকে। মনে মনে কথা বলাই ভাল। আমি আমি, আপনার আপনারা। ওই একটি দিনের স্মৃতি ভাঙিয়েই আমার বছরছর কেটে যাবে। আমি বামন। চাঁদ আমার কাছে চাঁদই।

তারপর বললাম, আমার গানটা যেন কারোকে দিয়ে দেওয়া না হয়।

মলি বলল, না। দেব না।

তারপর বলল, শেলি অনেক ছবি তুলেছিল। দারুণ এসেছে। পাঠাব আপনাদের।

আপনার একার একটা ছবি পাঠাবেন আমাকে। ভুলবেন না যেন। ওটা আলাদা খামে পাঠাবেন।

আমি বললাম।

কী করা হবে?

আমার ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেব। রাতে দরজা বন্ধ করে দেখব আমার রানি মুখার্জিকে।

আপনারও একটা ছবি, শাহরুখ খানের আমি রেখে দেব।

কী করা হবে?

আপনি যা করবেন, তাই।

ফোন ছেড়ে দিয়ে ভাবছিলাম, আমরা দুজনেই দারুণ ছেলেমানুষ আছি। তাই তো! যতদিন ছেলেমানুষ থাকা যায়।

হাওয়া দিচ্ছে ঝুরুঝুরু। মহুয়া আর চাঁপার গন্ধ এখনও মরেনি। তার ওপরে গরম পড়াতে হাসনুহানা আর রজনীগন্ধার গন্ধও জোর হয়েছে। আরও কত জানা ও অজানা ফুলের গন্ধে সমস্ত পরিবেশ ঝিমঝিম করছে।

হঠাৎ মনে হল মলি যেন আমার পাশে বসে আছে।

মনে পড়ল, ও বলেছিল, 'ঠিক যেন স্বপ্নের মতো'।

সত্যিই তাই।

আমারও মনে হচ্ছিল, সাতটা দিন রাত চলে গেল স্বপ্নের মতো।

পরিক্রমা

মাঝে মাঝে এরকম হয়।

আমার হয়, সকলের হয় কি না জানি না।

শেষ রাতে পরম এক সুখানুভূতি, স্বপ্নের মধ্যে চাঁপাফুলের গন্ধ, ছেলেবেলায় রাতের রেলগাড়ির জানালার পাশে বসে দেখা গ্যাসলাইটে নীলাভ লাল কাঁকরের প্ল্যাটফর্ম, "চায়ে গরম," "চায়ে গরম" ডাক, সোঁদা গন্ধ মাটির ভাঁড়ে গোরখপুরী চা, এক বালিকা ভিখারিনির চিকন গলার হৃদয়-বিদ্ধ-করা সুরেলা গান এইরকমই আরও কত কী।

কাল শেষ রাতে হঠাৎই রুণাকে মনে পড়ল। মনে পড়ল যাকে, তার মুখটি ভেসে উঠল চোখের সামনে। দু'দিকে দু' বিনুনী করেছে। আগুন পারা রঙ, কোকিলের মত কালো চুল আর ছায়াচ্ছন্ন চোখ দুটি।

ভাল লাগায় মরে গেলাম।

কতদিন দেখি না রুণাকে। রুণা আমার কলেজের এক বন্ধুর স্ত্রী। বন্ধুর নাম ঋতব্রত চ্যাটার্জি। বড়লোকের একমাত্র সন্তান। বেশ স্পয়েল্ট। ছটফটে স্বভাবের। ফর্সা। খেলাধুলোতে ভাল ছিল। তবে বুদ্ধি একটু কম ছিল। সেই জন্যেই বোধহয় মানুষ ভাল ছিল। গরিব কিন্তু অভিজাত ঘর থেকে তার বড়লোক মা-বাবা রুণাকে সংগ্রহ করেছিলেন। 'সংগ্রহ' করেছিলেন বলাই ভাল। মানুষ যেমন খুঁজে খুঁজে গরিবের বাড়ি থেকে অনেক দাম দিয়ে পেডিগ্রি কুকুর সংগ্রহ করেন এও তেমনই।

বড় ভাল গান গাইত রুণা।

ওরা বার্নপুরে থাকত। কারণ বার্নপুরেই কাজ করত। ও ইঞ্জিনিয়ার ছিল। তবে ঋত ছোট মাপের। ওদের বিয়ের পর একবার গেছিলাম বার্নপুরে। না, ওদের বাড়িতে নয়। গেছিলাম অফিসের কাজে। উঠেছিলাম বিলিমোরিয়াদের বার্নপুর হোটেলে। হোটেল থেকে ঋতর বাড়ি ছিল আধ মাইলটাক দূরে। হোটেলের কাছেই আমার আরেক বন্ধু অমিতাভর বাংলো ছিল। The Cresent-এ সম্ভবত ৬ নম্বর বাংলো। এখন ভুলে গেছি। অমিতাভর স্ত্রী ঋতাও খুব সুন্দরী ছিল। খুবই সুন্দরী। তার মধ্যে একটা আহ্লাদী আহ্লাদী ভাবছিল যা আমার খুব ভাল লাগত। ভাল ছবি আঁকত। অমিতাভর বাবা ইস্কোর জমিনদারী ম্যানেজার ছিলেন। খুবই বড় অফিসার। থাকতেন বার্নপুরে নয়, জি টি রোডের ওপরের এভিলীন লজ'-এ।

কলেজে পড়ার সময়ে অমিতাভও ওই বাড়িতেই থাকত বাবার সঙ্গে। তখন গেছি সে বাড়িতে।

ঋতা আর রুণা দুজনেই পরমাসুন্দরী ছিল কিন্তু দু'রকম সুন্দরী ছিল। রুণার সৌন্দর্য ছিল অন্য কারো মতোই নয়। একেবারেই নিজস্ব। শীতের ভোরের কুয়াশার মতো, হেমন্তর নদীর গন্ধর মতো, চিলের কান্নার মতো তার মধ্যে এক রহস্য ছিল যে-রহস্য ভেদ করতে খুব ইচ্ছে করত আমার। এখনও করে। সে রহস্যময়ী ছিল বলেই অন্য অনেক সুন্দরীদেরকে অবহেলায় হারিয়ে দিতে পারত। আমি যেহেতু ব্যাচেলর ছিলাম এবং ভাল অথবা বোকা বা অনভিজ্ঞ, নারীমাত্রই আমার কাছে রহস্যময়ী ছিল। আমি ব্যাচেলর ছিলাম বলেই হয়তো ঋত আমাকে একটু দূরে দূরে রাখত। মেয়েদের ভাললাগার মতো আমার মধ্যে অনেক কিছুই ছিল যে, সে কথা ঋত জানত বলেই হয়তো ভয় পেত। আমি ওর এই ভয়-পাওয়াটাকে উপভোগ করতাম।

ঋতা আর অমিতাভ কিন্তু আমার সঙ্গে খোলামেলা বন্ধুর মতোই মিশত। আমাকে দূরে রাখার কোনও চেষ্টা বা অপচেষ্টা করত না। আমি ঋতা আর অমিতাভর খুব ভাল বন্ধু ছিলাম। ওরাও আমার।

এসব বহুদিন আগের কথা। নানা কোলিয়ারিতে আমাকে যেতে হতো কাজে। পশ্চিমবঙ্গের মডার্ন সাতগ্রাম, রতিবাটি, নর্থব্রুক। ঝরিয়া ও কাতরাস-এর অর্জুন আগরওয়ালা আর প্রভুদয়াল আগরওয়ালার নানা কোলিয়ারিতে। সে সবই ইনক্লাইন মাইন ছিল। আর যখনই যেতাম পশ্চিমবঙ্গের কোলিয়ারিতে, আসানসোলেও ঘুরে আসতাম। ধাদকার রেকিট অ্যান্ড কোলম্যান-এর দিলীপ রায়চৌধুরী ডিসেরগড় ক্লাবে নিয়ে যেতেন বিয়ার খাওয়াতে।

রুণা আর ঋতব্রত পরে কাতরাস-এ চলে গেল। বদি রায়ের কোলিয়ারিগুলোতে মেইনটেনান্স ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। ঋত সেখানেই থাকত।

বদিবাবু খুবই শৌখিন মানুষ ছিলেন। মাছ ধরা, শিকার করা, ফোটোগ্রাফি, রান্না, নানা শখ ছিল তাঁর। নানা বিলিতি মদেরও কন্যোসার ছিলেন। বয়সে অনেক ছোট হলেও আমাকে বন্ধুর মতোই দেখতেন। অনেকই স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। কোলিয়ারি ন্যাশানালাইজড হয়ে যাবার পরে হাজারিবাগে থাকতেন। সে-বাড়িতেও গেছি আমি। তখনও রুণা ও ঋতর সঙ্গে দেখা হতো কিন্তু নিজেকে চোর চোর মনে হতো। মনে পাপ ছিল বলেই।

ঋতাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম। কিন্তু রুণাকে পাগলের মতো ভালবাসতাম। সেই ভালবাসার মধ্যে প্রেম অথবা কাম অথবা মোহ এই তিনের মধ্যে কোন্‌টা প্রবল ছিল বলতে পারব না। ভালবাসা একটা জেনারেল টার্ম, তাতে বিশেষ কিছুই বোঝায় না। কার ভালবাসা যে কী রকম, তা বোঝে কম মানুষেই। আমি তো

বুঝতামই না। কিন্তু ঋত আমার এই মনোভাব কিছুটা আন্দাজ করত বলেই বন্ধু হয়েও আমার সঙ্গে সে মাঝে মাঝে শত্রুর মতো আচরণ করত। অপমানজনক ব্যবহারও করত। আমি এসব ব্যাপারে একটু ম্যাদামারাও ছিলাম। ড্যাশিং-পুশিং টাইপ ছিলাম না।

আমার অভিজ্ঞ বন্ধুরা বলত মেয়েরা ন্যাকা-বোকা কবিতা-লেখা ছেলেদের পছন্দ করে না। এনক আর আর্ডেন-এর কথা বলত। বলত Dreamer না হয়ে Doer। কিন্তু কী করে Doer হওয়া যায় তা আমি জানতাম না।

ঋতব্রত আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক রুণার প্রতি অন্ধ বাছুর-প্রেম আর আকর্ষণে আমি সেসব গায়ে মাখতাম না। জোর করেই সম্পর্ক রাখতাম। ঋত চাক আর নাই চাক।

রুণা উদাসীন ছিল। সে হাসত শুধু। তার মনের ভাব বোঝা অসাধ্য ছিল।

কিছুদিন বাদে ঋত বদিবাবুর চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে নিজেই ব্যবসা শুরু করল অর্ডার সাপ্লায়ারের। অনেক কোলিয়ারির সঙ্গে জানাশোনা ছিল ওর। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। ব্যবসা বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে অল্পদিনের মধ্যে। পরিবারে ব্যবসায়ীর রক্ত ছিল। ওর বাবা গত হওয়াতে অংশীদাররা ব্যবসা হাতিয়ে নিয়েছিল।

সেই সময়েই অনেক সাধারণ পুরুষের মতো সুরা ও নারীতে ঋতব্রতর তুমুল আসক্তি জন্মাল। আর্থিক সাফল্যটা সে হজম করতে পারল না। অমিতাভ ওদের কেয়াতলা রোডের বাড়িতে কলকাতাতে একদিন বলেছিল—He is going down fast with wine and women.

তারপরে একটা সময় ঋত আর রুণা হারিয়েই গেল আমার জীবন থেকে। অমিতাভর কাছেই শুনেছিলাম যে রুণা ঋতকে ছেড়ে কোনও পাহাড়ে চলে গেছে। কোনও আশ্রমে থাকে। ওদের ছেলেমেয়ে ছিল না কোনও।

এত বছর পরে রুণাকেই বা মনে পড়ল কেন শেষ রাতে তা বলতে পারব না কিন্তু বুঝতে পারলাম রুণার প্রতি আমার যে তীব্র আকর্ষণ তার শিকড় অত্যন্ত গভীরে গিয়ে পৌঁছেছিল নইলে আজ তিরিশ বছর পরে তাকে মনে করে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে কেন? রুণার সেই মিটিমিটি হাসির মর্মোদ্ধার করার জন্যে আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতো খেপে উঠব কেন?

আমি আজও বিয়ে করিনি। তবে বিয়ে না করলেও এখন নারীদের ব্যাপারে আর আমি অনভিজ্ঞ নেই। বাছুর-প্রেমের দিন আমার শেষ হয়েছে। এখন আমি নারীর শরীরকেও জানি। জানি বলেই হয়তো রুণার প্রতি আমার পুরানো আকর্ষণটা হঠাৎ তীব্রতা পেয়েছে। এক শেষ রাতের স্বপ্নও যে কোনও প্রৌঢ় মানুষকে এখন দীপিত করতে পারে তা ভাবা যায় না। আমি নিজেই যখন ভেবে উঠতে পারছি না তখন অন্যে ভাবতে পারবে কী করে?

কোলিয়ারি সব ন্যাশানালাইজড হয়ে গেছে। এইসব অঞ্চল এখন ইসিএল আর বিসিসিএল-এর অধীন। নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড-এর সিঙ্গরাউলির ওপেন কাস্ট মাইনে ভারতের বৃহত্তম কয়লা খাদানে একটা ভাল কাজ পেয়েছিলাম কিন্তু আর চাকরি করতে ইচ্ছে করল না। তাছাড়া করলেও রিটায়ারমেন্টের বয়স হয়ে যাবে ক'বছর বাদেই।

আমার মারোয়াড়ি মালিক খুবই ভাল ছিলেন। একসময় ওঁর জন্যে অনেক তো করেছি সোজা পথে ও বাঁকা পথেও। সে কথা তিনি ভুলে যাননি। আমাকে চেক ও ক্যাশে অনেক টাকা দিয়েছিলেন। ক্যাশটা, মানে দু'নম্বর ক্যাশটা চানচানী অ্যান্ড ওড়ার এক শরিকের কাছে রেখেছি। মাসে পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেয়। এক নম্বরের সুদ আর দু'নম্বরের সুদ নিয়ে আমার রীতিমতো বড়লোকের মতো দিন কেটে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কের সুদ তো রোজই কমে যাচ্ছে। এখন দু'নম্বরের সুদই বাঁচাচ্ছে।

যোধপুর পার্কে একটি ছোট ফ্ল্যাট আছে। একটি সবুজ মারুতি এইট হান্ড্রেড। নিজেই চালাই কলকাতাতে থাকলে। তবে কলকাতাতে থাকি কম। এখানে ওখানে যেখানে মন চায় ঘুরে বেড়াই। ঘুরবই বা না কেন? আমি তো বিয়ে করে চিরদিনের মতো ফেঁসে যাইনি। ছেলেমেয়ে নাতিপুতি, স্বখাত সলিলের ঝামেলা নেই। লটবহর, আর্থরাইটিস বা ডায়াবেটিসে ভোগা বিগতযৌবনা স্ত্রী এসব ঝক্কি-ঝামেলা আমার কিছুই নেই। বিবাহিত বন্ধুরা বলে, জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিলি রে তুই। বেশ আছিস!

বেশই ছিলাম। কিন্তু ওই যে! ওই শেষরাতের স্বপ্নে রুণা দেখা দেওয়ার পর থেকে আমার সুখ শান্তি সব গেছে। যদি রুণার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভেবে গাড়োয়াল হিমালয়ের সব তীর্থে ঘুরলাম দেড়মাস ধরে। ভালই হল। রথ দেখা কলা বেচার মতো রুণাকে খুঁজতে গিয়ে বহুত পুণ্য সঞ্চয় হল। কুঞ্জাপুরী, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, আরও কত জায়গা, চন্দ্রবদনী, কেদারবদ্রী সব।

সবই হল কিন্তু রুণার হদিশ পেলাম না।

খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজলে কি পাওয়া যায়। যায় না জানি, তাছাড়া খুঁজব যে, কোনও সূত্রই যে নেই। কিন্তু আমি ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নেওয়া এক অবিবাহিত মানুষ। আমার তো কোনও পিছুটান নেই। মানুষ ঈশ্বরের খোঁজে তীর্থস্থানে ঘোরে, আমি ঘুরছি রুণার খোঁজে। রুণাই আমর ঈশ্বরী, আমার দেবী। প্রধানা দেবী। কে বলতে পারে। একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েও যেতে পারে। আশা এখনও রাখি। আর যদি দেখা নাই পাই তাহলে আবার ফিরে যাব কলকাতাতে। ডেরা তো একটা আছেই। ঘুরে ফিরে একবার করে সেখানে গিয়ে সেঁধোই আবার মন উচাটন হলেই বেরিয়ে পড়ি। একেকবার একেক দিকে।

রুণার গানের গলা ছিল অসাধারণ। সে গান গাইলে আমার সারা শরীর মনে অনুরণন উঠতো। সে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। রুণার গান শোনার আগে বুঝিনি

যে, গানই আমার অ্যাকিলীসেস হিল—অথচ নিজে গান-বাজনা করিনি কখনও। সবাই গাইলে শুনতো কে? গান তো গায়কের একার নয়, সে যে শ্রোতারও। শ্রোতারাই তো গানকে পরিপূর্ণতা দেন। আমি তো তাই-ই বুঝি।

জানি না, আর কোনও দিন রুণার গান শুনতে পাব কি না, তার হাসি দেখতে পাব কি না। তারপর আরও কিছু পাব কি পাব না সে তো ঈশ্বরই জানেন।

গাড়োয়াল হিমালয়ের বিভিন্ন দেবস্থানে ঘুরে ঘুরে একটা জিনিস হৃদয়ঙ্গম করে বড় খারাপ লেগেছে। এই যে এত মানুষ মন্দিরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেওয়ালে মাথা ঠুকছে, কেউই কিন্তু ঈশ্বর খুঁজতে আসেনি। সব ব্যাটারই কিছু না কিছু চাইবার আছে। কেউ অর্থ চাইছে, কেউ যশ চাইছে, কেউ শত্রুর সর্বনাশ চাইছে, কেউ প্রিয় নারীকে চাইছে। কেউ সাংঘাতিক মারণ রোগের আরোগ্য চাইছে—সকলেই বলছে দাও! দাও! দাও!

আরে! দেবতা কি ব্যাঙ্কার, নাকি সে ঝাঁপ খুলেছে শুধু দেওয়ারই জন্যে। ব্যাঙ্কে তাও পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার লাগে লেন-দেন করতে হলে আজকাল। এখানে কোনও আইডেন্টিফিকেশনের দরকার নেই। বড়লোক চাইছে, মধ্যবিত্ত চাইছে, গরিব চাইছে, সাধু চাইছে, চোর ছ্যাঁচোড় ফোর-টোয়েন্টি সবাই চাইছে, বলছে দাও! মা দাও! বাবা দাও! পুজো দিতে গিয়ে কেউই বলে না পৃথিবীর সকলের ভাল হোক, আমার সব আত্মীয়বন্ধুর ভাল হোক—প্রত্যেকে শুধু নিজের নিজের স্বামী বা স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের জন্যে চাইতে এসেছে। একজনকে আবার দেখলাম স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করছে, আরেকজন তার উদ্ধত এবং দুর্বিনীত ভালবেসে বিয়ে করা ছেলের সর্বনাশ চাইছে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অহং। আমি। জগৎ আমি ময়। নানা তীর্থস্থানে ঘুরে আমার এই ধারণাই হয়েছে।

মুসলমানেরাও তাই করে। দরগাতে গিয়ে তাগা বাঁধে, মনস্কামনা পূরণ হবে এই প্রার্থনায়। হিন্দু-মুসলমান সকলেই কত কী মানত করে। নিজের নিজের দেবতার কাছে। পাঁঠা, উট, ষাঁড়। কী কেলো!

আমি দেবস্থানে কিছু চাইতে যাইনি। যদি রুণার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, এই প্রত্যাশাতেই গেছিলাম। হলে ভাল, নইলে হলো না।

ঠিক করেছি দিন পনেরো কলকাতাতে থেকে এবার যাব কুমায়ুঁ হিমালয়ে। অমিতাভ বাজে কথা বলার ছেলে নয়। ও যখন বলেছে যে রুণা পাহাড়েই গেছে, কোনও আশ্রমে, তখন রুণা অবশ্যই তাই গেছে।

আমার পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী কানু সান্যাল গত বছর গরমের সময়ে রাণীক্ষেত গেছিলেন স্ত্রী, পুত্র এবং অবিবাহিত শ্যালিকাকে নিয়ে। ফিরে এসে রাণীক্ষেতের প্রশংসাতে একেবারে পঞ্চমুখ। রাণীক্ষেত এত ভাললাগার অবশ্য আরেকটা কারণ ছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে শালীর সঙ্গে একটু মাখোমাখো ভাব লক্ষ্য করেছি।

শ্যালিকারা বিবাহিত জীবনের মস্ত শত্রু। বৌ-রা যদি সর্বদা একটু চোখে চোখে না রাখেন, তবে ক্ষণভঙ্গুর পুরুষ জাতের প্রতিভূ স্বামী যন্তরটি বেগড়বাঁই করতে বাধ্য। অথচ শালী ছাড়া বিয়ের পারকুইজিট আর তো কিছুমাত্র নেই। ভগবান এই পুরুষ জাতটাকে যে কী দুর্বল করেই গড়েছেন তা চোখের সামনে দু'বেলা দেখে দেখে বিয়ে যে করিনি সে জন্যে নিজেকে নিজেই বাহবা দিই। দিল্লিকা লাড্ডু খেয়ে পস্তানোর চেয়ে না খেয়ে পস্তানো অনেক স্বস্তির।

সান্যাল সাহেব উঠেছিলেন 'ওয়েস্ট ভিউ' নামের এক হোটেলে। বলছিলেন, এখন অবশ্য সে হোটেলের আগের মতো রমরমা নেই। আগে বলতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলছিলেন। বলছিলেন আমার বড়সাহেব গজু ঘোষের কাছে প্রথম গল্প শুনি ওয়েস্ট ভিউ হোটেলের। তখন এক মেমসাহেব মালিক ছিলেন। এখন একজন পাঞ্জাবি।

কুমায়ুঁ হিমালয়ের নৈনিতাল আর রাণীক্ষেতে দিল্লির হাত পৌঁছে গেছে বহুদিন হল। উচ্চকিত, অন্তঃসারশূন্য, ভোগবিলাসী এবং অবশ্যই অত্যন্ত পরিশ্রমী পাঞ্জাবিরা কব্জা করে নিয়েছে এই শহর দু'টোকে।

মেমসাহেবের আমলে কত ভাল ছিল বলতে পারব না কিন্তু এখনও যা আছে তা বলার মতো। আলাদা আলাদা সব কটেজ, কাঠের সিলিং, মাঠের মেঝে, ঘন চিড় পাইনের বনের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো। সারাদিন নির্মেঘ নীল আকাশ, উষ্ণ রোদ, আর নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। ছুটি যদি কোথাওই কাটাতে হয় তবে মানুষের রাণীক্ষেতের ওয়েস্ট ভিউতেই যাওয়া উচিত। টারিফও থ্রি-স্টার হোটেলের মতো, কাঠখোট্টা সান্যাল সাহেবের মতো অ্যাকাউন্ট্যান্টেরও নাকি কবিতা লিখতে ইচ্ছে করত সেখানে।

মনে মনে বললাম তা তো করবেই। ঠাণ্ডা জায়গা, অত নিরিবিলি, সঙ্গে এম. এ. পড়া সুন্দরী সুগন্ধি রঙি-ঢঙি শালী। শালীরা তাদের জীবনে এই সময়টাতে নানা স্বপ্ন দেখে বিবাহিত জীবনের। আর জামাইবাবুদের Crucible করে যত রকম সম্ভব এক্সপেরিমেন্ট করে। আর জামাইবাবু মাত্রই রামছাগলের মতো তাদের ইঁদুর হয়। তারা ইঁদুরকে কেটে ছেঁড়ে যা খুশি করে ল্যাবরেটরির ইঁদুরদেরই মতো। তাদের স্বপ্নে যে পুরুষ থাকে, তার আকাট জামাইবাবুর সঙ্গে সে পুরুষের যে কত তফাত মনে মনে তারই অঙ্ক কষে। বঙ্গভূমে যত জামাইবাবু অথবা 'জাম্বু' যে শালীদের হাতে নীরবে খুন হয়েছে এর উপরে কারো থিসিস লেখা উচিত। লিখলে, যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েরই উচিত তাকে ডক্টরেট দেওয়া। ডক্টরেট কি বিষয়ের উপরে? না, 'জাম্বু'।

মুখে কিছু বলিনি কিন্তু গাড়োয়াল শেষ করে এসে কুমায়ুঁর পথে যাত্রা করলাম। লক্ষ্ণৌটা দেখা হয়নি। আবদুল হালিম শরর সাহেবের লেখা পুরানো লক্ষ্ণৌয়ের বই

পড়েছি বাংলা অনুবাদে। সেই লক্ষ্ণৌ তো নেই কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, পাহাড়ী সান্যাল এবং ধূর্জটিপ্রসাদের বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন পুত্র কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লক্ষ্ণৌ তো দেখতে পাব। ম্যারিস কলেজ, আরও কত কী! পুরনো দিনের ছিঁটেফোঁটা যদি থেকে থাকে তো দু-এক গাছি তওয়ায়েফ-এর সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে যেতে পারে। শের-শায়েরীর লক্ষ্ণৌ, ঠুংরির লক্ষ্ণৌ, আদব-কায়দার, সহবতের লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ জায়গাটা আমার দেখা হয়নি যেমন, দেখা হয়নি ঢাকা জায়গাটা।

সমরেশ বসু একদিন একটি ঘরোয়া আড্ডাতে নাকি বলেছিলেন, ঢাকা জায়গাটা আমার দেখা হয়নি। ঢাকা শহরকে এমন দ্ব্যর্থক করতে আর কারোকে শুনিনি।

যাক গে, ঢাকা জায়গাটা না হয় পরেই দেখা হবে, সে তো আরশিনগরের পাশেই, দূরের লক্ষ্ণৌটা আগে দেখে নিই। তিনদিনে যেটুকু দেখা যায়। এখন তো আর ফিটন এবং ব্রুহাম নেই, ঝুমঝুমি বাজানো চারঘোড়ার টাঙ্গা, তবায়েফ পত্নীও নেই, নেই আতর সুর্মার রমরমা, পানের দোকান চকমকাইয়া—তবু দেখে না হয় বলা যাবে "খাওাহার বাতাতি হ্যায়, ইমারত বুলন্দ থী"।

একেই বলে কো-ইন্সিডেন্স। যখন লক্ষ্ণৌ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে গেটের দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ ঋতব্রতর সঙ্গে দেখা। প্রথমে অবশ্য চিনতে পারিনি। তবে ওর নাকটা দেখে চিনলাম। মাথা ভর্তি সাদা চুল, পরনে গেরুয়া বসন, পায়ে খয়েরি রঙা কেডস। সত্যিই চিনতে পারিনি। চেনবার কথাও নয়। এ আবার কি নতুন ভেক। ওই আমাকে চিনতে পেরে বলল, এক্সকিউজ মি, বাই এনি চান্স, আপনি কি খগেশ রায়?

বললাম, নট বাই এনি চান্স, বাই ওল মীনস্।

ঋত হেসে বলল, কলেজের দিনে যেমন ভুল ইংরেজি বলতিস, আজও বলিস।

আমি বললাম, নির্ভুল ইংরেজি বলা কখনওই আমার জীবনের মোক্ষ ছিল না তোর মতো। এখন বল, জীবনটাকে নিয়ে কী করলি? রুণার খবর কি?

এমনভাবে বললাম, যেন রুণার খবর আমি শুনিনি অমিতাভর কাছে।

ঋত বলল, ড্রপ দ্যাট টপিক। শী ইজ আ হোর।

মানে?

শকড হয়ে বললাম আমি।

ইয়েস। শী ইজ আ হোর আউট অ্যান্ড আউট।

আমি তো শুনেছি তুই-ই একজন হোরমঙ্গার।

ভুল শুনেছিস।

ঘরে রুণার মতো স্ত্রী থাকতে কেউ অন্য মেয়ের কাছে যেতে পারে? মেটেরিয়াল সাকসেসকে তুই হজম করতে পারিসনি। নিজেকে নষ্ট করেছিস। এখন আবার

রুণাকে দোষ দিচ্ছিস।

রুণার জন্যে তোর এত দরদ জানতাম না।

তারপর বলল, 'রুণার মতো স্ত্রী' কথাটার মানে কি? তুই কি বিয়ে করেছিস?

বিয়েটা আমার কাছে চিরদিনই একটা সেক্রেড ব্যাপার ছিল। চোখের সামনে তোদের মতো কিছু স্যাম্পল দেখে বিয়ে করার ইচ্ছাই হল না কোনওদিন। করলে স্ত্রীকে মাথায় করে রাখতাম।

ফুঃ! যে মানুষ বিয়েই করেনি তার মুখ থেকে এর মতো বা তার মতো স্ত্রীর গল্প আমি শুনতে চাই না। ঘরকা মুরগি ডাল বরাবর। কথাটা শুনেছিস কখনও?

ছিঃ! কোনও ভদ্রলোক এমন করে বলতে পারে?

ভদ্রলোক হবার কোনও অ্যামবিশান তো আমার ছিল না কোনওদিনই। আসলে তোদের মতো কিছু ছুকছুকে কিন্তু ইমপোটেন্ট পুরুষই রুণাকে নষ্ট করেছিল। মানে, মানসিকভাবে। কনস্টান্ট ফ্লার্টারি ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। ও যা নয়, ওকে তোরা ক্রমাগত তাই বলেছিস। একটি সিম্পল মেয়েকে ক্লিওপেট্রা বানিয়েছিস এবং এই তোদের মতো কিছু ইনসিপিড পুরুষের কন্টিন্যুয়াস ফ্লার্টিং-এর জন্যেই নিজের অজান্তেই রুণা নিজের আইডেনটিটি হারিয়েছে অ্যান্ড আলটিমেটলি শী রিডিউসড হার টু আ হোর।

আমি বিশ্বাস করি না তোর কথা। তুই নিজের কৃতকর্মের দোষ রুণার উপরে চাপাচ্ছিস। ইটস ভেরী মীন অফ ইউ।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তোর এই Sermon শোনার সময় বা ইচ্ছা কোনওটাই আমার নেই। তুই এখানে কী করছিস?

ঋতব্রত বলল।

লক্ষ্ণৌ দেখতে এসেছি।

আমি বললাম।

কী দেখবি? লক্ষ্ণৌ কি গাজনের মেলা?

আমি চেয়ে দেখলাম ঋতর পেছনেই বেশ কয়েকজন গেরুয়া ও সাদা পোশাক পরিহিত সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে ঋতর দিকে সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে মনে হল ঋতর সঙ্গে আমি বাদানুবাদ করছি বলে তাঁরা রুষ্ট।

ঋত বলল, এঁদের সামনে আমার নাম ধরে ডাকিস না।

তো কী বলে ডাকব?

ডাকার দরকার কী? তুই তোর পথে যা, আমিও যাই, অনেক কাজ আছে আমার।

তোর নাম কী? মানে নতুন নাম?

স্বামী সত্যান্বেষী অথবা সত্যান্বেষী স্বামী।

আমি হাসলাম। বললাম, হাইট অফ হিপোক্রিসী।

তারপর বললাম, কোত্থেকে এলি এখন? তুই বা লক্ষ্ণৌতে কী করছিস?

লক্ষ্ণৌতেই থাকি কিছুদিন হল। তবে সন্ন্যাসীদের কোনও ঠিকানা থাকে না।

এখন এলি কোথা থেকে?

প্রয়াগ থেকে।

সেখানে কি?

একটা কনফারেন্স ছিল।

সাধু হবার পরও কনফারেন্স?

কনফারেন্স কি সারাজীবন অসাধুরাই করবে? ঘোর তামসিকেরাই? হিন্দুধর্মের উপরে একটি সেমিনার ছিল, তাই গেছিলাম।

তুই কতদিন এই ভেক নিয়েছিস?

কুড়ি বছর। আর তুই তো কলেজে পড়ার দিন থেকেই ভেক ধরে আছিস।

তুই বুঝি বিজেপি?

আমি বললাম।

ইডিয়টের মতো কথা বলিস না। আর যদি হতামও তোর অত উষ্মার কি? তুই তো কখনও রাজনীতি করিসনি। রাজনীতি যারা করে তারা নিজেদের স্বার্থে বিজেপিকে একটা অসভ্য দল বলে চিহ্নিত করতে চাইছে ক্রমাগত। নিজেদের ভয়ে, গদি হারানোর ভয়ে। তুই তো আবার পশ্চিমবঙ্গের লোক। সেখানের কূপমণ্ডুক নেতারা মনে করেন পশ্চিমবঙ্গই ভারতবর্ষ। দু-একজন ছাড়া তোদের পশ্চিমবঙ্গে নেতা হওয়ার মতো মানুষ কি আছে আজকে? যারা কোথাও পাঁচশো টাকার বেশি মাইনে পেতো না, তারাই এখন বাঙালি জনগণের নেতা। সেইসব স্ট্যাটাসের মানুষ। রাজ্যের কী অবস্থা! আর তাও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য! হোয়াট আ পিটি! রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষাসঙ্গীত সব ক্ষেত্রেই আজকে পশ্চিমবঙ্গে লিলিপুটিয়ানদের রাজত্ব। লজ্জা! লজ্জা!

তুই-ই বা রাজনীতির কী বুঝিস?

বুঝি না তো। বুঝতে চাইও না। আমার ক্ষেত্র আলাদা। তবে এটুকু বুঝি যে ডেমোক্রেসিতে যে-কোনও মানুষের যে-কোনও পার্টিকে ভোট দেবার অধিকার আছে। কোন পার্টি সম্বন্ধেই তোর মতো অরাজনৈতিক মানুষের এমন ধারণা থাকাটা ডেমোক্রেটিক সিস্টেমের পক্ষে ক্ষতিকারক। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য এখন সব দলের নেতাদেরই একইরকম উচ্চতা। কী রাজ্যের কী হাল করলি তোরা। ছিঃ!

তুই তো রাজনীতিতে আসতে পারতিস। নেতা বনতে পারতিস অন্য নেতাদের সমালোচনা না করে।

আমি এখন যা করি তা ওসব পেটি রাজনীতির চেয়ে অনেক বড়। তোরা অর্থ অবধি বুঝিস, পরমার্থ বুঝিস না। ভুলে যাস না যে, আমি মাসে দু'লাখ টাকা রোজগার

করতাম। সব ছেড়ে দিয়ে এখন এই করছি। নিরামিষ আহার, কম্বলে শয়ন। চিত্তরঞ্জন দাস, বিধান রায়ের পরে পশ্চিমবঙ্গে সব হা-ভাতে নেতা। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু একটা হবার পরেই, কিছু করে দেখাবার পরেই দেশের কাজে নামা উচিত। নিজেকে প্রমাণ করার একটা ব্যাপার আছে। সেটা এখনকার নেতাদের মধ্যে দেখি না।

কেন? কত ব্যারিস্টার আছেন আমাদের রাজনীতিতে।

তা আছেন। ডাক্তারও আছেন। কিন্তু তাঁরা তো সি আর দাস বা বিধান রায় নন।

যাকগে, তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না।

রুণার কোনও খবর জানিস কি না বল?

আমি বিরক্তির সঙ্গে বললাম।

আমি পূর্বাশ্রমের কোনও খবর রাখি না। আমার নিজের অতীতকেও আমি মুছে ফেলেছি।

আমার রুণাকে খুব দরকার।

অনেক পুরুষেরই দরকার ছিল তাকে একসময়ে।

শুনেছি যে, সে পাহাড়ে আছে। আশ্রমে।

জানি না। আমিও তেমন শুনেছিলাম। কোনও আশ্রমকে পল্যুট করছে, কলুষিত, হয়তো। অনেক আশ্রমেই তুই রুণাদের খুঁজে পাবি। আর পাহাড় তো অনেকই আছে, খোঁজ না। সব পাহাড়ে ঘুরে বেড়া, মানা করছে কে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বিদ্রূপের গলাতে বলল, মেয়েছেলেই যদি খুঁজছিস, তাহলে লক্ষ্ণৌয়ের রাণ্ডী মহল্লাতে যা না। ফিল্মের গান শোনাবে, নাচ দেখাবে। ওরা তোর সঙ্গে আমার বৌয়ের মতো ফোর টোয়েন্টিগিরি করবে না। ওরা সৎ। পয়সা দিলে, যা চাস দেবে।

তারপরই বলল, সত্যি! এই ওল্ডেস্ট প্রফেশানটাও পল্যুটেড হয়ে গেল। ক্লাস বলে কোনও ব্যাপারই রইল না। কোথাওই। কী রাজনীতিতে, কী রাণ্ডীবাজিতে। তা তুই ওই মেয়েছেলেটার খোঁজ করছিস কেন?

একটু চুপ করে থেকে ও বলল।

আমার তাকে ভীষণ দরকার। আমি রুণার প্রেমে পড়েছিলাম জানতাম কিন্তু ঠিক এতখানি গভীরভাবে যে পড়েছিলাম তা আগে বুঝতে পারিনি। জীবনের বেলা পড়ে এল। রুণাকে এখন আমার খুব দরকার।

ঋত হাসল। বলল, লেট লতিফ। তুই চিরদিনই এরকম। সেই স্বপ্ন দেখা ইডিয়টটাই রয়ে গেলি অথচ মরবি আর ক'বছর পরেই।

তারপর বলল, প্রেম মহৎ জিনিস। প্রেম করা ভাল, প্রেমে পড়া ভাল। কিন্তু এসব প্রেমই নশ্বর। একমাত্র প্রেম হচ্ছে ঈশ্বর প্রেম।

বললাম, তোর চিরদিনই বুদ্ধি কম ছিল। তুই নির্বুদ্ধিতার পারফেকশানে পৌঁছে গেছিস এখন।

তা হবে। তোর দুর্বুদ্ধি নিয়ে তুই থাক। তুই তো দুর্বুদ্ধিজীবীদের রাজ্যের লোক, তা হতেই পারিস।

রুণা সম্বন্ধে 'মেয়েছেলে' শব্দটা ব্যবহার করিস না। বুকে লাগে।

মেয়েছেলেকে কি বলে ডাকব? আমার বুকও অনেক সয়েছে। তোর বুকে না হয় একটু লাগলই।

বিকৃতমস্তিষ্ক মানুষরাই কি সাধু-সন্ন্যাসী হয়? হাফ-উইটসরা? তোকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।

তোর যদি মস্তিষ্ক থাকত তবেই উইট নিয়ে তোর সঙ্গে আলোচনা করা যেত। তাছাড়া ওঁরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আমাকে এবার যেতে হবে।

সন্ন্যাসীরা তো গেরুয়া পরেন জানি। ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাদা পোশাকে কেন? বিধবা নাকি, থুড়ি, উইডোয়ার?

ঋত হেসে বলল, না। ওঁরা অ্যাপ্রেনটিস সন্ন্যাসী।

কতদিন পরে গেরুয়া পরবেন?

ঠিক নেই। নাও পরতে পারে। অটোমেটিক প্রোমোশান বলে এখানে কিছু নেই। এ তো ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের চাকরি নয়। গেরুয়া বসন পেতে হলে অনেক ত্যাগ, ধৈর্য তিতিক্ষা লাগে।

বলেই বলল, এবারে আমি যাব।

তোর আশ্রম লক্ষ্ণৌতে?

তোর আশ্রম নয়। আমি অনেক সন্ন্যাসীর একজন মাত্র। অনেক নীচের দিকে আমার স্থান। ভারতের সব বড় শহরেই আমাদের আশ্রম আছে, ভারতের বাইরেও আছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের মতো?

না। আমরা অত বড় নই। তাছাড়া অধিকাংশ মিশন তো পয়সাওয়াল্লাদেরই শুধু সম্মান দেয়। রামকৃষ্ণদেব বেঁচে থাকলে অনেক মিশনের অনেক সাধুর গণ্ডে-পিণ্ডে খাওয়া ও তামসিকতা দেখে মূর্ছা যেতেন।

তুই কি একজনের সম্বন্ধেও ভাল কথা বলতে পারিস না?

সরি। পারি না। আমি শুধু ঈশ্বরকে ভাল বলি।

রুণার হদিশ দিবি না?

কী করে দেব? বহু বছর তো যোগাযোগ নেই কোনওরকম। আছে কোথাও। খুঁজে যা। আমরা যেমন করে ঈশ্বর খুঁজি। পাব যে তার কোনও গ্যারান্টি নেই তবু খোঁজাই আমাদের সাধনা। তেমনি করে খুঁজে যা। পাবার সময় হলে, ঠিক

পাবি।

রুণা কি কোনও আশ্রমে নেই?

আশ্রমে গেছিল শুনেছিলাম। সে তো অনেকদিন আগের কথা। তারপরের খবর তো রাখি না।

বলেই বলল, চলি রে। আনন্দম্! আনন্দম্! আনন্দম্!

আমাকে হতবাক করে দিয়ে ঋতব্রত চলে গেল অনেকজন সাদা ও গেরুয়া পরিহিত সন্ন্যাসী পরিবৃত হয়ে।

কতরকম মানুষই সংসারে থাকে। মুখে বলে গেল আনন্দম্! আনন্দম্! আর মনটা তিক্ততাতে ভরা। পৃথিবীর কারো সম্বন্ধেই—নিজের স্ত্রী থেকে সিপিএম নেতা একটিও ভাল কথা বলার ঔদার্য নেই।

ভাবছিলাম, লক্ষ্ণৌয়ে তিনদিন থাকলে কিছুই দেখা যায় না। এত কিছু দেখার আছে। তাছাড়া সব জায়গাতেই একজন গাইড অথবা গুরু লাগে। ঋতব্রত এখন অন্য গাইড। ওর পথ আর আমার পথ আলাদা হয়ে গেছে। আর কোনওদিন কোনও বিন্দুতে মিলবে না।

রাতের বেলা লক্ষ্ণৌ থেকে কাঠগুদামের গাড়ি ছাড়ে, ভোরে কাঠগুদামে পৌঁছয়। পথের এক স্টেশনে একজন ফিরিওয়ালা শান্ডিল্লা লাড্ডু! শান্ডিল্লা লাড্ডু! বলে হাঁক পাড়ছিল। দিল্লিকা লাড্ডুর কথা জানতাম, শান্ডিল্লা লাড্ডুটা কী ব্যাপার জানি না। কিনতেই ইচ্ছা করল না। জীবনে একটা সময় পেরিয়ে এলে ঔৎসুক্য কমে যায়। অথচ ঔৎসুক্যই যৌবনের বিশিষ্ট চিহ্ন। যে মানুষের ঔৎসুক্য মরে গেছে সে অবশ্যই বুড়ো হয়ে গেছে।

লক্ষ্ণৌয়ের হোটেলের চানঘরের আয়নাতে হঠাৎই কাল সকালে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি বুড়ো হয়ে গেছি। ঋতব্রতকে দেখে, তার সাদা চুল দেখে ভেবেছিলাম জ্ঞানে পেকেছে ওর চুল। কিন্তু আমাকে হঠাৎ দেখে বুঝলাম যে আমিও ওর মতোই হয়ে গেছি। চুল সাদা, গলার কাছে চামড়া কুঁচকে গেছে, বার্ধক্যের অমোঘ সব চিহ্ন ছাপ ফেলতে শুরু করেছে। লক্ষ্ণৌয়ের এক হোটেলের চানঘরের অয়নাতে নিজের মুখ দেখে বুড়ো হয়েছি বা হচ্ছি এ কথা জানতে হল তা ভেবে একটু অবাক হলাম। সতেরো বছর বয়স থেকে দাড়ি কামাচ্ছি। সেই সময় থেকে প্রতি সকালেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাবার সময়ে নিজের মুখকে দেখছি। এখন বুঝতে পারছি যে, ভেবেছি যে দেখছি, আসলে দেখিনি। চোখ চাওয়া আর দেখা তো এক নয়। সংসারে আমরা নিয়ত চোখ চেয়ে কত কীই তো দেখি, মানে দেখছি বলে ভাবি, অথচ দেখার মতো দেখি না।

কাল থেকে আমি যে বুড়ো হয়েছি এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। এই বয়সে নিয়ে, এই চেহারা নিয়ে রুণার খোঁজে কেন যে বেরোলাম!

আমার সেই যৌবনের টান টান, ফর্সা, একমাথা কোঁকড়া কালো চুলের চেহারাটাকে তো ও মনে করে রেখেছে, যদি রেখে থাকে। তখন আমি অনর্গল কথা বলতাম, বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা করতাম, কথায় কথায় গান গেয়ে উঠতাম। রুণা আমার গান শুনতে খুব ভালবাসত। আর তা দেখে ঋত বিরক্ত হতো। আজ পেছন ফিরে তাকিয়ে ভাবি এই সেদিন অবধিও কত স্বামীরই যে বিরক্তির কারণ হয়েছি। তাদের মুখ দেখে মনে হতো Possessive তারা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠছে আমাকে দেখে। কিন্তু আমার অমনই স্বভাব ছিল। মনে কোনও পাপ ছিল না। অথচ থাকাটা স্বাভাবিক ছিল। আজি আমি রুণাকে যেমন করে চাইছি, মানসিক এমনকী, শারীরিকভাবেও এই পড়ন্ত বেলায়, আমার যৌবন যখন মধ্যগগনে ছিল তখন কিন্তু তেমন করে চাইনি। চাওয়াটা উচিত ছিল। আজ রুণার সঙ্গে দেখা হলেও তাকে দেবার মতো কিছুমাত্রই তো আমার নেই। সেও তো প্রায় বুড়িই হয়ে গেছে। তার বয়সও তো পঞ্চান্ন অবশ্যই পেরিয়ে গেছে। সে কি যৌবনের দিনের মতো আমাকে পছন্দ করবে? আমি নতজানু হয়ে বসে কিছু চাইলেও দিতে পারবে? বা দেবে? আমরা দুজনেই তো ফুরিয়ে গেছি। ফুরিয়ে যাওয়া মানুষদের পক্ষে এ কি পাগলামি নয়?

আসার আগের দিন আমার বন্ধু অজিতেশ ফোন করে বলেছিল তোকে তিনটে খারাপ খবর দিই।

বলেছিলাম, খারাপ খবর দেবার জন্যে ফোন করিস কেন?

ও বলল, এ বয়সে ভাল খবরের দিন চলে গেছে। যতদিন বেশি বাঁচবি ততদিন খারাপ খবর আরও বেশি করে পেতে থাকবি।

কী খবর বল?

অর্ণব মারা গেছে। কোলোনে ক্যান্সার হয়েছিল। সুজিত মারা গেছে বহুদিন ভুগে। বিভাস মারা গেছে দু'বছর আগে হার্ট অ্যাটাকে। খবরটা আমি পেলাম মাত্র গতকাল।

অর্ণব আমার স্কুলের এবং কলেজের বন্ধু ছিল। সুজিত ছিল পরিচিতির মাধ্যমে বন্ধু। তবে খুবই বন্ধু একসময়ের। আর বিভাস ছিল কলেজের বন্ধু। কলেজ ছাড়ার পরে অর্ণব আর বিভাসের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হতো। ভাসা ভাসা কথা হতো। বিভাস তার একটা কোম্পানিতে ডিরেক্টর করে আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিল। ও একটা ফোর-টোয়েন্টি হয়ে গেছিল। অর্ণবকে একদিন নেমন্তন্ন করেছিলাম। তখন আমার খুব রমরমা। স্কচ খাইয়েছিলাম, বাবুর্চি দারুণ রান্না করেছিল—স্কুলের কজন বন্ধুকে একসঙ্গে বলেছিলাম—Sort of Reunion। কিন্তু আনন্দ না দেখে অর্ণবের মুখে সেদিন ঈর্ষা দেখেছিলাম। ঈর্ষায় ও সবুজ হয়েছিল। দেখে আমার বুক ভেঙে গেছিল। এর জন্যেই কি তাদের ডেকেছিলাম বুকে জড়াতে?

অর্ণবকে আমি সত্যিই খুব ভালবাসতাম। স্কুলের নীচু ক্লাস থেকে একসঙ্গে পড়েছি। পাশাপাশি এক বেঞ্চে বসেছি—এক কলেজে পড়েছি। ও এম. এ. পাস

করেই একটা আধা সরকারি কোম্পানিতে ঢুকে যায়। সেখানে খুব বড় কিছু হওয়ার সুযোগ ছিল না আদৌ। সে জন্যেই হয়তো গুমরে মরত। কিন্তু তা হলেও ছেলেবেলার বন্ধুর প্রতি ঈর্ষা হবে কেন? তাই বড় দুঃখ হয়েছিল।

সেদিন হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম যে তেমন বন্ধুত্ব স্কুল-কলেজেই থাকে এবং সেখানেই শেষ হয়ে যায়। তারপর নানা কিছু ঢুকে যায় বন্ধুত্বের মধ্যে। নানা প্রত্যাশা, নানা চাওয়া, নানা ধান্দাবাজি।

আমি ঋতব্রত ও অমিতাভর বাড়ি যেতাম ওদের স্ত্রীদের পছন্দ করতাম বলে। সেটাও কি ধান্দাবাজি ছিল? আমার চোখে ছিল না। আমার বন্ধুদের চোখে হয়তো ছিল। বন্ধুত্ব মরে গেছিল, এক অমিতাভর সঙ্গের বন্ধুত্বটা ছাড়া। এখনও আছে। ওর মধ্যে কোনওরকম দৈন্য ছিল না। তাছাড়া অসমান আর্থিক অবস্থানে থেকে বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখাটা দুপক্ষের মুশকিল। খুবই মুশকিল।

আমার অবাক লাগল এ কথা ভেবে যে অর্ণব ও বিভাস মরে গেছে শুনে আমার একটুও দুঃখ হল না। হল না বলে, আমার জন্যে আমার খুব দুঃখ হল। আমি কি খুব খারাপ মানুষ হয়ে গেছি?

সুজিত বোস মারা গেছে শুনে আনন্দ হল। আনন্দ হল এই জন্যে যে, জীবনে সে অনেকেই বঞ্চনার শিকার হয়েছে। সে আমারই মতো অবিবাহিত ছিল। আমার জানা দুজন নারী 'সুজিতদা, সুজিতদা' করে কম বাগায়নি তার কাছ থেকে। সুজিতের গাড়ি চড়েছে, সুজিতের খেয়েছে, সুজিতকে দিয়ে বম্বে, দিল্লি, ম্যাড্রাস সব জায়গা থেকে উপহার আনিয়েছে অথচ সুজিতকে একটু ভালবাসেনি। তারা তাকে দেয়নি কিছুই। দুজনের মধ্যে একজন অবশ্য শরীর দিয়েছিল, মনবিবর্জিত শরীর, তাও ন'মাসে, ছ'মাসে একদিন। মনবিবর্জিত শরীর আর ঘি ছাড়া লুচি একই। আর তার বদলে নিংড়ে নিয়েছিল সর তার কাছ থেকে।

ঋত বলেছিল, রুণা বেশ্যা। আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ভদ্রঘরের ছুপা-বেশ্যা আমি অনেক দেখেছি। তাদের চেয়ে সোনাগাছির মেয়েরা অনেক অনেক সৎ।

সুজিত খুব ভুগছিলও। সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়ে পড়েছিল ও যখন তার সেই 'সুজিতদা পার্টিরা' একদিনও তাকে দেখতেও যায়নি। তার হাত যখন মুষ্টিবদ্ধ হয়েছিল কিছু দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না তাই সেই মেয়েরা তাদের তঞ্চকের ভালবাসাও ফিরিয়ে নিয়েছিল। মরে বেঁচেছে সুজিত বোস।

বিভাস তো আমাকে জেলে পাঠাবারাই বন্দোবস্ত করেছিল। সে শঠ ছিল। সে গেছে, খুশি হয়েছি। খারাপ মানুষেরা এ পৃথিবী খালি করে দেয় যত তাড়াতাড়ি ততই মঙ্গল। 'Dont speak evil of a dead man' বাজে কথা। ফালতু কথা। যে বাজে, সে জীবদ্দশাতেও বাজে, মৃত্যুর পরেও বাজে।

অজিতেশ বলেছিল কী রে! মন খারাপ হয়ে গেল তো?

আমি বলেছিলাম, তেমন নয়। আজকাল আর সহজে মন খারাপ হয় না। যেতে তো সবাইকেই হবে। আগে আর পরে। লাইন তো লাগিয়েই আছি। ট্রেনও ঠিক। খালি বার্থ রিজার্ভেশন হয়নি, এই যা।

তুই সীনিক্যাল হয়ে গেছিস।

হয়তো।

পরশু বাড়ি থাকবি? মাল খেতে আসব।

আমি মিথ্যে বললাম, পরশু একটা নেমন্তন্ন আছে।

রবিবার?

রবিবার আমি দিল্লি চলে যাচ্ছি।

মিথ্যা বলেছিলাম। লক্ষ্ণৌ রওনা হচ্ছি আমি সোমবার।

ওক্কে বস্‌স। ফিরে আয়। হবে।

ও বলল।

ঠিক আছে।

আমি বললাম।

ওকে আমার ভাল লাগে না তবু জোঁকের মতো লেগে থাকবে। একদিন খারাপ ব্যবহার করে কাটিয়ে যে দেব তারও উপায় নেই। এমন মানুষগুলোর গণ্ডারের চামড়া। আজকাল অধিকাংশ মানুষই আত্মসম্মানজ্ঞানরহিত, অভিমানবোধরহিত হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীটা এমন খারাপ জায়গা হয়ে উঠছে কেন ক্রমশ ভেবে পাই না।

ট্রেনে শুয়ে শুয়ে কত কী যে ভাবলাম সারা রাত তার মাথামুণ্ডু নেই। সকালে কাঠগুদামে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিলাম। ঠিক করেছি রাণীক্ষেতের ওয়েস্ট ভিউ হোটেলেই যাব আগে। রাণীক্ষেত, যতদূর জানি, তেমন মন্দির-টন্দির আশ্রম-টাশ্রম নেই। ওসব আছে বেশি আলমোড়াতে। নৈনিতালেও আছে। তবে কম। দু-একটা মাত্র।

ভাওয়ালি জায়গাটা বহুদিন আগে থেকে আবহাওয়ার কারণে টিবি স্যানাটোরিয়ামের জন্যে বিখ্যাত। টিবি স্যানাটোরিয়াম এখনও আছে কি না জানা নেই। তার পরেই পথটা দুভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে রাণীক্ষেত আর আলমোড়া, অন্যটা নৈনিতাল।

আগে রিজার্ভেশান করে যাইনি। তবে জায়গা পেলাম। ঘোষসাহেব যথার্থই বলেছিলেন। এদিকে বাড়িঘর নেইই। কিছুটা দূরে উত্তরাখণ্ডের ট্যুরিজমের বাংলো আছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার পোশাক দেখে ওয়েস্ট ভিউ-এ থাকার মতো রেস্ত আছে বলে ভাবতে পারেনি। এইসব কটেজময় বাংলোতে সীজনে মানে গ্রীষ্মে এবং পুজোর সময়ে বাঙালি নাকি গিস গিস করে। বড়লোক বাঙালিরা। তবে ওয়েস্ট ভিউ-এ থাকার মতো রেস্ত বেশি বাঙালির নেই।

ওয়েস্ট ভিউতে না এলে ওয়েস্ট ভিউ অথবা রাণীক্ষেতের মাহাত্ম্য বুঝতাম না। এও যেন এক আশ্রম। বড় বড় ওক গাছ—বহুদিনের পুরনো। সামনেই চিড়পাইনের জঙ্গলে ভরা উপত্যকা নেমে গেছে। তারপর আবার পাহাড়। আবার উপত্যকা। রাতে কটেজ থেকে বেরোতে মানা করলেন ম্যানেজার। বললেন, কালই রাতে হোটেলের আধ মাইলের মধ্যেই বড় বাঘে গরু ধরেছে।

কোথায়?

হনুমান মন্দিরে যাবার একটা শর্টকাট পথ আছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, সেই পথে।

এখানে হনুমান মন্দির আছে বুঝি?

আছে না? রাণীক্ষেত তো আর্মির ক্যান্টনমেন্ট। ফৌজীদের জন্যে মন্দির বানিয়ে দিয়েছে আর্মিই। মসজিদ ও গির্জাও বানায়। তবে এখানে যেসব রেজিমেন্ট আছে তাদের সৈন্যরা অধিকাংশই তো হিন্দু। তাই মন্দিরই বানিয়েছে।

কারা যায় মন্দিরে?

সবাই যায়। আপনিও যেতে পারেন। ফৌজীদের বউরাই বেশি যায়। নিজেরাও যায়। এরা সবাই খুব ধার্মিক। আপনাদের মতো মানে বাঙালিদের কথা বলছি, ধর্ম নিয়ে, রামজীকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না।

আপনি জানলেন কী করে?

আমার বড়ভাই কলকাতাতেই থাকেন। টাটা কোম্পানির বড় অফিসার। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি যারা মন্দিরে যায় তাদের নিয়ে আপনারা নাকি ঠাট্টা-তামাশাও করেন কিন্তু আপনারাই আবার মাথায় রুমাল চাপিয়ে ইফতার পার্টিতে শামিল হয়ে যান। আপনারা এক অদ্ভুত জাত স্যার।

কী আর বলব।

বললাম, হুঁ।

বললাম ওই শর্টকাট দিয়েই যাব? মন্দিরে?

হ্যাঁ, যেতে পারেন। তবে দিনে দিনে যাবেন। বিকেল চারটের পর আর সকল ছ'টার আগে ঐ পথ দিয়ে না যাওয়াই ভাল। আজই যান না চানটান সেরে।

বললাম, না, আজ নয়। আজ রেস্ট করব। রাতে ট্রেনে ঘুম হয় না আমার। কাল যাব। তারপর বললাম, বেশ ঠাণ্ডা তো এখানে।

এখনই কি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা পড়বে নভেম্বর থেকে।

Rum-টাম পাওয়া যাবে? এ তো সব সাধুসন্তদের জায়গা।

অসাধুও আছে। রামজীর রাজ্যে Rum পাওয়া যাবে না তা কি হয়? তাছাড়া আর্মির জায়গা যখন। তবে ছুপ-ছুপকে খাবেন। ঘরের মধ্যে। হোটেলের বার

লাইসেন্স নেই। গাড়োয়াল এবং কুমায়ুঁ Dry। মাছ-মাংসও কেউ খায় না। তবে এটা হোটেল বলে এখানে খাওয়া যায়। নানা দেশের মানুষ আসে তো। Rum দেব কিন্তু পাবলিকলি খাবেন না। আমার বিপদ হবে। আপনি যান। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কী Rum খাবেন?

আর্মির ঘোড়ারা যে Rum খায় সে Rum দেবেন না। অন্য যা হয়।

ঠিক আছে। আপনাকে থ্রি-এক্সই পাঠাব।

এখানে দেখার কী কী আছে?

ট্যুরিস্টরা দৌড়ে বেড়ায়, অনেক জায়গাতেই, যেমন চৌবাটিয়া গার্ডেন্স—একশো কুড়ি রকমের আপেল হয় সেখানে। কিন্তু আমি বলব এখানে এসে দৌড়োদৌড়ি করবেন না। থিতু হয়ে বসুন, পাখির ডাক শুনুন, চিড় গাছে হাওয়ার ঝিরঝিরানি শুনুন। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখুন ঘরে বসেই। মাফলার আর টুপি পরে এবং জগিং শু পরে দৌড়োদৌড়ি করে নয়, ঘরের ইজিচেয়ারে শুয়ে ভাল বই পড়ুন, Rum খান, যা যা অর্ডার দেবেন তাই রাঁধিয়ে দেব, মায় প্রন ককটেল থেকে খিচুড়ি অবধি, তারপর দেখবেন রাণীক্ষেত আস্তে আস্তে আপনার শিরার মধ্যে ঢুকে গেছে।

তারপর বললেন, বুঝলেন না স্যার, পৃথিবীময় দৌড়ে বেড়ায় বহত ট্যুরিস্ট কিন্তু বেড়াতে খুব কম ট্যুরিস্টই জানে। একেক জায়গার চাল আলাদা। এই চালটাকে ধরতে না পারলে বেড়াতে আসা বৃথা। গজল আর খেয়ালের চাল কি একরকম। বলুন স্যার?

ম্যানেজারের কথা শুনে সত্যিই খুব অবাক হলাম। লোকটা এসব কথা ভাল সেলসম্যানের মতো বলছে না, বলছে তার বিশ্বাস থেকে।

ভাবছিলাম, সত্যি! কত মানুষের কাছ থেকে যে কত শেখার আছে।

দেশ বেড়ানোর আর কি লাভ জানি না কিন্তু এই বিভিন্ন, বিচিত্র মানুষদের সঙ্গে মেশার লাভটাই আসল লাভ।

ম্যানেজার বললেন, কাছে একটা গল্ফ কোর্সও আছে। তবে খুব বেশি Whole-এর নয়। ইচ্ছে করলে খেলতে পারেন। গল্ফ স্টিক, বল, সব আমরাই দেব। ক্যাডি তো ক্লাবেই পাবেন। দারুণ ভিউ।

তারপর বললেন, গল্ফের এই একটা মজা। বল Whole-এ গেল কি না গেল গুলি মারুন। প্রকৃতির মধ্যে রোদে বৃষ্টিতে কত কিছু ভাবতে ভাবতে হেঁটে বেড়ানোর আনন্দটাই আলাদা।

আপনি খেলেন?

না স্যার।

তবে? জানলেন কী করে?

সব আনন্দই যদি নিজে করেই পেতে হবে স্যার, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন? কল্পনা? কল্পনার কী হবে তাহলে?

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এই ম্যানেজারের সঙ্গে দিনে কিছুক্ষণ গল্প করতে হবে। তাহলেই বিশ্বরূপ দর্শন হবে।

ঠিক করলাম, আজকে আমি চানটান করে উঠে সারাদিন Rum দিয়ে তপস্যা করব। ঘরেই রুম সার্ভিসে খাবার আনিয়ে নেব। প্রার্থনা করব, যাতে রুণার সঙ্গে এখানেই সাক্ষাৎ হয়ে যায়। Old Flame-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার মতো জায়গাই বটে। রাণীক্ষেত। ভারি রোম্যান্টিক জায়গা।

সকালে উঠে চা খেয়ে হোটেলের সামনের পথ দিয়ে ট্যুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে বাঁ দিকে নির্জন পথে এক ঘণ্টা হেঁটে এলাম। ভারি সুন্দর দৃশ্য। আর একেক নিশ্বাসে কলকাতাতে যা পল্যুশান ভিতরে জমা হয়েছে তার এক এক ছটাক পরিশুদ্ধ হচ্ছে। এখানে একমাস থাকা গেলে নবজীবন লাভ করে ফিরতে পারতাম। তবে একমাস থাকা যাবে না। বড় বেশি খরচ। নগদ টাকা নেই বলে নয়, পেমেন্ট তো আমি ক্রেডিট কার্ডেই করব কিন্তু রিটায়ার্ড মানুষের পক্ষে এখানে একমাস থাকা অসুবিধের। তাছাড়া, আমি তো আর রুশি মোদির মতো কয়েক কোটি টাকা নিয়ে রিটায়ার করিনি!

ব্রেকফাস্ট খেয়ে, চানটান করে, হোটেলের প্রায় সামনে দিয়েই যে কাঁচা পথটি একদিকে পাহাড় এবং অন্যদিকে খাদের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে তাতে ঢুকলাম। সত্যিই ভারি সুন্দর জঙ্গল। এখানে চিড় পাইন নেই। মিশ্র জঙ্গল। বাঁ দিকে যে খাদ নেমে গেছে তা শেষ হয়েছে একটি Ravine-এ। এমন ঘন বন যে কিছু দেখা যায় না। একটি পাহাড়ি নালা চলেছে ঝিরঝির করে। কে জানে! বাঘ দিনের বেলাতে ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর জঙ্গলেই পরশুদিন রাতে মারা গরুটিকে নিয়ে গিয়ে খাচ্ছে বা খেয়েছে কি না! রডোডেনডন এবং ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিয়োরা ফুটেছে। রুণাই আমাকে এসব গাছ চিনিয়েছিল যখন ঋতব্রত রুণা ও আমি দার্জিলিংয়ে গেছিলাম। উইন্ডামিয়ার হোটেলে ছিলাম ম্যালের ওপরে। এখনও Old World Charm আছে। এই আধুনিক যুগেও ঘরে ঘরে Fire place-এ কয়লা দিয়ে আগুন করে। আমরা ঋতর স্যুইটে এসে বসে সন্ধ্যাবেলা হুইস্কি খেতাম। রুণা ব্লাডিমেরি খেত। তখন আমাদের দু'জনেরই রোজগার অনেক—জীবন উপভোগ করতে অসুবিধে ছিল না।

ঋত তাড়াতাড়ি উঠতে পারত না। তার উপরে দার্জিলিংয়ের ঠাণ্ডা। ও ন'টা সাড়ে ন'টার সময়ে উঠত আর আমি আর রুণা সকাল ছটাতে উঠে মর্নিং ওয়াকে যেতাম। কত গল্প হতো। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতাম। রুণাকে

সব সময়েই, সব পোশাকেই আমি সুন্দরী দেখতাম কোনও কথা বলতেই আমাদের দ্বিধা ছিল না—দুজনের বন্ধুত্বটা এরকমই ছিল। আমি বলতাম, তোমাকে, একদিন নিরাবরণ দেখতে দেবে? ভারি ইচ্ছা করে দেখতে।

রুণা বলত, অসভ্য।

তারপর বলত, ঋত দুঃখ পাবে।

শুধু দেখলেও দুঃখ পাবে?

পাবে না? ও যে হাজার মানুষকে খাইয়ে আমাকে বিয়ে করেছে। আমার শরীর মনের উপরে ওরই নিশ্ছিদ্র অধিকার। ওর একার।

শরীরের উপরে অবশ্যই, কিন্তু মনের উপরে?

মনের কথা মনই জানে। মনের মতো দুর্জ্ঞেয় আর কিছুই নেই।

আমি তো তোমার শরীর চাইছি না, একবার শুধু দেখতে চাইছি।

কোনও প্রিয় নারীকেই অমন নগ্নতাতে দেখতে নেই। শারীরিক মিলনের সময় ছাড়া। ক্ল্যাসিকাল চিত্রী কীভাবে ন্যুড আঁকতেন লক্ষ করোনি? নগ্নাকে কোনওদিনই পুরো নগ্না তাঁরা রাখতেন না—এক ফালি সাদা মসলিন ফেলে দিতেন গোপনাঙ্গের উপরে আর তাই সেটা আর্ট হয়ে উঠত। বাস্তব বড় রূঢ়। আর্টের সঙ্গে তার জন্মবিরোধ।

তারপর বলত, সব পুরুষই শিশুর মতো। তার সামনে সন্দেশের থালা রেখে যদি বলা যায়, কোন্‌টা খাবে? এইটা নাও। সে অমনি বলে বসবে এটা খাব, ওটা খাব। নিরাবরণ হয়ে তোমার সামনে দাঁড়ালে বা শুলে তুমি ওই শিশুর মতোই করবে। তার চেয়ে এই যে তোমাকে মনের বন্ধুতা দিচ্ছি এই নিয়েই খুশি থাকো। এর কি কোন দাম নেই?

তার দাম যে কী তা তো আমি জানিই। তবু বড় ইচ্ছে করে তোমাকে দেখতে। একবার মাত্র দেখতে।

ভুলে যেও না খগেশ যে, আমি বিবাহিত। বিয়ে করলে কতকগুলো শর্ত মানতে হয়। সেই সব শর্ত না-মানাটা অসততা। তা না-মানা ভাল মানুষের কাজ নয়।

তুমি কি ঋতব্রতকে নিয়ে পুরোপুরি সুখী হয়েছ?

এ প্রশ্নের উত্তর তোমাকে আমি দিতে বাধ্য নই। তাছাড়া, যদি সুখী আমি নাও হয়ে থাকি তবুও সে যতদিন আমার স্বামী আছে, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে পারব না। যদি কোনওদিন এ সম্পর্ক ভেঙে যায়, তখন অন্য কথা।

আরও কত কথা বলতাম আমরা। যে নিরাবরণ রুণাকে আমি দেখতে পাব না তা কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে নিতাম। তাকে মনে মনে কতদিন আদর করেছি, যখন সে পাশের ঘরে শীতের রাতে তার স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে আশ্লেষে তার আদর

খেয়েছে।

মাঝে মাঝে আমি আর ঋত যখন একা থাকতাম, ঋত বলত তুই একটা এঁড়ে গরু, একটা গাড়োল। মেয়েদের তুই চিনিস না। পুরুষ তার প্রতি দুর্বল এ কথা জানলেই তারা যে কত কীই তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে নেয়! তুই গতকাল বিকেলে রুণাকে একটা খুব দামি গয়না কিনে দিসনি ম্যালের দোকান থেকে?

দিয়েছি। তুই একটা মেটেরিয়ালিস্ট মানুষ, তুই এ সব সূক্ষ্মতার দাম বুঝবি না। কারোকে ভাল লাগলে তার জন্যে কিছু করতে পারলে কী ভাল যে লাগে তা কী বলব!

রুণা কি তোর সঙ্গে শোবে? যদি শুতো তাহলে আমার কিছু বলার ছিল না। আমি জানি যে ও শোবে না। তুই যেমন ছুকছুকে পুরুষ ও-ও তেমনি বাতিকগ্রস্ত মেয়ে। নেকি মেয়ে। যা বাগাবার বাগিয়ে নিচ্ছে।

আমি বলতাম ছিঃ। অমন করে বলতে নেই।

ভারি গ্রস, প্র্যাকটিকাল ঋতব্রত বলত তুই একটা মা-ন্-তু। ব্যাচেলর মানুষ, বুড়ো বয়সে কেউ দেখবার থাকবে না, টাকা জমা, এমন করে অপচয় করিস না। পরে পস্তাবি। ছেলেমেয়ে থাকলে তাও নয় ভবিষ্যৎ অন্যরকম হতো, তারা দেখত।

তারা দেখত, না ছিনতাই করত, কে বলতে পারে। চারধারে দেখিস না ছেলেকে পড়িয়ে, মেয়েকে বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া বুড়োবুড়ির শেষ বয়সে কী দুর্ভোগ। ছেলেমেয়ে তো তোরও নেই।

ওসব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।

আমি চুপ করে ভাবতাম ঝামেলা ভাল লাগে না, না ওর কোনও ডিফেক্ট আছে কে জানে। রুণারও ডিফেক্ট থাকতে পারে। তবে এসব কথা তো জিজ্ঞেস করা যায় না।

পথটা এঁকে বেঁকে গেছে। এই সুন্দর রোদ ওঠা সকালেও পথটা খাঁ-খাঁ করছে। রোদ ঝলমল হলে কী হয়, এইপথে কী যেন একভয়ের গন্ধ মাখামাখি হয়ে আছে—আমার জীবনের পথের মতো।

পথটা গিয়ে উঠেছে পিচ রাস্তাতে। একটি ছোট চায়ের দোকান। কয়েকজন দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান মানুষ বসে চা খাচ্ছে। এরা নিশ্চয়ই ফৌজী হবে। মুফতিতে আছে। মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে কিন্তু লাগাতার নয়। মহিলারা পুজো সেরে মন্দিরের বারান্দাতে বেরোলেই মন্দিরের বারান্দার চারিদিকে যেসব ঘণ্টা ঝোলানো আছে সেই সব ঘণ্টাতে দোল দিয়ে বাজিয়ে দিচ্ছে। আর তাতেই অসমান, যতিসম্পন্ন ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। পরিবেশে একটা আনন্দ বয়ে যাচ্ছে। ফুলের গন্ধ, ধূপধুনোর গন্ধ ভেসে আসছে।

এমন সময়ে হঠাৎই আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, দম বন্ধ হয়ে গেল। রুণা। রুণাই কি? রুণাই তো!

রুণা একটা গরদের শাড়ি পরে রয়েছে। চান করে এসেছে। চুলে নাম না জানা একটি ফুল গোঁজা। ঠিক সেইরকমই সুন্দরী আছে। কপালের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে শুধু। শরীরটা আগের থেকে একটু ভারী হয়েছে। তাতে আরোই সুন্দরী দেখাচ্ছে রুণা এদিকেই আসছে। ডান হাতে প্রসাদী ফুল আর প্রসাদ নিয়ে। দু-তিনজন ফৌজী উঠে দাঁড়াল ওকে দেখে। শ্রদ্ধাভরে বলল, নমস্তে মেমসাব। কেউ বলল, নমস্তে মাজী।

নমস্তে জী। আপলোগ সব ঠিক্কে হ্যায় না?

রুণা বলল।

ওরা বলল বিলকুল ঠিকঠাক। ওদের স্ত্রীরা বোধহয় পুজো দিতে গেছে মন্দিরে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম, হাত জোড় করে ওদেরই মতো বললাম, নমস্তে মেমসাব।

রুণা তখন কাছে চলে এসেছে।

উত্তরে নমস্তে জী বলতে গিয়েই থমকে গেল—একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, খগেশ। তুমি এখানে! কী করতে?

আমি বললাম, সব বলব। তুমি এখন কোথায় যাবে?

আমি ট্যুরিস্ট বাংলোতে যাব। এখানে এসেছি তিনদিনের জন্যে। আমার স্বামী কর্নেল মাধো সিং এই ক্যান্টনমেন্টেই ছিলেন, কাশ্মীরে যুদ্ধে মারা যাওয়া পর্যন্ত। এই হনুমান মন্দিরটি ওঁরই হাতে বানানো। এইসব ফৌজীরা আমাকে চেনে তাই সম্মান করে। আর্মিতে এখনও অনেক ভ্যালুজ বেঁচে আছে, অনেক ট্র্যাডিশন, যা তোমাদের মতো সিভিলিয়ানসরা নিজেদের চৌহদ্দিতে তছনছ করে দিয়েছো। আমার ছেলে থাকলে তাকেও আমি আর্মিতেই দিতাম।

তোমার সঙ্গে কি হাঁটতে পারি?

কেন নয়? নিশ্চয়ই। তুমি আমার এত বন্ধু ছিলে। প্রিয় সখা।

ছিলাম না, এখনও আছি।

সেটা পরখ করে দেখতে হবে, মানে, আছো কি না!

আমরা দুজনে সেই কাঁচা পথে নেমে এলাম। রুণা বলল, খাও, একটু প্রসাদ খাও। হনুমান মন্দিরের প্রসাদ। তুমি তো আবার কলকাতার নিরীশ্ববাদী ইনটেলেকচুয়ালদের একজন। তবে খেয়ে নাও, এখানে দেখার তো কেউ নেই, জাত যাবার ভয় নেই তোমার।

সেই কাঁচা রাস্তাতে একটু এগিয়ে একটা মস্ত ওক গাছের ছায়াতে দাঁড়িয়ে রুণা বলল, তুমি এখানে এসেছ কেন? বেড়াতে?

সত্যি কথা বলব? বললে যদি বিশ্বাস না করো।

বিশ্বাস করব না কেন? আমি তো তোমাকে চিরদিনই বিশ্বাস করে এসেছি। তুমি তো খুব ভাল ছেলে, যদিও বোকা ছেলে।

ছেলে বলছ? আজ বাদে কাল মারা যাব, আবার স্কুল-কলেজের বন্ধুরা সব পটাপট মরে গেল। এই বুড়োকে ছেলে বোলো না।

বুড়ো হলেও তেমনই হ্যান্ডসামই আছ। যৌবনে যারা হ্যান্ডসাম থাকে তারা বার্ধক্যে আরও সুন্দর হয়।

বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমি তোমার খোঁজেই এসেছি রুণা। তুমি পাহাড়ে আছ, কোনও আশ্রমে আছ শুনে গত দু'মাস আমি গাড়োয়াল, হিমালয়ে তন্ন তন্ন করে তোমাকে খুঁজেছি। পাইনি।

ক'দিন বাদ দিয়ে এই কুমায়ুঁ হিমালয়ে এলাম তোমাকে খুঁজতে। প্রথমেই রাণীক্ষেতে।

আমার খোঁজে! এই পঁচিশ বছর পরে? তোমার মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। একটু অবশ্য আগেও ছিল। এখন উন্মাদ হয়েছ।

আমি কিন্তু তোমার ঠাট্টা শোনার জন্যে আসিনি এত কষ্ট করে।

ঠাট্টা করব কেন? সত্যি কথাই বলছি।

এখানে এই পাথরটার উপরে ওক গাছের ছায়াতে বসবে একটু? নীচে রডোড্রেনডন আর ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা ফুটেছে।

বসতে পারি। কিন্তু দার্জিলিংয়ের মতো আবার আমার নিরাবরণ রূপ দেখতে চেও না যেন।

তুমি মন পড়তে পারো।

চিরদিনই পারতাম। কিন্তু তুমি উঠেছ কোথায়?

ওয়েস্ট ভিউতে।

বাবাঃ! তুমি কি আরও বড়লোক হয়েছ?

রিটায়ার করেছি—ভলান্টারিলি। আমার টাকা খাবার তো লোক নেই।

তাই টাকা খাবার লোক খুঁজতে এসেছ বুঝি এতদূরে!

ঠাট্টা কোরো না। তোমার ঠাট্টা শুনতে আমি এতদূরে আসিনি।

ঠাট্টা করছি না তো?

আমার হাতে তোমার হাতটা একটু দেবে?

দিতে আপত্তি ছিল না। যে হাতে রান্না করি, যে হাতে অশিষ্ট মানুষদের চড়-চাপড় মারি, যে হাতে রিভলভার চালাই, আমার স্বামী তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর রিভলভারটা আমার নাম লাইসেন্স করিয়ে দিয়ে গেছিলেন। সে হাত তোমার হাতে রাখতে ক্ষতি কি?

সার্ভিস রিভলবার তো শুনেছি জমা দিয়ে দিতে হয়।

এটা ওঁর পার্সোনাল রিভলভার। সার্ভিস রিভলভার নয়।

তারপর বলল, নাও, ডান হাতে প্রসাদী ফুল আর প্রসাদ আছে। ডান হাত আমার জোড়া। বাঁ হাতটা দিচ্ছি।

বাঁ হাতে রোজগার করা টাকারই মতো চিরটাকাল তুমি আমাকে বাঁ হাতেরই যোগ্য বলে মনে করলে। ওইটেই আমার দুঃখ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমাকে যে আমি নিয়ে যেতে এসেছি রুণা।

রুণা হেসে ফেলল। বলল, পাগল। তুমি একটা উন্মাদ। পঁচিশ বছর পরে মনে পড়ল। তুমি কি জানো যে যখন তোমার বন্ধুর সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি ছেদ করি, তখন সবচেয়ে আগে আমার তোমার কথাই মনে হয়েছিল। তখন তো তুমি এগিয়ে আসোনি। তুমি আমার উত্তীয় ছিলে।

তখন আমি কাজে বম্বেতেই থাকতাম, প্রায় বছর দুই। ফিরে যখন অমিতাভর কাছে শুনলাম, তখন তুমি হারিয়ে গেছ।

মানুষকে চোখে চোখে না রাখলে সে হারিয়েই যায়।

তারপর বলল, অমিতাভ আর ঋতা কেমন আছে? বার্নপুরেই থাকে এখনও?

না, অমিতাভও রিটায়ার করেছে, ভলান্টারি, ইস্কোর অবস্থাও ভাল নয়।

এখন কোথায় থাকে?

কলকাতায়। মেসোমশাই তো কেয়াতলা রোডে বাড়ি করেছিলেন অনেকদিন আগে। সেখানেই থাকে।

ভারি ভাল ওরা। অমিতাভ ও ঋতা।

তারপর বলল, ওর বোন কেমন আছে? কণীনিকা?

ঠিক জানি না। বহুদিন যোগাযোগ নেই। এবারে যাব একদিন। এখন তো আমার অফুরন্ত সময় হাতে। খুব ঘুরে বেড়াই।

যদি সময়ে আসতে তবে কত মজা হতো। তোমার সঙ্গে আমিও কত ঘুরে বেড়াতে পারতাম।

ঠাট্টা করো না।

ঠাট্টা করছি না।

তারপর বলল, বুঝলে খগেশ, জীবনে, সব মানুষের জীবনেই সময়টা একটা মস্ত ব্যাপার। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ না করতে পারলেই সারা জীবন আপসোস করে মরতে হয়। কোন্ পথে যে তুমি যাবে তা সময়মতো ঠিক করাটাই মানুষের জীবনের সাফল্য-অসাফল্য নির্ধারণ করে। রবার্ট ফ্রস্টের সেই কবিতাটা পড়নি তুমি?

"The Road not taken ?"

"I Took the other road and that had made all the difference."

তারপর বলল, কিছু মানুষ ভাগ্যবান। মোড়ে এসে একটি পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরাতে তাদের জীবন ফুল ফলন্ত হয় আর না ধরাতে হাহাকারময়। তোমার যেমন হয়েছে।

তারপর অনেকক্ষণ রুণা চুপ করে থাকল। নীচের Ravine থেকে কাউফল পাক্কৌ ডাকছিল। এখানে কাউফল বলে একরকমের কালো কালো ছোট ছোট পাখিকে। বেরী পাকার সময় কুমায়ুঁ আর গাড়োয়াল হিমালয়ে দেখা যায়। আসলে পাখিগুলো আমাদের বাংলার বৌ কথা কও-ই। এখানের স্থান মাহাত্ম্যে তারাই কাউফল পাক্কৌ হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ঋতব্রতর সঙ্গে আসার সময়ে দেখা হল লক্ষ্ণৌ স্টেশনে।

ঋতব্রত?

বলেই চুপ করে গেল।

তারপর বলল, কেমন আছে?

সে তো মস্ত সাধু হয়েছে।

রুণা হেসে ফেলল। বলল, তাই। আজকাল এরকম অনেকেই দেখা যাচ্ছে। পূর্বাশ্রমে যারা অসাধুর চরম, তারাই সাধু হয়ে মস্ত সাধু হচ্ছে।

ও বলছিল .....

আমি বলতে যাচ্ছিলাম ঋতর কথা।

রুণা প্রসাদ ধরা ডান হাতটি তুলে মানা করল। বলল, তোমার হাতে আমার হাত আছে এখন। তুমি আমাকে সত্যিই ভালবেসেছিলে। কতখানি যে বেসেছিলে তা না বোঝার মতো বোকা আমি ছিলাম না। ভালবাসা মেয়েরা ঠিকই চেনে। কিন্তু যে অসহায়, যে নিরুপায়, সে সেই ভালবাসা গ্রহণ করতে পারে না বলে তার যে কষ্ট তা তুমি পুরুষ হয়ে বুঝবে না। তোমার বন্ধু একজন হৃদয়হীন, শরীর-সর্বস্ব স্বার্থপর জানোয়ার। সে পরে অনেক বড়লোক হয়ে পরম দুশ্চরিত্রও হয়ে গেছিল। তাকে আমি জীবন থেকে বহুদিন মুছে ফেলেছি। তার ভাল মন্দে আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই।

একজন পুরুষ বদলে যায় নানা কারণে। বদলে যাওয়া মানুষের প্রতিও কিছু মমতা থাকা ভাল।

আমি বললাম।

রুণা বলল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে যে তোমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল কীভাবে?

আমিও খারাপ রুণা। কলেজে ওর সঙ্গে আমার তেমন মাখামাখি ছিল না। ওর বিয়ের রাতে তোমাকে দেখেই আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এ মেয়ে এতদিন কোথায় ছিল? একে আমি কেন পেলাম না জীবনসঙ্গিনী হিসেবে? তোমার সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই আমি ঋতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম, শুধু তোমাকে দেখতে পাব, তোমার সঙ্গ পাবো বলে। ঋতর সঙ্গে আমি চাতুরি করেছিলাম।

রুণা বলল, আজকে বললে হয়তো ভাববে বানিয়ে বলছি, কিন্তু বিশ্বাস করো তোমার সঙ্গে যখন তোমার বন্ধু বিয়ের রাতে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছিল।

তাই? মিথ্যে বলছ।

আমি অস্ফুটে বললাম।

বিশ্বাস করো। এতদিন পরে মিথ্যা বলতে যাব কেন?

তাই। তবে সান্ত্বনা কি জানো? এমন ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। আমাদের প্রজন্মের মেয়েরা, যাদের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল, তাদের মধ্যে হাজার হাজার জনের জীবনে এই ঘটনা ঘটে। এইটা মনে করেই সান্ত্বনা পেতে হবে। আমরা একা নই। আমিও নই, তুমিও নও।

তাহলে এখনকার দিনের স্বাবলম্বী মেয়েরা নিজেদের পছন্দসই স্বামী গ্রহণ করার পরও তাদের অত তাড়াতাড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় কেন তাহলে?

জানি না। হয়তো তাদের নির্বাচন ঠিক হয় না বলে। বিয়ে ব্যাপারটা একটা বড় গোলমেলে ব্যাপার। ভবিষ্যতের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা লিভ টুগেদার করবে, বিয়ে করবে না, এখনও তো অনেকেই করছে।

আমি বললাম, আমার মনে হয় ব্যক্তিত্ব জিনিসটা এমনই, নদীরই মতো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তা বদলে যেতে থাকে। একদিকে ভাঙে, অন্যদিকে নতুন চর জাগে। দাম্পত্যে সন্তানেরা এই জন্যেই সিমেন্টের কাজ করে। অনেক ফাঁক ফাটল তারা ভরিয়ে দেয়, অপত্য দাম্পত্যকে গৌণ করে তোলে।

এতে দাম্পত্যর ক্ষতি কি হয় না?

হয়ই তো। কিন্তু উপরওয়ালার এই এক চক্রান্ত। নিজেদের কি চাওয়া-পাওয়ার ছিল তা ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়ের ভালমন্দতেই দম্পতি বুঁদ হয়ে যায়।

আর সেই ছেলেমেয়েরা যখন বন হয়ে মা-বাবাকে দেখে না, তাদের দুঃখ বোঝে না, তখন?

সব ছেলেমেয়েরাই অমন হয় না। তবে অনেকে তো হয়ই। কী করা যাবে।

আমি বললাম, তুমি চলো, একটা দিনরাত আমার সঙ্গে ওয়েস্ট ভিউ হোটেলে থাকবে। এইটুকু আমাকে দাও। আর কিছু চাই না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রুণা। তারপরে বলল, তা হয় না খগেশ। ওই হোটেলের মালিক এবং ম্যানেজারও আমাকে চেনেন। ওঁরা আমাকে সম্মান করেন। আমার স্বামী খুব জনপ্রিয় ছিলেন এবং সম্মানিতও। তাঁর অসম্মান হয় এমন কিছু করলে মানুষ হিসেবে আমি খুবই ছোট হয়ে যাব। তুমি বরং আমার বাড়িতে এসো।

আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, তোমার বাড়িতে? যাব?

তুমি তো ট্যুরিস্ট লজে উঠেছ। তোমার বাড়ি কোথায়?

হ্যাঁ দু-দিনের জন্যে এসেছি তো। আমার স্বামী একটি ফার্ম করেছিলেন, এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে আলমোড়া বা নৈনিতালের দিকেও নয়, একেবারে উল্টোদিকে। তোমাকে অনেক আদর-যত্ন করব। এখানে তো মাছ পাওয়া যায় না, তোমাকে সর্ষে-মুরগি রেঁধে খাওয়াব, পটল-পোস্ত, আলুকা ভার্তা, তুমি ভালবাসতে খেতে, ব্যাসন দিয়ে কচুভাজা—দেখো সব মনে আছে কি না, পনির-মটর, পায়েস। খুব ভাল দুধ দেয় আমার লাল-রঙা গাই। তোমাকে ঠিকানা দিয়ে যাব। ম্যানেজারও জানে। গাড়ি ঠিক করে দেবেন তিনি। আমার গ্রামে কিন্তু পথ থেকে কিছুটা পায়ে হেঁটে চড়াই উঠতে হবে। এখন বলো, কবে আসবে?

তোমার দ্বিতীয় স্বামী আর তোমার কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি?

না। আমারই দোষ ছিল। উনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। দিল্লি বম্বেতেও নিয়ে গেছিলেন।

তারপর বলল, সংসারে সব সুখ ঈশ্বর দেন না সবাইকে। ছেলেমেয়ে হয়নি বলেই বোধহয় আমাদের দাম্পত্য অতি মধুর ছিল।

ওঁর সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?

যেমন করে তোমার সঙ্গে দেখা হল। একদিন এক মন্দির থেকে সকালে আমি পুজো দিয়ে বেরোচ্ছি, মেজর সাহেব জীপ থামিয়ে বললেন, আপনাকে লিফট দিতে পারি? সেই মন্দির আমার আশ্রম থেকে অনেক দূরেও ছিল। সেই সূত্রপাত। বিয়ের সময়ে তিনি মেজর ছিলেন। পরে কর্নেল হন।

আমি বললাম, তোমাকে দেখার সাধ তাহলে এ জীবনে অপূর্ণ রেখেই মরতে হবে?

কী আর করবে বল? আমাকে তো দেখছই। আমার বাড়িতে আরও ভাল করে দেখবে। কিন্তু নিরাবরণ আমাকে দেখতে পাবে না। আর এখন আমাকে কি দেখার মতো আছে?

তারপর বলল, তুমি যখন আমাকে জানতে, তখন আমার বুক ছিল স্থলপদ্মর মতো, আর এখন গন্ধরাজ ফুল হয়ে গেছে।

স্থলপদ্মে তো গন্ধ থাকে না, গন্ধরাজ তো সুগন্ধি।

তখন আমার জঘন ছিল বর্ষার তিস্তার মতো, এখন শীতের ময়ূরাক্ষী। না, না, এই রূপ আর কারোকে দেখাবার নয়। তাছাড়া, আমার দুজন স্বামী ছিলেন। দেখতেই যদি চাও তো কোনও অনাঘ্রাতা কুমারী যুবতীর কাছে যাও।

আমি বললাম, হুঁ।

তারপর দুজনে হেঁটে হেঁটে ওই পথ বেয়ে আবার পিচ রাস্তাতে এসে উঠলাম।

রুণা বলল, আমার দোষ নিও না। তুমি আগামী শনিবার আসতে পারবে? মানে, তিনদিন পরে? কর্নেল মাধো সিংয়ের কথা বলবে। ম্যানেজার ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডিরেকশন দিয়ে দেবেন। অধিকাংশ ট্যাক্সি ড্রাইভার চেনেও আমাদের ফার্ম।

আমি বললাম, হুঁ।

রুণা বলল, ভাল থেকো। নিজের শরীরের যত্ন নিও। নিজেকে এমনি করে মিছিমিছি কষ্ট দিও না।

আমি বললাম, হুঁ।

রুণা চলে গেলে আমি হোটেলে ফিরলাম।

ম্যানেজার বলল, পূজা দিয়া আপনে?

হুঁ। লিজিয়ে প্রসাদ। বলে পাতা-মোড়া সন্দেশটি ম্যানেজারকে দিয়ে দিলাম।

তারপর বললাম, ইয়েতো ফৌজী জাগে হেঁ, বাজারমে রাণ্ডী মহল্লা জরুর হোগা।

গলা নামিয়ে ম্যানেজার বলল, জরুর। মগর কাহে?

তো মুঝে এক ট্যাক্সি কর দিজিয়ে গা সাম হোতে হোতে। যো ট্যাক্সিওয়ালা স্মার্ট হ্যায়।

বি-ল-কু-ল।

বলল ম্যানেজার।

তারপর বলল, সবহি কিসিম কী ট্যুরিস্ট তো হিঁয়া আয়া করতা হ্যায়। যিসকা যো মাঙ্গনি উও পুরি করনাই ফর্জ হ্যায় হামারা। ম্যায় সব ইন্তেজাম কর দুংগা সাব। আপ আদমী বহত আচ্ছা হ্যায়।

আমি দুঃখের হাসি হেসে বললাম, ম্যায় আচ্ছা হুঁ?

জরুর।

তারপর ম্যানেজার বলল, আপ কি প্রাইভেট চাহিয়ে ক্যা? উওভি মিলেগা।

প্রাইভেট? নেহি। নেহি। ম্যায় আম আদমী হ্যায় খাসসে ক্যা করেগা?

আপ রহিস আদমী হ্যায় হুজৌর। সকলসেই পহাচান লিয়া ম্যায়। খ্যয়ের আপ কি যো খায়াল ওই সেহি হোগী।

বীয়ার হ্যায় কেয়া?

হ্যায় না? জরুর। কিতনা বুতল ভেঁজু?

চার বোতল ভেজিয়ে।

বহুত খুব।

তারপর বললাম, শুনিয়ে। ম্যায় কাল সুবেহি হিঁয়া সে চল দুংগা।

ঠিক হ্যায় যেইসী আপকি মর্জি।

আমি ঘরে গিয়ে বীয়ার এলে, ঘরের জানালা খুলে দিয়ে চিড় বনের দিকে চেয়ে বীয়ার খুলে বসলাম। ঝকঝক করছে রোদ। নানা পাখি ডাকছে। ভাল মানুষ, সুখী মানুষ, ইনটেলেকচুয়াল মানুষেরা এই রকম জায়গাতে ভাল বই পড়েন কিংবা কবিতা লেখেন। কিন্তু আমি এক পুরুষ শ্বাপদ। শরীর-সর্বস্ব শ্বাপদ। যে পুরুষের শরীরের কষ্টর কথা কোনও শিক্ষিতা ইনটেলেকচুয়াল বহুত পড়ে-লিখে সফিসটিকেটেড মেয়ে বুঝল না তার দুঃখ না হয় রাণীক্ষেতের বাজারের রাণ্ডীরাই বুঝুক। তাকে খুশি করুক।

হঠাৎ সুজিত বোসের কথা মনে হল। ওর যেমন দুজন হাফ-গেরস্থ ছুপা-বেশ্যা ছিল আমার তো তেমনও থাকতে পারত। আমার তাও ছিল না।

ঋতব্রত আসলে ঠিকই বলত। ঠিকই বুঝেছিল সে আমাকে। আমি একটা এঁড়ে গরু! একটা গাড়োল।

দ্রিমি

দেবপ্রয়াগে এসেছি আজ দিন সাতেক হল। গতবারে যেবারে কেদারবদ্রী যাই পর্যটক হিসেবে অনেকের সঙ্গে সেবারে সব জায়গাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছি কিন্তু কোথাওই থিতু হওয়া হয়নি। সাত দিনে কেদারবদ্রী সেরে কলকাতা ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে চুটিয়ে গল্প করেছি বাবা কেদারনাথ আর বাবা বদ্রীবিশাল দেখার। কিন্তু মনের মধ্যে এই অনুশোচনা ছিলই যে কিছুই ভাল করে দেখা হল না।

যাঁরা পুণ্যার্থী তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা দেবদর্শন করতেই পুণ্যস্থানে যান। দেবদর্শনই শুধু তাঁদের প্রার্থনার এবং দেবদর্শন হলেই তাঁদের কার্যসিদ্ধি হয়।

আমি ব্রাহ্ম। মূর্তিপুজো আমি করি না। তবে মূর্তিপুজো যাঁরা করেন তাঁদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও অসূয়া নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ওই ব্যাপারটাকে ভারি সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন।

জঙ্গলের আদিবাসীরা টোটেম পুজো করে। গাছ, পাথর, বা অন্য কিছু। বিগ্রহও পুজো করে না তারা। কেউ কেউ কোনও পাহাড়ের মধ্যের অতল এবং অশেষ কোনও গুহাকে পুজো করে। মানে, যেখানে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি শেষ হয়েছে সেখানেই তাদের দেবতার অধিষ্ঠান। গুহার মধ্যে কি আছে জানে না, বা গুহার গহ্বর কত গভীর তাও জানে না বলেই তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ হয়েছে যে ঐ অতলে বা গহ্বরেই দেবতার ঠাঁই।

কোনও কোনও আদিবাসী আবার কোনও সুপ্রাচীন গাছকেও পুজো করে। মনে করে, সেই অতিকায় গাছই তাদের রক্ষয়িত্রী।

মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকের পথে লামনি বনবাংলোর মাইল দুয়েকের মধ্যে এরকম একটি শাল গাছকে আমি দেখেছিলাম, যার নাম "মেড্ডিসেরাই"। "সেরাই" মানে গোন্দবাইগা আদিবাসীদের ভাষায় শাল গাছ। সেই গাছের কথা সবিস্তারে "অদল বদল" নামের একটি উপন্যাসেও পড়েছি।

আদিবাসীদের পরে, আরও এক ধাপ এগিয়ে আছেন সাধারণ মানসিকতার মানুষ, সাধারণ শিক্ষার মানুষ এবং তাঁদেরই মধ্যে আমার বা আমাদের চেয়েও অনেক বেশি উচ্চশিক্ষিত অনেক মানুষও আছেন। তাঁরা মূর্তির মধ্যেই তাঁদের আরাধ্য দেবতাকে দেখতে পান। তাঁদের পশ্চিমি দেশের মূর্খ মানুষেরা বিদ্রূপের সঙ্গে বলেন

পৌত্তলিক। বলেন, Ghastly.

তারও পরে আরেকদল আছেন যাঁরা আকাশ বাতাস প্রকৃতি অথবা অন্য মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন। ব্রাহ্মরা তাঁদেরই মধ্যে পড়েন। পরমব্রহ্মকে উপাসনা করেন তাঁরা। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা আমি নানা বইয়ে পড়েছি। যাঁরা ঈশ্বরের চাপরাশ বহন করেন, যেমন সাধু-সন্তরা, তাঁদের কথাও পড়েছি 'চাপরাশ' নামের একটি উপন্যাসে।

ব্রাহ্মরা নিরাকার ব্রহ্মর সাধনা করেন বলেই তাঁরা যে সাকার-পূজারিদের চেয়ে অনেক উচ্চমার্গের এমন কথা মনে করা ভুল। ব্রাহ্মরা নিজেরাও তা মনে করেন না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছিলেন যে "হিন্দুধর্ম যদি মৃত হইত তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মকে প্রসব করিতে পারিত না।" ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুরাই প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা ব্রাহ্মধর্ম। যদিও প্রকৃতিতে ভিন্ন।

এত কথা বলার কারণ শুধু এই যে, আমি হিন্দুদের নানা দেবস্থানে গেছি, দক্ষিণের নানা মন্দির, তিরুপতি সুদ্ধ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড-এর নানা দেব মন্দিরেও গেছি কিন্তু কোথাও দেবদর্শনের অভিলাষ নিয়ে যাইনি। নিজে পুণ্য-সঞ্চয় করার চেয়ে পুণ্যার্থীদের দেখে, তাদের সঙ্গে মিশে বেশি আনন্দ পেয়েছি। এবং এখনও পাই।

সেই কারণেই এবারে আমি একমাসের ছুটি নিয়ে এসেছি। প্রথম তিনদিন হরিদ্বারে ও কনখল-এ ছিলাম। সেখানে বড় ভিড়। আমার ভাল লাগেনি। সাতদিন হৃষিকেশ-এ ছিলাম। ত্রিবেণী ঘাট-এ বসে থাকতাম। পুণ্যার্থীরা নদীর মতো বয়ে গিয়ে গঙ্গ মাঈতে পৌঁছে জল ছুঁতেন। আমি যখন হৃষিকেশ-এ ছিলাম তখন আবার 'কাড়োয়া চওথ' পড়েছিল। 'কাড়োয়া চওথ' হল পুজোর পরে এবং কালিপুজোর আগের কৃষ্ণা চতুর্থী। শয়ে শয়ে বিবাহিতা, সুসজ্জিতা, সালংকারা মহিলা গঙ্গায় ফুলের নৈবেদ্য ও প্রদীপ ভাসাচ্ছিলেন সন্ধের পরে। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। মধ্য ও উত্তর ভারতীয়রা অনেক বেশি ধর্মপ্রাণা এবং রীতিনীতি মান্যকারী, বাঙালিদের তুলনায়। শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে ধর্মাচরণটা এখন Out of Fashion.

এই রীতি-নীতি, ব্রত, প্রথা মান্যতার মধ্যে দিয়েও একরকমের নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা আসে। বাঙালি জাতি আজ যে পরম অনিয়মানুবর্তী তার বোধহয় এও একটা কারণ। মানে, ওই মান্যতার প্রতি অনীহা।

অত উচ্ছল উদ্বেল ভক্ত মানুষের স্রোতের কাছাকাছি থাকলেও মন দ্রব হয়ে যায়, নিজের মনের মধ্যের ভক্তির উৎসমূল খুলে যায়। তাদের সঙ্গে একধরনের বিনিসুতোর আত্মীয়তাও অনুভূত হয়।

হৃষিকেশ থেকে একটা মন্দিরে গেছিলাম এক সাধু মহারাজের পরামর্শে। ভারি

ভাল লেগেছিল। সে মন্দিরে কেদারবদ্রীতে বুড়ি-ছোঁওয়া মানুষদের মধ্যে খুব কমই যান। অধিকাংশই এই মন্দিরের নামও জানেন না। তেহরি-গাড়োয়ালের পথে কিছুটা গিয়ে গাড়োয়ালের আগের রাজধানী পেরিয়ে যেতে হয় সে মন্দিরে। মন্দিরের নাম কুঞ্জাপুরী। অনেকগুলি সিঁড়ি চড়ার পরেই পৌঁছনো যায় সেখানে। মন্দিরটি একটি পর্বতের চুড়াতে। সেই মন্দিরের চত্বর থেকে নানা শৃঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়। তার মধ্যে চন্দ্রবদনীও পড়ে। খুবই ভাল লেগেছিল কুঞ্জাপুরীতে গিয়ে।

তারপর এসেছি দেবপ্রয়াগে। ইচ্ছে ছিল ওখান থেকে যাব রুদ্রপ্রয়াগে কিন্তু হল না দ্রিমির জন্যে। দ্রিমির আকর্ষণেই ছুটির বাকিটা দেবপ্রয়াগেই কেটে গেল।

বাস থেকে বন সুন্দর লেগেছিল এই দেবপ্রয়াগ, গতবারে যখন এই স্থানকে ছুঁয়ে যাই, পর্বতগাত্রে সাধুদের উপাসনা স্থলগুলি দূর থেকে রহস্যময় মনে হয়।

কেদারবদ্রীর পায়ে হাঁটা পথ আগে ছিল গঙ্গার ওপার দিয়ে। লছমনঝুলাতে গঙ্গা পেরিয়ে গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে হাঁটা পথ চলে গেছিল এক চটি থেকে অন্য চটিতে। সকালে খেয়ে রওয়ানা হয়ে প্রায় সারাদিন হেঁটে বিকেল বিকেল অন্য চটিতে পৌঁছতে হত। থাকতে হত নানা ধর্মশালা অথবা পাণ্ডাদের বাড়িতে। উত্তরাখণ্ডের পাণ্ডারা পুরী বা দেওঘরের পাণ্ডাদের মতো অসভ্য কখনও ছিলেন না। তাঁদের ভদ্র ও সৌজন্যময় ব্যবহার পুণ্যার্থীদের মুগ্ধ করত। এখনও করে। যদিও টেলিভিশন আর ভোগবাদ যা কিছু শাশ্বত এবং সুন্দর তার ওপর কুপ্রভাব ফেলছে ধীরে ধীরে।

চীনারা ভারত আক্রমণ করার পরে ষাটের দশকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মস্ত চওড়া পিচ-রাস্তা বানানো হয় গঙ্গার বাঁদিক দিয়ে। দেবপ্রয়াগের পরে অবশ্য সে পথ সেতু পেরিয়ে আবার নদীর ডানদিক ধরে গিয়েছে।

দেবপ্রয়াগে এসে উঠেছি এক পাণ্ডার বাড়িতে। নিরামিষ কিন্তু চমৎকার খাবার খাই, বাহুল্যহীন। রাত বাজারের হালুইকরের দোকানে পুরী তরকারি খেয়ে নিই। আর মালাই।

খাওয়াটা ওখানে গৌণ। ঘুরে ঘুরে বেড়াই। একাধিক ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে চলে যাই গঙ্গা বা অলকানন্দার অন্য পাড়ে। এখানে যাঁরাই আসেন বা যাবেন তাঁরাই সে সাধু বা সন্ত এমন নয় কিন্তু সাধু-সন্তদের সঙ্গে থাকতে থাকতে অসাধুও নিজের অজান্তে সাধু হয়ে ওঠে। নিজের মনের নানা প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা স্তিমিত, প্রশমিত হয়। আত্মিক উন্নতি হয়। হিন্দুদের ধর্মস্থানে গিয়ে আমি ব্রাহ্ম হলেও আমার মনে এক ধরনের ফুর্তি আসে। আনন্দর সঞ্চার হয়। হয়তো দেব-দেবীর ইচ্ছাতেই হয়। আমি সামান্যজন তাই বুঝতে পারি না। কিন্তু নিজেকে পবিত্র ও পূত বলে মনে হয়। মনের মধ্যের নানা কুচিন্তা ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে।

এও তো এক ধরনের উত্তরণ। অবশ্যই।

এই ভূমিকা এই জন্যেই করতে হল যে এই দেবপ্রয়াগেই আমার জীবনের সবচেয়ে

সুন্দরী ও রহস্যময়ী নারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার নাম দ্রিমি। জানি না, কেমন করে, কী ভাবে, কোন্ জোরে আমি তার ঘোর কাটিয়ে আবার নগর-জীবনে, আমার Mundane কাজের জগতে ফিরে এলাম। শুধু তাকে দুচোখ ভরে দেখার জন্যেই তার সঙ্গে গল্প করার জন্যেই, আমি সমস্তজীবন দেবপ্রয়াগেই যে কেন রয়ে গেলাম না এও এক রহস্য।

অবশ্য আমি যে সম্পূর্ণ নিজের জোরেই দ্রিমির মায়া কাটিয়ে, আকর্ষণ ছিন্ন করে আসতে পেরেছিলাম এ কথা বোধহয় ঠিক নয়। দ্রিমি যদি নিজের মুঠি নিজের ইচ্ছাতেই শিথিল না করত, আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো মুক্ত করে না দিত, তবে আমার সাধ্য ছিল না সেই বাঁধন ছিন্ন করার।

সুন্দরী অনেকেই হন। বুদ্ধিমতীও অনেকেই হন। কিন্তু এত, নারীসুলভ নারী আমার জীবনে না আর দেখেছি, না ভবিষ্যতেও দেখব।

দ্রিমির মতন একজন নারী একজন পুরুষের জীবনের সমস্ত শূন্যতা যে কত বড় পূর্ণতা দিয়ে ভরাট করতে পারে তা, পাঠক যদি দেবপ্রয়াগে গিয়ে কখনও দ্রিমির দেখা পান তবেই জানবেন।

প্রার্থনা করি, দেখা যেন পান। যে পূর্ণতার কথা বললাম, হয়তো শূন্যতারও, তা প্রাঞ্জল বা বিশদ করে বলি এমন সাধ্য আমার নেই।

সেদিন থেকে অবশ্য প্রায় পনেরো বছর কেটে গেছে। দ্রিমি আজ আর যুবতী নেই। কিন্তু সুন্দরী, যে, সে চিরদিন সুন্দরীই থাকে, বিশেষ করে, যার মনের সৌন্দর্য অসীম।

দ্রিমি বাংলা পড়তে পারে না। যদিও বলতে পারে। তবে গাড়োয়ালি অ্যাকসেন্ট আছে। সে কোনওদিনও আমার এই লেখা সম্বন্ধে জানবে না যদি না পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেউ দেবপ্রয়াগে গিয়ে দ্রিমির দেখা পান এবং এই লেখার কথা দ্রিমিকে জানান। দেখা পেলে, বলবেন দয়া করে যে, আজও আমি বিয়ে করিনি। ওকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম কিন্তু ও বলেছিল, আমার বাবা আমাকে নন্দলালার পূজারিণী করেছেন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে তাঁর সঙ্গেই। আমি আর কারোকে ও এ জীবনে বিয়ে করতে পারব না। আমি আরেক রাধা, অন্য রাধা, অন্যরকম নন্দলালার রাধা।

তাকে বলবেন যে, আমিও তার পূজারী হয়েই রয়ে গিয়েছি। অন্য কোনও নারীকেই তার আসনে আজ অবধি বসাতে পারিনি।

তার একটি ফোটো আছে আমার কাছে। মৈনাক সিংজীর মেয়ের তোলা। কখনও কখনও কোনও নিশুতি রাতে ড্রয়ার খুলে সেই ফোটোটি বের করে দেখি। মনে মনে তার সঙ্গে অনেক কথা বলি, গল্প করি, আর তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা

করি। এ কথাও দয়া করে তাকে বলবেন।

পাঠক। আপনি হয়তো ভাবছেন একি ছেলেমানুষি! হয়তো ছেলেমানুষিই! কিন্তু কোনও কোনও ব্যাপারে আমরা সকলেই ছেলেমানুষ।

২

আমি যে পাণ্ডার বাড়ি উঠেছিলাম তাঁর নাম মৈনাক সিং। দেওয়ালির আর দিন কয়েক বাকি। অসময়ের বৃষ্টি নেমেছে। দেবপ্রয়াগে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। এবারে সিনিবালি দেওয়ালি। সারা শৈল জনপদে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বিকেলে পাথরে বাড়ির বাইরের বারান্দাতে চাদরমুড়ি দিয়ে বসে আছি এমন সময় একজন সৌম্যদর্শন পবিত্র-মুখের দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ এসে হাজির। তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে। সে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে মাথাকে ঘোমটা দিয়েছিল। দৌড়ে বারান্দাতে উঠেই স্বগতোক্তি করল, কোঈ মৎলব হ্যায়! আট রোজ বাদ দিওয়ালি আর অভি পানি বর্ষাণে শুরু কি।

তার গলার স্বর আমার বুকের মধ্যে কী যেন ঘটিয়ে দিল। কারও গলার স্বরেই এমনটি ঘটেনি আগে। মৈনাক সিং বললেন, আরে দ্রিমি বেটি। যাও অন্দর যাও। তুমহারা চাচীকো বোলকর কাপড়া বদলকে আও। নেহিতো দিওয়ালিকি পহিলে বিমার পড় যায়েগী তু।

মেয়েটি দৌড়ে ভিতরে গেল। দৌড়ে যাওয়ার সময়ে পেছন থেকে তার ফিগার দেখে মুগ্ধ হলাম। সরু কোমর তার সঙ্গে মানানসই নিতম্ব, মরালী গ্রীবা, কোমর সমান চুল। তার চলার ছন্দে চুলে ঝাঁকি পড়ছিল। শাড়ির নিচে তার শুভ্র রুপোলি-রঙা সুলক্ষণা গোড়ালি আর রুপোর পায়জোর যেন একীভূত হয়ে গেছিল।

মৈনাক সিং আগন্তুক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, ইনসে মিলিয়ে। অওতার তিওয়ারি। বহুতই নেক ঔর নামী পূজারি হ্যায় ইনোনে। ইনহিকি রিস্তেদাব সব বাবা বদ্রীনাথকী পূজারি।

বাবা বদ্রীনাথের পূজারিরা শুনেছি সমতলের মানুষ। শীতকালে যখন মন্দির বন্ধ হয়ে যায় তখন নাকি ওঁরা দেবপ্রয়াগেই এসে থাকেন। শোনা কথা। সত্যি মিথ্যে জানি না।

মৈনাক সিং বললেন, উনি থাকেন এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে। গঙ্গার ওপারে। এক নির্জন গুহায়। তাঁর মেয়েকে নিয়ে। গঙ্গার উপরের ঝুলা ব্রীজ পেরিয়ে দেবপ্রয়াগে আসেন কখনও সখনও। ওঁর নন্দলালের বিগ্রহ আছে গুহার মধ্যে। মস্ত গুহা। বাইরে পাথরের চাতাল। গুহার মধ্যেই থাকেন তিনি। স্ত্রী গত হয়েছেন চার বছর হল। একমাত্র কন্যা এই দ্রিমি। রূপেগুণে অসামান্যা। খুব ভাল ভজন গায়।

বাপ বেটিতে নিজস্ব এক আলাদা জগৎ গড়ে বাস করেন। কেউই, এখানকার দু-একজন পুরনো বাসিন্দা ছাড়া ওর মন্দিরের কথা জানেনও না। মন্দিরে বহিরাগত বা ট্যুরিস্টরাও কেউ যায় না। ওঁর দু-একজন শিষ্য ছাড়া।

তারপর বললেন, বললে অবাক হবেন, উনি মাধুকরীও করেন না, অন্য কোনও মাঙ্গনির কথা তো ছেড়েই দিলাম।

দেবপ্রয়াগের যাঁরা ওঁকে জানেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁরাই সিধা পাঠান, চাল, আলু, ঘি, কিছু সবজি, কখনও সখনও দুধ বা মিষ্টি—তাতেই একহারী বাবা ও মেয়ের দিব্যি চলে যায়। এতটুকু মেয়ে, সেও একাহারী।

তিওয়ারিজী বললেন, সিংজী, কাফি হো গ্যয়া। আভভি ব্যসস কিজিয়ে। ইনকি তারিফত নেহি বাতাঁয়ে আপনে।

মৈনাক সিং বললেন, ইনোনেভি ইক অজীব তরাকি আদমী হেঁ। যেইসী ট্যাওরিস্ট হামলোগোঁনে হরওয়াক্ত মিলতে রহতা হ্যায়, ঐসী নেহি। বহতই পড়েঁ লিখে আদমী হ্যায়। বাঙ্গাল কি কোঈ কালিজমে প্রফেসর হ্যায়। ইনোনে দৌড়-ভাগমে বিসওয়াস নেহি করতে হোঁ। এইসেহি চুপচাপ বৈঠকর সবকুছ দিখতে হেঁ। ঔর সবসে বড়া চিজ এহি হ্যায় কি ইনোনে হিন্দু ভি নেহি হ্যায়।

মৈনাক সিং বললেন, তো? মুসলমান? মুসলমানলোগোঁনে ত দুসরা ধরমকো ধরমহি নেহি সমঝতে হেঁ। হামলোগোঁকো তো।

উনোনে সব কাফির কহতে হ্যায়। ঔর কাফির কো জান লেনেসে ইনলোগোঁকো উপরওয়ালাসে ইনামভি মিলতি হ্যায়।

আমি বললাম, নেহি তিওয়ারীজী। অ্যায়সী কুছ নেহি। আপলোগোঁকো কোঈ গলদ তার তায়া হোগা।

তিওয়ারীজী বললেন ব্রাহ্ম ধরমকি বারেমে জ্বারা খুলকর বাতাইয়ে।

মৈনক সিং বললেন, বড়া বড়া পড়ে-লিখে হিন্দু ইনসান নেহি ই ধরমকো প্রতিষ্ঠা কিয়েথে। রামমোহন রায় থে ইস ধরমকি প্রতিষ্ঠাতা। বাংগালমে যিতনা বড়ে বড়ে বাঙ্গালি আজতক প্যায়দা হুয়া, সি. আর. দাস, রবীন্দ্রনাথ, বিধান রায়, সত্যজিৎ রায় ওর হালফিলকি অমর্ত্য সেন ভি ব্রাহ্মই হ্যায়। ইনলোগ মুর্তি পূজা নেহি করতে হেঁ। নিরাকার ঈশ্বরকি পূজা করতে হ্যায়। পরমব্রহ্ম।

আমি বললাম অমর্ত্য সে ব্রাহ্ম নেহি হ্যায়।

তিওয়ারীজী বললেন, খ্যায়ের আপভি উপরওয়ালাকো মানতে হেঁ ওনকি নাম বাবা বদ্রীনাথ, বাবা কেদারনাথ, কালীমাতা, দুর্গমাতা, নন্দলালা, আল্লা, যীশু, বুদ্ধ পরমব্রহ্ম, যো ভি হেঁ উপরওয়ালাকো তো মানতেহি না? তো ইসমে ফর্ক ক্যা হ্যায়?

সবহি উপরওয়ালা ইকহি হ্যায়। ইসানোনেহি ইন লোগোঁগি বিচমে ফর্ক কিয়া

ঝুঠমুঠ। ঔর ফর্ক করকে বহুতই বুরা কাম কিয়া। তামাম দুনিয়ামে মুসলমালোঁগ যো তকরিব কর রহা হ্যায় ধর্ম কি নামসে ইয় ইনসানকি ভালা নেহি করোগে। উনে ইয়ে চিজ সমঝানা চাহিয়ে।

আমি বললাম, সমঝানা অ্যায়সী আহসান কাম নেহি হ্যায়। উস ধরমকি নেচারই আয়সা হ্যায় কি দুসরেকো ইনলোগ পেয়ার দেনে মে তেয়ার নেহি হ্যায়।

হিন্দী আমি আদৌ ভাল বলতে পারি না। জেন্ডার সব গোলমাল হয়ে যায়। ভার্ব এবং টেনসও। আর উচ্চারণের কথা নাই বা বললাম। কিন্তু করি কি? ওখানে বাংলা বা ইংরেজি তো কম মানুষই বোঝে।

এই আমার বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। এখানে শুধুমাত্র বাংলা বা ইংরেজি জানলে কোনও দেশবাসীর সঙ্গে মেশা যায় না। একাধিক দেশীয় ভাষা শেখা এই দেশকে জানা বা বোঝার জন্যে খুবই জরুরি। অথচ কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের কুপমণ্ডুক বাঙালিরা একথা মানতে রাজি হই না। পশ্চিমবঙ্গই ভারতবর্ষ এইরকম একটা মূর্খজনোচিত ভাবনা আমাদের আছে। আমরা চোখ-না-ফোটা প্রজাতি। কবে যে আমাদের চোখ ফুটবে তা ঈশ্বরই জানেন।

তিওয়ারীজী বললেন, (পাঠক! আমি এবার বাংলাতেই বলি আপনাদের, কারণ এতক্ষণে আমার হিন্দির বহর দেখে আপনারা হয়তো হাসছেন) আমি নির্জনতা পছন্দ করি। তাছাড়া মা-মরা যুবতী মেয়েকে নিয়ে একা থাকি, তাই বাইরের খুব কম মানুষকেই আমি আমার মন্দিরে আসতে বলি। মন্দির সামাজিকতার জায়গা নয়। সাধনার জায়গা। একক নির্জনের সাধনা। এ বড় কঠিন সাধনা বাবুজী। আপনাদের রামকৃষ্ণদেব যে কালীমায়ের দর্শন পেয়েছিলেন সেকি এমনিতে?

তারপর দু হাত মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, ওঁর কথা আলাদা। উনি নিজেও অবতার ছিলেন। আমরা তো তা নই। তাই আমাদের সাধনা অনেক কঠিন।

আপনার মন্দিরে কী করে যাব?

ঐ যে। সামনের ঝুলাটি দেখছেন, হ্যাঙ্গিং ব্রিজ, ওটি পেরিয়ে পুবমুখো আধমাইল হেঁটে যেতে হয় পিচ রাস্তা ধরে। যখন পথ একেবারে নির্জন হয়ে যাবে, কানে শুধুই নিচের গিরিখাতে দিয়ে বয়ে-যাওয়া গঙ্গামাঈর ঝরঝরানি শব্দ শুনতে পাবেন আর ক্বচিৎ পাখির ডাক, সেখানে দেখবেন একটি মস্ত তাড় গাছ।

তাল গাছ?

সিংজী হেসে বললেন এখানে তাল হয় না। তাড় গাছ। যে গাছের পাতার দোণা দিয়ে প্রসাদী ফুল আর প্রদীপ জ্বেলে পুণ্যার্থীরা জলে ভাসান।

তারপর বললেন, আপনাকে তাড়-এর পাতা চিনিয়ে দেব আমি। গাছটা এত বড় যে আপনি ঠিকই চিনে নেবেন। তাড় আর তোন এখানের বিশেষ গাছ।

তিওয়ারীজী বললেন, সেই গাছের তলা দিয়ে দেখাবেন একটি পাকদণ্ডী পথ

উঠে গেছে চড়াই-এ। বেশ খাড়া কিন্তু। প্রায় সওয়া মাইল চড়াই চড়ার পর একটা সমতলভূমি পাবেন—মালভূমি। সেখানে অনেক ফুলের গাছ আছে দেখবেন।

কী ফুল?

আমরা স্থানীয় নাম জানি। বললে, আপনি কি বুঝবেন? দুটি ইংরেজি নাম বলতে পারি, এক রডোডেনড্রন আর দুই ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা। ল্যানটানার নানা-রঙা ফুলের ঝাড়ও আছে অনেক। এখানে লোকেল্যানটানাকে বলে লানটায়েন। ইংরেজির অপভ্রংশ।

তারপর?

তারপর সেই ফুলবনের মধ্যে দিয়েই পায়ে-চলা পথ ধরে হেঁটে আসবেন প্রায় পৌনে এক মাইল। দেখবেন সামনেই এক পর্বত। আর সেই পর্বতের পাদদেশেই আমার গুহা।

আমি বললাম এমন দুর্গম পথে, এতখানি গিয়ে এমন দুর্গম জায়গাতে থাকেন কেন আপনি তিওয়ারীজী?

ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ তো খুব দুর্গমই বাবুজী। আমি নির্জনে সাধনা করব বলেই ঐ ফাগুয়ারা পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছি।

কাছাকাছি কোনও গ্রাম নেই?

না। পাঁচ বর্গমাইলের মধ্যে কোনও গ্রাম নেই।

আশ্রম? কোনও মানুষ থাকে না?

না, মানুষ থাকে না তবে বড় বাঘ আছে, চিতা, মস্ত মস্ত হিমালয়ের ভালুক, হরিণ, পাহাড়ি ছাগল, মানে ঘুরাল আর সেই হরিণ যে হরিণের নাভিকে মৃগনাভি বলে।

তাই?

তারপর বললাম, তা আমার মতো শহরবাসীকে আপনার পবিত্রতা কলুষিত করতে সেখানে নেমন্তন্ন করছেন কেন?

তিওয়ারীজী হাসলেন। এক দুর্জ্ঞেয় হাসি।

মানুষটিকে দেখলেই, যার দেখার চোখ আছে, সেই বুঝবে যে ইনি নেহাৎ সাধারণ মানুষ নন। তাঁর চোখেমুখে এক দারুণ দীপ্তি আছে। আর মুখটি এমন যে, দেখেই বোঝা যায় যে এ মানুষ জীবনে কখনও মিথ্যাচার, তঞ্চকতা করেননি কারও সঙ্গে। সততার প্রতিমূর্তি মানুষটি। এমন মুখ কলকাতা শহরে দশ লক্ষ মুখ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

বললাম, বললেন না তো!

তিওয়ারীজী বললেন, এতদিন ঈশ্বরের সাধনা করছি কিছু সিদ্ধি তো হয়েছে বাবুজী। ঈশ্বর কারোকেই খালি হাতে ফেরান না। কম বেশি কিছু দেনই। আপনার

কপালে একটা চিহ্ন আছে, ঠিক দু ভুরুর মাঝে, নন্দলালার পায়ের চিহ্নের মতো, যা সচরাচর কোনও মানুষের মধ্যে দেখা যায় না, তাছাড়া এত অল্প বয়সে।

তারপর বললেন, আপনার বয়স কত হয়েছে বাবুজী?

আমি বললাম বত্রিশ।

তবে? ঠিকই বলেছি।

আমি বড় বিরক্ত বোধ করলাম। বললাম, আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। আমি অতি সাধারণ মানুষ, পাপী-তাপী মানুষ, পশ্চিমবাংলার এক মফঃস্বলের কলেজে ইকনমিক্স পড়াই। আমার মধ্যে কোনওরকম বৈশিষ্ট্যই নেই।

তারপর বললাম, আর যে চিহ্নর কথা বলছেন তা কি এতদিনে অন্য কারও চোখে পড়ত না? আমি নিজেও নিজের মুখ দাড়ি কামানোর সময়ে সতেরো বছর বয়স থেকে দেখছি, কই আমি তো কখনও কোনও চিহ্নটিও দেখতে পাইনি।

সকলেই সব কিছু দেখতে পায় না। আপনি সিদ্ধ পুরুষ। ঈশ্বরের সাধনা আপনি ঠিকমত করলে ঈশ্বরকে আপনি অনেক সাধু-সন্তদের আগেই পেতেন।

সিংজী মিটি মিটি হাসতে হাসতে আমাদের কথা শুনছিলেন।

তিওয়ারীজী বললেন আমি ঠিকই দেখেছি যা দেখার। আমি বললাম আমি মদ খাই, সিগারেট খাই, বিবাহিত না হলেও আমি নারী সংসর্গ করেছি। যদিও এখানে মদ খাচ্ছি না। আমি তো ভালমানুষ নই।

তিওয়ারীজী হাসলেন।

বললেন, আপনি যে আপনিই সেটা আপনার এই কথাই প্রমাণ দিল। আপনি পরিষ্কার মানুষ না হলে আমার মতো সদ্যপরিচিত কারোকে এই সব কথা কি বলতে পারতেন? আপনার লুকিয়ে রাখার মতো কিছুই নেই। আর ঈশ্বর এমন মানুষদের কাছেই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন না।

তারপর বললেন, আমি আমাদের এখানের বিজয়ানন্দজীর কাছে আপনাদের রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। তাঁর একজন চেলা ছিলেন না? গিরীশবাবু? তিনি তো মদ আর মেয়েমানুষে ডুবে ছিলেন। তাতে কি হল বাবুজী? ঈশ্বর সাধনার ব্যাপারে আসল জিনিস হল আধার। আধার যদি ঠিক না থাকে কিছুতেই হবার নয়। রামকৃষ্ণদেব গিরীশ ঘোষকে বুকে তুলে নেননি? তারপর বললেন, এসবে কিছু হয় না। মদ খেলেই মানুষ খারাপ হয়ে যায় না।

সিংজী বললেন বাবুজীর একা একা আপনার আশ্রমে গিয়ে পৌঁছতে অসুবিধে হবে। কাল যখন ফিরবেন তখন ওঁকে সঙ্গে করেই নিয়ে যান না কেন? উনি যা খুঁজছেন তা উনি আপনার ওখানেই পাবেন।

তিওয়ারীজী বললেন, সে কী। সিনিবালি দিওয়ালিতে উদ্বেল দেবপ্রয়াগের এই আকর্ষণ ছেড়ে আমার গর্তে উনি কী করতে থাকবেন? দিওয়ালি পেরোক, তারপরই

না হয় যাবেন?

তারপর সিংজী বলেন, ওঁর ইচ্ছে। তবে একা যেতেও অসুবিধে নেই। পায়ে চলা পায়ের চিহ্ন তো স্পষ্টই। আর দ্বিতীয় কোনও পথও তো ও তল্লাটে নেই। তবে ভয় একটাই। ভল্লুকের খপ্পরে না পড়েন।

তিওয়ারীজী বললেন, ভালুক যদিও খুবই খতরনাক প্রাণী এবং সম্পূর্ণ অকারণেই তারা মানুষের উপরে হামলে পড়ে নাক ঠোঁট চোখ খুবলে নেয় তবুও আমি তো ওখানে পনেরো বছর আছি, আমাদের কারোকে এবং আমাদের আশ্রমে আসা-যাওয়ার পথে অন্য কারোকেই কখনই আক্রমণ করেনি, যদিও তারা দেখা দিয়েছে বহুবার। ওরা হয়তো ঈশ্বর ভক্তদের কিছু বলে না। এখন উনি একা যাবেন না আমাদের সঙ্গে যাবেন সেটা বাবুজীর বিবেচনার উপরেই ছেড়ে দিলাম। কোনও জোর খাটাব না। তবে আমার মনে হয় দিওয়ালির রাতে দেবপ্রয়াগে থাকলেই বাবুজীর আনন্দ বেশি হত। আমার ওখানে তো আমি আর দ্রিমি। তৃতীয়জন তো কেউই নেই। মেয়েটা অবশ্য সঙ্গ পাবে ক'দিনের জন্যে। এবং সাধুসঙ্গ।

আমি বললাম, আমিই তৃতীয়জন হব।

৩

ফাণ্ডয়ারা পাহাড়ের তিওয়ারীজীর আশ্রমে দুদিন হল এসে উঠেছি। যাওয়ার সময়ে কিছু আতপ চাল, ডাল, আলু, ঘি এবং যা সবজি বাজারে পাওয়া গেল তা কিনে একটি থলিতে ভরেছি তিওয়ারীজীর আপত্তি সত্ত্বেও। জিনিস তো পয়সা দিলেই পাওয়া যায় কিন্তু থলের ওজন হয়ে গেছে প্রায় পনেরো-ষোলো কেজি। তা বয়ে নিয়ে যেতে প্রাণান্ত। দ্রিমি বলেছিল, আপনার কষ্ট হচ্ছে বাবুজী, আমাকে দিন।

আমি 'না' বলেছিলাম। যে বোঝা শক্ত সমর্থ পুরুষ বইতে পারে না সে বোঝা কোন্ লজ্জায় একজন নরম নারীকে বইতে বলা যায়?

আমি বলেছিলাম, আমি বাবুটাবু নই। আমার নাম অনিমেষ। তুমি অনি বলেই ডেকো। তিওয়ারীজীও আমার থেকে বয়সে জ্ঞানে গুণে অনেকই বড়, আপনিও আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন। নইলে আমার অস্বস্তি হবে।

উত্তর ভারতে কেউ কারাকে দাদা বলে না। পশ্চিম ভারতের কোনও কোনও জায়গাতে, যেমন বম্বেতে, দাদা মানে গুণ্ডা। উত্তর ভারতে ছোটবড় সকলকেই ভাইয়া বলেই সম্বোধন করা হয়।

দ্রিমি হেসে বলল, আমি আনি ভাইয়াই বলব। তিওয়ারীজী বললেন, আমি ডাকব অনি বেটা বলে।

গুহাটির মধ্যেই আশ্রম। অনেকগুলো ভাগ বা ভালো বাংলাতে যাকে প্রকোষ্ঠ বলে, তাই আছে। মূল প্রকোষ্ঠে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। সে ঘরটি ধূপ ধুনো আর ফুলের গন্ধে ম ম করে। তার ডানপাশে একটি বড় প্রকোষ্ঠ। বাঁ দিকে তিন চারটি প্রকোষ্ঠ আছে, ছোট। আমি থাকছি বাঁ দিকের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটিতে। ওঁরা বাবা ও মেয়ে থাকেন ডানদিকের বড় প্রকোষ্ঠটিতে। বাঁদিকের প্রথম প্রকোষ্ঠে চাল ডাল ইত্যাদি থাকে, তিনটি পাথর বসানো উনুনও আছে। উনুনের পাথর সরিয়ে সামনে পেছনে করা যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির সময়ে, উনুন ভিতরে করে নেওয়া যায়। আগুনের তাপেও ধুঁয়োতে এই প্রকোষ্ঠটির ছাদ কালো হয়ে গেছে। দেওয়ালও। তার উপরে স্যান্ডস্টোন দিয়ে দ্রিমি নিজের নাম লিখেছে হিন্দিতে।

ছেলেমানুষি।

ঈশ্বরের পূজারিদের মনকে তো বটেই শরীরকেও বয়স ছুঁতে পারে না। কিছু কিছু ব্যাপারে দ্রিমিকে দেখে মনে হয় ওর বয়স পাঁচবছর।

তিওয়ারীজী যাইই বলুন, আমি তো জানি যে আমি এখানে ঈশ্বরভজনা করতে আসিনি। তবে অসভ্যতাও করতে আসিনি। চোখের সামনে দিনে রাতের আঠারো ঘণ্টা দ্রিমিকে দেখতে পাবো এই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার একমাত্র সুখ। এমন পবিত্র সৌন্দর্য আমি আমার বত্রিশ বছরের জীবনে কখনও দেখিনি। দ্রিমি আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। ফাগুয়ারার গুহার থেকে দুশো গজের মধ্যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট্ট প্রপাত আর ঝোরা আছে। তার চারপাশে যে কত বহুবর্ণ লতাগুল্ম ও ফুল, তা কি বলব! বড় গাছে গাছে অর্কিড ঝুলছে বহুবর্ণ। কত পাখির ডাক।

আমি [illegible] জীব। পাখি বলতে জানি কাক চড়ুই আর চিল। বেশি হল শালিখ— one for sorrow two for joy. তাই কোনও পাখিই চিনি না আমি। মুগ্ধ চোখে তাদের রং-বেরঙের পালকের দিকে, পায়ের দিকে, ঠোঁটের দিকে চেয়ে থাকি।

এই ঝোরার জলই খাওয়া হয়, এই ঝোরাতেই চান করা হয়। আমি দেরি করে চান করি। তিওয়ারীজী কাক ভোরে চান সেরে এসে পূজোতে বসেন। তার একটু পরে রোদ উঠলে যায় দ্রিমি।

দ্বিতীয় দিনেই আমার মধ্যের পাজি মানুষটার খুব ইচ্ছে করল যে দ্রিমিকে চান করার সময়ে দেখব। যে এমনিতেই অত সুন্দরী তার নিরাবরণ রূপটিকে এই নন্দন কাননের মধ্যে দেখা এক অনির্বচনীয় সুখ। আমার মনে, ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, কোনও কামভাব জাগেনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে যেমন করে এখানের গাছাপালা ফুল প্রজাপতি পাখপাখালি দেখি, তেমনই মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি দ্রিমিকে দেখব। শুধুই দেখব। তার সৌন্দর্য দু চোখ দিয়ে পান করে শহরের কলুষিত অপবিত্র চোখে নির্মল সৌন্দর্যের

প্রলেপ লাগাব।

সেদিন তিওয়ারীজী চান সেরে উঠে এসে বললেন, কিঁও বেটা, ক্যায়সি লাগ রহি হ্যায়।

আমি বললাম, সারা জীবন এই নন্দনকাননে থেকে যেতে ইচ্ছা করছে।

রহ যাও। মগর শকোগে? বড়া শহরকি ধূণ ছোড়কর হিঁয়া রহনা মামুলি বাত নেহি হ্যায়।

বললেন, এই সৌন্দর্য দুদিন পরে একঘেয়ে লাগবে। প্রকৃতিকে ভালবাসতে না শিখলে ওখানে বেশিদিন থাকতে পারবে না।

তাছাড়া সৌন্দর্য তো প্রকৃতিতে থাকে না, ভক্তিও মূর্তিতে থাকে না, সেই সব থাকে তোমার মনে।

আমার মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের গানের কথা, 'পুষ্প বনে পুষ্প নাহিরে পুষ্প আছে অন্দরে।'

তিওয়ারীজী পুজোতে বসলেন গিয়ে।

ড্রিমি আগের রাতেই পুজোর উপচার সব সাজিয়ে দেয়। বিকেলেও সে চান করে, ফুল খোঁজে মাথায়, বন ফুলের মালা গেঁথে গলায় পরে, তার কান ও নাকও বেঁধানো আছে। নাকে নথ-এর মতো ছোট্ট ঘাসফুল গোঁজে আর কানে পরে একেকদিন একেক রঙা ঝুমকো ফুল। ওকে যত দেখি তত মনে হয় এ জীবনে আমার ওখান থেকে নড়ার আর উপায় নেই। এখানেই থিতু হতে হবে বাকি জীবন।

এখন কৃষ্ণপক্ষ। রাতের বেলা গুহার সামনের কালো পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে দূরে আলোকিত দেবপ্রয়াগ দেখা যায়। বিন্দু বিন্দু আলো ছড়ানো জি[illegible]না। কোথাও মনে হয় আলোর মালা। পরিবেশে কোনও মালিন্য বা অ[illegible] অলকানন্দা আর গঙ্গার সঙ্গমস্থল দেবপ্রয়াগের কাছে না গেলে দেখা [illegible]লো কেজ্জি ও সন্ধের পর থেকেই গঙ্গার বেগে বয়ে যাওয়ার শব্দটা ক্রমশই জোর হতে থাকে। নদীর উপরের হাওয়া দিনে গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে সজোরে একদিক থেকে বয় আর রাতে উল্টোদিক থেকে। প্রকৃতি যে কত এবং কতরকম রহস্যই লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর বুকের ভিতরে যে, যাঁরা সেই বুকের আঁচল সরিয়ে তা দেখতে পারেন, যাঁদের সেই দৈবী ক্ষমতা আছে, তাঁরাই একমাত্র পারেন।

আগেই ঝরনাতলির কাছেই একটা লুকোনোর জায়গা দেখে রেখেছিলাম নিজে চান করার সময়ে। সেদিন সকালে ড্রিমি চান করতে যাওয়ার আগেই সেখানে গিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইলাম। ড্রিমি একটা বেগুনি ঘাঘরা আর সাদা ব্লাউজ পরে ছিল। ওপরে চোলি। আর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ফিকে কমলা রঙা একটি শাড়ি, গাঢ় কমলা রঙা একটা সায়া আর ব্লাউজ। ব্লাউজের ভিতরে কাঁচুলিও ছিল, যখন ব্লাউজটা পাথরের উপরে রাখল তখন দেখতে পেলাম।

ড্রিমি আগে ব্লাউজটা খুলে পাথরে রাখল তারপরে কাঁচুলিটি খুলল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। দুটি সদ্য-ফোটা গোলাপি রঙা স্থলপদ্ম যেন। আমার মনীশ ঘটকের কবিতা মনে পড়ে গেল, 'বল্কলমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয় সহসা উদ্বেল হলো শুভ্র বক্ষময়।'

তারপরে ঘাঘরাটিও খুলে ফেলল দড়িতে এক টান মেরে। আমার হৃৎপিণ্ড ধকধক করতে লাগল। হলুদ মোমের মতো দুটি উরু আর উরুসন্ধিতে নবতৃণদল-এর মতো নরম ও উজ্জ্বল কিন্তু কালো পশম। ড্রিমি কী একটি গান গাইতে গাইতে জলে নামল। তারপরে তার কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে জলের মধ্যে একটি পাথরে বসে নিজের মনে একটি ভজন গাইতে লাগল গুন গুন করে।

"বসসো মেরে নয়নানোমে নন্দলাল
সুমরি সুরত মাধুরী মুরত
নয়না বনে বিশাল
বসসো মেরে নয়নানোমে নন্দলাল।"

ওর গান শেষ হতেই আমার পেছন থেকে একটা মস্ত ময়ূর ডেকে উঠল কেঁয়া কেঁয়া করে। ভাবলাম, বাঘ দেখল না কি? পড়েছিলাম, ময়ূরেরা বাঘ দেখলে ডাকে।

তারপর ভাবলাম, বাঘ বেরোলে বেরোক এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে গিয়ে প্রাণ গেলেও দুঃখ নেই।

সেই গান গাইতে গাইতে সে তন্ময় হয়ে গেল। নন্দলালকে সে তার চোখে এসে বসতে বলেছিল, বারবার আকুতি করছিল।

আমি অবাক [illegible] ড্রিমির সেই ভাব তন্ময়তা এবং সিক্ত। রূপ দেখছিলাম। ঈশ্বরের দিব্যি, [illegible] মনে কোনওরকম কামভাবই জাগল না। শিশু যেমন করে পাখি দেখে, [illegible], বা ফুল, আমি তেমন করেই ড্রিমিকে দেখছিলাম।

ড্রিমি ঝরনার জলের মধ্যে জলছাড়া দিয়ে চান করছিল। নিজেতেই নিজে যেন সম্পূর্ণ ও। ওর কোনও পরিপূরকের দরকারই নেই। কোনওদিনই হবে না।

একবার চোখ তুলে আমি যেখানে বসেছিলাম সেদিকে তাকালো তারপর চোখ সরিয়ে অন্যসব দিকেও তাকাল। একজোড়া চুকার, পাহাড়ি ফেজেন্ট এসে ক্রমাগত ডাকতে লাগল ড্রিমির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাখিগুলো সম্ভবত আমাকে দেখতে পেয়েছিল। জানি না। ড্রিমি আরেকবার আমার অবস্থানের দিকে তাকাল। তারপর আবার নিজের মনে চান করতে লাগল।

চান সেরে উঠে ড্রিমি আমার দিকে পেছন ফিরে গামছা দিয়ে গা মুছল তারপর স্থলপদ্মদুটিকে কাঁচুলিবদ্ধ করল। চান করতে নামার আগে সে যখন সামনে ঝুঁকেছিল তখন আমার মনে হয়েছিল স্থলপদ্ম দুটি বুঝি বৃন্তচ্যুত হয়ে খসে পড়বে। সামনে শরীর ঝোঁকানোতে সে দুটি লম্বাটে হয়ে গেল যেন, মাংসপেশি শিথিল হওয়ার

কারণে। অনাবৃত অসংবৃত নারীশরীরে যে কত গভীর নিবিড় নির্মাণ এবং অবসান তা নিজ চোখে না দেখলে জানতেও পারতাম না।

দ্রিমি ছাড়া কাপড় কেচে নিংড়ে নিয়েছিল শুকনো কাপড় পরার আগে। সে ঝর্নাতলি ছেড়ে চলে যাবার আগেই আমি নিঃশব্দে আমার অবস্থান থেকে সরে গিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলাম। গিয়ে তিওয়ারীজীর কাছে বসলাম। ওঁর সকালের পুজো একটু আগে শেষ হয়েছিল।

বললেন, কিঁউ বেটা। মজেমে হ্যায় তো?

কী প্রকার মজাতে যে আছি তা তো ওঁকে বলা যায় না, হেসে বললাম, জী হাঁ।

উনি বললেন তুমি লেখাপড়া জানা অধ্যাপক কিন্তু তুমি ভারতবর্ষকেই জানলে না। সংস্কৃতটা শিখে ফেল। হিন্দি নিশ্চয়ই জানো, মানে পড়তে লিখতে?

লজ্জাতে অধোবদন হয়ে বললাম, জানি না।

উনি বললেন রাষ্ট্রভাষা তো শিখনাহি চাহিয়ে। হিন্দি জানলেও অনেক বই তুমি পড়তে পারতে, যে সব বই পড়ে আমাদের সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, সব সম্বন্ধেই জানতে পারতে।

তারপর বললেন, ধর্ম শব্দটার মানে জানো?

আবারও বললাম, না।

ধর্ম হচ্ছে যাহা ধারণ করে। A Binding Force. সেই অর্থে হিন্দুধর্ম তোমাদের মতো নব্য ইংরেজিনবীশ যুবকদের হাতে পড়ে আর Binding Force নেই। হিন্দুধর্ম এখন এক বিচ্ছিন্ন শক্তি। হিন্দুরাই হিন্দুদের সবচেয়ে বন শত্রু এখন। নিজ নিজ স্বার্থ, ক্ষমতার লোভ, গদির লোভ, মন্ত্রিত্বের লোভে হিন্দুরা নিজেদের যত ক্ষতি করছে যবনরাও আক্রমণের পর আক্রমণ করেও তা করতে পারেনি।

তারপর বললেন, তুমি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ-এর লেখা পড়েছ? তাঁর লেখা তো পড়তে পারো। তাঁর লেখা, তাঁর বক্তৃতা সব তো ইংরেজিতেই। উপনিষদও আছে ওঁর ইংরেজিতে লেখা। উনি একটি বক্তৃতাতে বলেছিলেন : "India was always defeated from within and not from outside"–কথাটা খুব দামি বেটা।

আপনি ইংরেজি জানেন মহারাজ?

সামান্যই জানি। বলার মতো বা জাহির করার মতো কিছু নয়। ইংরেজি না জানলে যে বাইরের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। সংস্কৃতও জানতে হবে, হিন্দিও জানতে হবে এবং ইংরেজিও জানতে হবে বৈকি।

আপনি ইংরেজি কোথায় শিখলেন?

এই দেবপ্রয়াগেই। তোমাদের মতো ফটাফট বলতে পারি না তবে কাজ চালিয়ে নিই। আমার এক শিষ্য আছে, জার্মান, নাম উইলিয়াম গাম্ভার। ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে

আফেনবাখ-এ থাকে। সে প্রতিবছর দিওয়ালির পরে আসে। তাকে আনতে যাব আজ থেকে সাতদিন পরে আমি দেবপ্রয়াগে। সে সিংজীর কাছে এসে পৌঁছে যাবে সময়মত। দ্রিমি তার খুব প্রিয়। সিংজী কখনও আসেননি এখানে। এবারে গাম্ভারের সঙ্গে আসবেন বলেছেন।

তারপর বললেন, আমায় আজকেও একবার দেবপ্রয়াগে যেতে হবে। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?

তারপর নিজেই বললেন, না থাক। দ্রিমিও থাকবে। তোমরা দুজনে থাকো।

দ্রিমির সঙ্গে সারাদিন একা থাকব এই আনন্দে আমি ভরপুর হয়ে উঠলাম। দ্রিমি এখন আমার fixation হয়ে যাচ্ছে। জানি না, আমার কপালে কী আছে? আমাকে কি তিওয়ারীজী মেরে ফেলবেন?

বললাম, আপনার বুঝি অনেক শিষ্য?

গুরু-শিষ্য পরম্পরা এখানে বহু প্রাচীন পরম্পরা। শিক্ষা, নানারকম শিক্ষা এই পরম্পরার মাধ্যমেই মানুষ পায়, আমারও গুরু ছিলেন জ্যোতির্ময়জী—উনি বাঙালি ছিলেন—জীবনে যতটুকু শিখেছি সব গুরুরই কৃপায় । তাই বাঙালিদের প্রতি আমার এক বিশেষ দুর্বলতা আছে। তবে সেইরকম বাঙালি আজকাল আর বেশি দেখতে পাই না। তোমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্ভবত এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। গ্রহণ বর্জন-এর ব্যাপারে, আমার মনে হয়, তোমরা কনফিউজড হয়ে গেছ। আমি ভুলও হতে পারি। তবে তোমরা যারা তরুণ তোমাদের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার।

আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আপনার কি অনেক শিষ্য আছে?

দেখো বেটা আমি যদি আমার গুরুর মতো কৃপাধন্য হতাম ঈশ্বরের তবে আমারও অনেক শিষ্য থাকতে পারত। আমি আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। গুরুগিরি করার যোগ্যতা আমার নেই।

বলেই বললেন, তুমি কৃষ্ণমূর্তির কথা পড়েছ? তাঁর লেখা?

না তো।

আমি আবার অধোবদন হয়ে বললাম।

পড়তে পারো। তিনিও ইংরেজিতেই লিখতেন। আমেরিকাতেই থাকতেন অধিকাংশ সময়। মস্ত বড় দার্শনিক। কয়েক বছর আগে গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কোনও শিষ্য ছিল না। তিনি গুরু Cult-এ বিশ্বাস করতেন না। করলে, সারা পৃথিবীতে তাঁর লক্ষ লক্ষ শিষ্য থাকত। যদিও লক্ষ লক্ষ অনুরাগী তাঁর আছেই আমারই মতো। তাঁর বই তুমি যে-কোনও ভাল ইংরেজি বইয়ের দোকানেই পাবে। কিনে পড়ো। তোমাদের ইকনমিক্স-এ যেমন Unstable Equilibrium আছে আমাদের দর্শনশাস্ত্রেও আছে, তোমরা যেমন অঙ্ক করো, এখন ইকনমিক্স আর

ম্যাথেমেটিক্স-এর মধ্যে তো বিশেষ তফাতও নেই, হয়তো একদিন দর্শনের সঙ্গে ও থাকবে না। একটা জিনিস লক্ষ করেছ কি? সারা পৃথিবীটাই ধীরে ধীরে Digital হয়ে উঠছে। যাই হোক, তবে তোমাদের মতো ইংরেজি শিক্ষিত তরুণদের দর্শনে ইন্টারেস্টেড হতে হবে।

একটু থেমে বললেন, টাকা রোজগারটাই জীবনের একমাত্র ব্রত বা গন্তব্য হওয়া উচিত নয়। মানুষের জীবন নিয়ে অনেকেই কিছু করার আছে। এই আমেরিকানরা পুরো পৃথিবীকে নষ্ট করে দিল ওদের ভোগবাদ দিয়ে।

আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর বললাম, আপনি যে দ্রিমিকে আমার হেপাজতে রেখে দেবপ্রয়াগ যাচ্ছেন, কাল ফিরবেন, আপনার দ্রিমির জন্যে চিন্তা হচ্ছে না?

চিন্তা? কেন? দ্রিমি তো আমার সম্পত্তি নয়। তাছাড়া তোমার হেপাজতে তাকে রাখতে যাব কেন?

আপনি তো আমাকে চেনেনই না। কলকাতা শহরের এক অচেনা মানুষ। কত লোভ, কত রিপুভারে ভারাক্রান্ত আমি, আপনার মনে একটুও দ্বিধা হচ্ছে না?

না বেটা। দ্রিমিকে নিয়ে আমার চিন্তা নেই। তোমাকে নিয়েও নেই। তুমি যে নির্লোভ, নিষ্কাম, তা আমি বলছি না। দ্রিমিও নয়। আমরা কেউই নই। কিন্তু দেখতে হবে ভালটা বেশি আছে, না মন্দ। আমার গুরু যদি মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে আমাকে কিছুমাত্র জ্ঞান দিয়ে থাকেন তাহলে আমি বুঝেছি খারাপ চিন্তা তোমার মনে আসলেও আসতে পারে। খারাপ কাজ তোমার দ্বারা হবে না। তা ছাড়া, খারাপ ভাল বিচার করার আমি কে? তোমরা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তমনস্ক, তোমরা কি করবে না করবে সে তোমাদেরই ব্যাপার। তোমাদের দুজনের কারোকে নিয়েই আমার চিন্তা নেই। তুমি যদি দ্রিমিকে নিয়ে যেতে চাও নিয়ে যাও, যদি সে স্বেচ্ছায় যেতে রাজি থাকে। তাকে তো আমি বেঁধে রাখিনি। যে বাঁধনে সে বাঁধা আছে তা নন্দলালার বাঁধন। তা দেখা যায় না। কিন্তু বড় দৃঢ় সে বাঁধন। গৃহী কী ঈশ্বরের সাধনা করতে পারে না? একশবার পারে। দ্রিমি যদি কাউকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চায় সে অবশ্য বাঁধতে পারে। আমি তাকে বাধা দেবার কে? আর বাধা দেবই বা কেন?

৪

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর গুরুজী তাঁর ঘরে গেছেন বিশ্রাম করতে, তার পরও গুহাতেই থাকবেন বিকেল পর্যন্ত। দ্রিমিকে বললাম, দুপুরে কী করেন গুরুজী?

বই পড়েন।

তুমি কী কর? আমি না হয় এখন আছি, অন্য সময়ে?

আমিও বই পড়ি।

বই পড় কেন? কোনও পরীক্ষাতে বসবে কি?

জীবনই তো একটা পরীক্ষা। সব পড়াশুনাই কি ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে? স্কুল ফাইন্যাল, বি এ, এম এ?

আমার ও সবে দরকার কী? আমি তো নন্দলালার চাকরি করিই। অন্য চাকরিতে কোনও দরকার নেই আমার।

কী বই পড়?

বাবা যেসব বই পড়তে দেন। আমি কি জানি কোন্‌টা পড়ার আমি যোগ্য! পড়তে পড়তে তবেই না যোগ্যতা বাড়ে। তখন হয়তো কঠিন কঠিন বই পড়তে দেবেন।

তুমি হিন্দিতে পড়?

হ্যাঁ। তবে বাবা আমাকে সংস্কৃত আর ইংরেজিও শেখাচ্ছেন—বছর তিন চার-এর মধ্যে আশা করি শিখে যাব মোটামুটি।

বল তো I Love You মানে কী?

দ্রিমি হেসে বলল, তুমি আমাকে ভালবাসো।

আর তুমি? তুমি আমাকে ভালবাসো না?

উঁহু।

তারপর বলল, অসভ্য মানুষকে আমি ভালবাসি না।

আমার বুকটা ধক করে উঠল।

বললাম, কেন? অসভ্য বলছ কেন আমাকে?

ও বলল, আমি কি তোমার বউ? তুমি লুকিয়ে আমার চান করা দেখছিলে কেন? মানুষে নিজের স্ত্রীর চান করাও দেখে না। চান একটা বিশেষ গোপনীয় ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ কি কারও চান দেখে।

আমি মুখ নীচু করে বললাম, তুমি বুঝতে পেরেছিলে?

হুঁ। জামা-কাপড় ছাড়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তোমাকে একটা ময়ূরও দেখে ফেলেছিল। কেঁয়া কেঁয়া ডাক তুমি শোনোনি? এই বনে আমাদের কত পাহারাদার আছে তা তুমি জানো?

তাই যদি হবে তাহলে তুমি আমাকে চলে যেতে বললে না কেন?

তুমি অপমানিত হতে, তাই। চোরকে ধরলে চোরের কি ভাল লাগে? তা ছাড়া তুমি সৌন্দর্যের পূজারি। তুমি তো আমার নিরাবরণের রূপই দেখতে চেয়েছিলে।

আমি ধরা-পড়া চোরের মতই বললাম, আমি তো তোমাকে বলাৎকার করতে চাইনি।

বলাৎকারের প্রশ্ন ওঠে না। তুমি বাবার অতিথি। তুমি আমারও অতিথি। তুমি যদি আমাকে আদর করে আনন্দ পেতে তবেও আমি বাধা দিতাম না। বাধাটা ছিল

তোমার নিজের বিবেকের। বিবেক না থাকলে তুমি এই আশ্রমকন্যাকে সম্ভোগ করতে পারতে—তোমার মতো বিদ্বান্ বুদ্ধিমান পড়েলিখে বাঙ্গালী মেহমান। তুমি আমার উপরে চড়াও হলে আমি একটুও বাধা দিতাম না। তোমাকে বলপ্রয়োগ করতেই হত না। তবে কী করে কী করতে হয় আমি তো জানি না। জীবনে আজ অবধি কখনও তো ওসব করিনি। বিয়ে করব কী না তাও জানি না।

আমিও করিনি।

আমি মিথ্যা কথা বললাম।

দ্রিমি হেসে বলল, বাঁচা গেছে। দুই আনপড় মিলে কী না কী করতাম!

তারপর বলল, আমার চান দেখাটার মধ্যে আমি কোনও দোষ দেখতে পাইনি। তুমি ফুল দেখ ভালবেসে, পাখি দেখ, তারা দেখ, অন্ধকার রাত দেখ, চাঁদের আলো দেখ—আমাকেও দেখতে চাইলে অন্যায়ের কি আছে। তাছাড়া, মনে একটু গর্বও হয়েছিল। এমন একজন অধ্যাপক আমাকে চুরি করে দেখছে বলে।

লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল।

দ্রিমি বলল, আমাদের এখানে কত আনপড় গাঁওয়ার মানুষ আছে, আজ অবধি কেউই কখনও আমাকে অমন করে দেখতে চায়নি।

তাদের সাহসে হয়তো কুলোয়নি। কুলোলে নিশ্চয়ই দেখতে চাইত।

ভুল কথা। সাহস তাদের আপনার চেয়ে কারোরই কম নেই। তাদের শিক্ষা, তাদের সহবৎ, তাদের ধর্ম-অধর্মর জ্ঞান তাদের নিরস্ত করে রেখেছিল। ইচ্ছাকে অবদমন করতে পারাটাই তো শিক্ষার ফসল।

মুখ তুলতে পারলাম না আমি। মুখ নামিয়েই বললাম, তুমি বড় সুন্দর। তাই তো সবসময়ে তোমার মুখে চেয়ে থাকি। তোমার সমস্ত তুমিকে, তোমার নিরাবরণ তুমিকে দেখতে ভারি ইচ্ছা করেছিল। আমি খুব নীচ। আমাকে ক্ষমা কর।

আপনি নীচ নন বলেই আমি তখনই ক্ষমা আপনাকে করেছি। ঔৎসুক্য নীচতা নয়। তাছাড়া, আমার বাবা বলেন, যে শিক্ষা মানুষকে ক্ষমা না করতে শেখায়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

তাই?

হ্যাঁ।

ও বহীনজী! দ্রিমি বহীন।

বলে, কে একজন কাঁধের উপরে একটা বস্তা চাপিয়ে আর হাতে একটা বালতি নিয়ে এসে হাজির।

স্বামীজী কোথায়?

আরাম করছেন।

তারপর বলল, কী আনলে শান্তাপ্রসাদ ভাইয়া?

দিওয়ালি এসে গেল। তোমার ভাবীজী পেঁড়া বানিয়েছে। আর এক বালতি দুধ নিয়ে এলাম। গাইটা বাছুর বিইয়েছে, তোমার ভাবী বলল, আমরা কত খাব? দ্রিমির জন্যে নিয়ে যাও, দ্রিমি ক্ষীর করে রাখবে, গুরুজীকে দেবে। শীত পড়ে গেছে, নষ্ট হবে না।

আর থলেতে?

থলেতে একটু চাল, ডাল, আর সবজি আছে। কদ্দু, আলু, বায়গন, নুন, হরা মিরচা, টোম্যাটোর, যা যা হয় আমার খেতে।

চা খাবে বড়ে ভাইয়া? চায়ের সময় তো হয়ে গেছে। বাবার জন্যেও বানাব।

পিলাও। তুমহারি হাত কি চায়ে অমৃত যেইসী লাগতা হ্যায়।

দ্রিমি মুচকি হেসে বলল, সমুদ্রমন্থনের সময়ে তুমিও কি রাহু কেতুদের সঙ্গে অমৃতের ভাগীদার হয়েছিলে না কি বড়ে ভাইয়া?

আররে তোমার সঙ্গে কথা বলাই বিপজ্জনক।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, শান্তাপ্রসাদ, শাদী ভি কর লিয়া ঔর দাওয়াত ভি দিয়া নেহি। তুমহারা ভাবীজী তুমহারা খোপরি তোড় দেগি।

দ্রিমি বলল, তোমার মাথা খারাপ। ও বাবু কলকাত্তা কি প্রফেসর হ্যায়। সমঝা না, যিনোনে কালিজমে পড়হাতা হ্যায়। বহতই পড়ে-লিখে মহাত্মা আদমী। মৈনাক কাকাকি ডেরামে মিলে থে উনসে। হুঁয়াপরহি থে, দেবপ্রয়াগমে, কাকাহি, পিতাজীকি সাথ ভেজিন হিয়াঁ।

তো বহুত পড়ালিখা হোতা হোগা।

দ্রিমি আমার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বলল, ব-হ-ত।

আবার অধোবদন হলাম আমি।

শান্তাপ্রসাদ বলল, আচ্ছাহি হুয়া, মগর অতিথি আয়ে হুয়ে জাননেসে সবকুছ ঔর জাদা করকে লেতে আতা থা।

দ্রিমি বলল, যো লেকে আয়া ওহি কাফি হ্যায়। ভাবী হামারা পাগল যেইসী। হিঁয়া খাতে কওন?

অতিথিকো ঠিক সে খিলাও পিলাও, খুশ কর।

দ্রিমি বলল, খুশি করার সবরকম চেষ্টাই তো করছি কিন্তু খুশি হচ্ছেন কি না জানব কী করে।

এমন সময়ে গুরুজী এত কথাবার্তা শুনে বাইরে এলেন। বললেন, কেমন আছো শান্তাপ্রসাদ? এ কী তুমি আবার অমন কাণ্ড করেছ। এখানে খানেওয়ালা কে আছে?

আমাদের ওখানেও তো নেই। তাছাড়া বুধিয়া গাই বাছুর বিয়োল, খেতে ফসল হল, বাড়ির ছাদে লাউ ফলল, আমার দোষ নেই।

হাসলেন তিওয়ারীজী বললেন, তোমার বাহানার শেষ নেই।

তারপর কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে চা খেয়ে শান্তাপ্রসাদ চলে গেল। তার

সঙ্গেই গেলেন গুরুজী। বিকেলে রোজই পাহাড়ের ওপরের মালভূমিতে হাঁটেন ঘণ্টাখানেক। বলেন শরীর থেকে ঘাম না ঝরাতে পারলে মনটাকে বশে রাখা যায় না। শরীর আর মনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

গুরুজী কিন্তু আমাকে যেতে বললেন না। কারও উপরে নিজের ইচ্ছা চাপান না উনি। জ্ঞান দেওয়া যাবে বলে তাও দেন না। গান্ধীজী যেমন বলেছিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী" তেমনই তিনি তাঁর জীবনযাত্রা সামনে রাখেন—যার যা নেওয়ার তা থেকে সে নিয়ে নেয়।

আমি হাঁটব কাল থেকে। ভাবলাম আমি।

দ্রিমিকে বললাম, তুমি হাঁটতে যাও না?

মাঝে মাঝে যাই। আজ আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগছে। আপনি কলকাতার কথা বলুন।

বলার মতো কলকাতার কথা কেমন কথা নেই। ঝাঁক ঝাঁক মানুষ অর্থ, ক্ষমতা আর যশের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। যশের পেছনে যারা দৌড়াচ্ছে তাদের দেখে বড় ঘৃণা হয়। কত নীচে যে লেখাপড়া-শেখা মানুষ নিজেদের নামাতে পারে, সার্কাসের জোকারের মতো Bufoonsদের মতো, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

জোকার কি?

তুমি সার্কাস দেখনি কখনও?

না তো।

ও। সার্কাসে নানারকম খেলা দেখানো হয়, তারের খেলা, ট্রাপিজের খেলা।

ট্রাপিজ কি?

এই রে!

তারপর বললাম, অনেক উঁচুতে হাত পা দড়ির শিকেতে লটকে নানারকম খেলা দেখায় ছেলে ও মেয়েরাও।

পড়ে যায় না?

পড়ে কখনও কখনও। তবে নীচে মোটা দড়ির জাল থাকে, যাতে প্রাণান্ত না হয়। তবু চোট তো লাগেই। বাঘ সিংহ হাতি ঘোড়া এ সবের খেলাও থাকে আর দু তিনজন মানুষ কিম্ভূত সাজে বদরসিকতা করে মানুষদের হাসায়। ওরা যা করে তার অত্যন্ত স্থূল সব বাপার স্যাপার—শিশুদেরই ভাল লাগার কথা। আমাদের যশের ভিখারিরা এখন ওদের মতনই করেন।

কিসের যশ?

গল্পকার হিসেবে যশ, সাহিত্যিক হিসেবে যশ, নাচিয়ে হিসেবে যশ, কবি হিসেবে যশ, কোনও গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, সকলেরই এখন যশ চাই।

আর যাদের গুণ আছে?

তারা অভিমানে ঘরে বসে থাকে।

তাই?

তারপর বলল, আমাদের এখানে যশের কাঙালি দেখা যায় না।

তাই তো এ জায়গা এত ভাল।

একটু পরে পুজো শুরু হবে। কখনও দ্রিমি নাচেও। রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে। গান তো গায়ই। শোনার মতো গান।

শান্তাপ্রসাদ কিছু তারাবাজি, লাল-নীল দেশলাই এবং তুবড়ি এবং চীনে-পটকাও নিয়ে এসেছে দ্রিমির জন্যে। যাবার আগে বলল, ছেলেটার জন্যে কিনতে গেছিলাম দেবপ্রয়াগে, দ্রিমির জন্যেও নিয়ে এলাম।

দিওয়ালির দিন আমরা তিনজনেই দেবপ্রয়াগে গেছিলাম বিকেলে। আনন্দর ঝর্না বইছে। মন্দিরে মন্দিরে আর আশ্রমে আশ্রমে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ, নানা বাজির আলো, ঘণ্টাধ্বনি।

সংস্কৃত বা হিন্দি জানি না। এই আনন্দস্রোতের হৃদয় থেকে নির্বাসিত আমি। তবু দুঃখের মতো আনন্দও তো ছোঁয়াচে। তাই আনন্দ তো হয়ই।

সে রাতে আমরা সিংজীর বাড়িতেই থেকে গেলাম। দ্রিমি একটা লালশাড়ি পরেছিল জর্জেটের, লাল ব্লাউজ, লাল ফুল গুঁজেছিল মাথায়। আমার ভয় করছিল বাজি লেগে শাড়িতে আগুন না ধরে যায়। পাঁচবছরের মেয়ের মতো উচ্ছল দেখাচ্ছিল তাকে। আমার হাতে আগুন লাগানো একটা তারাবাজি ধরিয়ে দিল, যেন আমিও শিশু। শিশুই যেন হয়ে গেলাম। আনন্দের বন্যাতে ভেসে গেলাম। অলকানন্দার ও গঙ্গার দু পারে যে সম্মিলিত মন্ত্রোচ্চারণ, ঘণ্টাধ্বনি ও বাজির উৎসার তাতে যেন ঘোর লেগে গেল। এমন দিওয়ালি আমি জীবনে কোনওদিনও উপভোগ করিনি।

মনটা বড় খারাপ লাগছিল। চলে যেতে হবে আর কদিন পরেই দেবপ্রয়াগ ছেড়ে, ফাগুয়ারা পাহাড় ছেড়ে, দ্রিমিকে এবং গুরুজীকে ছেড়ে।

৫

আজ সকাল থেকেই মনটা বড় ভারী হয়ে আছে। সব সমাপনই যদি মধুর হত বা হতে পারত তাহলে সুখের শেষ থাকত না। কিন্তু এই হয়তো সত্য যে মানুষের জীবনে খুব কম সমাপনই মধুর হয়ে আসে।

দিওয়ালির পর থেকেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। দিওয়ালির পর থেকে শুক্লপক্ষও পড়েছে। চাঁদ প্রথম দিকে শেষ রাতে, পরে মধ্যরাতে উঠত। এখন সন্ধেরাতেই উঠছে। আর চারদিন পরে পূর্ণিমা। এই ফাগুয়ারার গুহাতে আমার প্রায় মাসখানেক থাকা হল। এর মধ্যে তিন-চারদিন দেবপ্রয়াগে নেমেছিলাম। এই পাহাড়ের প্রকৃতির মধ্যে যে কত গাছ, কত ফুল, কত পাখিকে চিনলাম দ্রিমির হাত ধরে তা বলার

নয়।

কাল রাতে গুহামুখে বসে গায়ে কম্বল চাপিয়ে দ্রিমির সঙ্গে প্রায় মধ্যরাত অবধি গল্প করেছি। ওর শীত খুব কম। মেয়েদের শীত পুরুষদের থেকে অনেক কম হয় যে সেটা লক্ষ্য করেছি কিন্তু দ্রিমির শীত প্রায় নেইই। দু-বেলা শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঝরনার ঠাণ্ডা জলে চান করে বলে ওর ত্বকের যেমন ঔজ্জ্বল্য তেমনই শীতও ওব লাগে না। ও শুধু শাড়ির আঁচলটা মাথায় ঘোমটার মতো করে দিয়ে বসেছিল। সামনে অবশ্য ধুনি জ্বলছিল। যদিও জংলী জানোয়ারেরা এ পর্যন্ত তাদের কোনও ক্ষতিই করেনি তবু ওরা গুহামুখে রাতের বেলা সারাবছর ধুনি জ্বালিয়ে রাখে। আগুন আবিষ্কারের পর থেকেই হয়তো বন পাহাড়ের মানুষেরা আগুনকে নিত্যসঙ্গী করেছে। এত দীর্ঘ দিনের পরে আগুন বোধহয় এক অবিচ্ছিন্ন অভ্যেস হয়ে গেছে।

কত কথাই না আমরা বললাম পুটুর পুটুর করে—মাথা নেই মুণ্ডু নেই, আরম্ভ নেই, শেষ নেই তবু সব কথাই কী তাৎপর্যপূর্ণ। তিওয়ারীজীকে তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও আমি গুরুজী বলে ডাকছি আজ দিন কুড়ি ধরে। তখন তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। তাড়াতাড়ি শোন উনি। ওঠেন ব্রাহ্মমুহূর্তে। আমি ব্রাহ্ম হয়েও কখনও সূর্যকে উঠতে দেখিনি। সূর্যও হয়তো কোনওদিন ওঠার সময়ে আমাকে দেখে ফেললে লজ্জা পাবে। তড়িঘড়ি সেও নিজের ঘড়ি দেখবে—গোলমাল হল কী না দেখার জন্যে। দ্রিমিও খুবই ভোরে ওঠে, প্রাতঃকৃত্য সেরে চান করে ফুল তুলে নিয়ে আসে, রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে ধূপ ধুনো দেয়, ফুল সাজায়। দিনে তিনবার চান করে দ্রিমি।

গুরুজী আর দ্রিমি গুহার যে প্রকোষ্ঠে শোন সেটি L শেপ-এর। সেই L-এর শেপে একদিন গিয়ে আবিষ্কার করি যে সেটি লাইব্রেরি। পুরনো পুঁথি থেকে, সংস্কৃত ও হিন্দি নানা বই, ইংরেজিতে লেখা দর্শনের বই এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা অর্থনীতির বইও দেখেছিলাম। আমাকে যে উনি একদিন Unstable Equilibrium-এর কথা বলেছিলেন তা আন্দাজে ঢিল ছোড়া নয়।

ভাবছিলাম আমরা একটা বই পড়েই কত কপচাই, সবাইকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করি, দেখাই যে আমি কত পণ্ডিত আর এই মানুষটির পাণ্ডিত্য বাইরে থেকে বোঝা পর্যন্ত যায় না। হিন্দুধর্মের বাঁধনের মতো। দেবপ্রয়াগে একজন সাধু আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, হিন্দুধর্ম হচ্ছে ফল্গু নদীর মতো। তার বহতা জল দেখা যায় না। বালির নিচে নিচে তা তিরতির করে চলে। শুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণে বলেছিলেন, "You will have to scratch a Hindu to find Hinduism in Him. A true Hindu does not exhibit or boast about Hinduism."

কত কী জানলাম, শিখলাম দ্রিমির কাছ থেকে, গুরুজীর কাছ থেকে এবং দেবপ্রয়াগের নানা সাধুসন্ত-এর কাছ থেকে। জ্ঞান কিছু বাড়েনি কিন্তু জ্ঞানের এক প্রচণ্ড প্রাণবান জগৎকে আবিষ্কার করে গেলাম এবারে। টাকা রোজগার করা, ভাল

থাকা, ভাল খাওয়া, মারুতি এইট হান্ড্রেড চড়াই যে জীবনের লক্ষ্য নয় তা উপলব্ধি করলাম। গুরুজীকে দেখে জানলাম অধ্যাপনা কাকে বলে। আমাদের মতো নোট মুখস্থ করে, নিজের স্বার্থের জন্যে পার্টির সদস্য হয়ে, অবাধ্য, অমনোযোগী, অনিয়মানুবর্তী ছাত্রদের কাছে সেই নোট উগরে দেওয়ার নাম যে অধ্যাপনা নয় তা জেনে মর্মে মর্মে মরে গেলাম।

যে-কোনও দেশের ভবিষ্যৎই সেই দেশের ছাত্রসমাজ। অধ্যাপকেরাও সেই ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁদের নিষ্ঠায়, সততায়, নিয়মানুবর্তিতায়, তাঁদের বিবেকময়তায়। এসব কথা পশ্চিমবঙ্গে আজ আর কেউই বিশ্বাস করে না। তাই যে সব ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী অথবা যাদের অর্থের জোর আছে তারা সবাই রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

গুরুজীর কাছে একমাসে যতটুকু শিখলাম তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে গাত্রচর্মহীন, নির্লজ্জ কিছু পার্টি-বাজ মানুষ যতদিন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের দলীয় কারণে ব্যবহার করবে ততদিন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা একটি প্রহসন হয়েই থাকবে।

অবশ্য সর্বনাশের বাকিই বা আর কি আছে। সবই তো শেষ। শ্মশান হয়ে গেছে সব। শ্মশানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাবাজেরা বক্তৃতা মেরে যাচ্ছে, নিজেদের গুণগান গাইছে।

শকুন্তলা যেমন করে পতিগৃহে যাত্রা করেছিলেন তখন আশ্রম মৃগ থেকে তার সখীরা যে বিষাদময় পরিস্থিতির উদ্ভব করেছিল আমার আশ্রম ছেড়ে যাওয়াটাকে তার সঙ্গে তুলনা করাটা একটু বাড়াবাড়ি হলেও ঘটনাটা অনেকটা সেরকমই দাঁড়িয়ে ছিল।

গুরুজী বললেন, আও বেটা। ফির আও। দ্রিমি তুমকো বাস রাস্তাতক ছোড়কর আয়েগী। নন্দলালা তুমহারা ভালা করে।

আমি বাস ধরে হৃষিকেশ যাব। সেখান থেকে দেরাদুনের বাস ধরে দেরাদুন। দেরাদুন থেকে দুন এক্সপ্রেস ধরে কলকাতা। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে যাব। সেই ভাবনা হয়তো আমার জীবনের গতিপথকে পাল্টে দেবে। আমি হয়তো কলকাতাকে চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়ে আবার এই নির্মল আলয়ে ফিরে আসব, প্রকৃতি আর দ্রিমির কাছে, গুরুজীর পায়ে।

কিন্তু পারব কি? কলকাতা যে একটা অজগর সাপ। একবার সে গিলে ফেললে সে যতক্ষণ না উগরে দিচ্ছে কারও পক্ষেই তার জঠর থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় যদি না সে অসীম মনের জোরের অধিকারী হয়। দ্রিমি বলল, চলুন, বাসের সময় হল।

বললাম, চল।

আশ্রম থেকে একটু দূরে এসে দ্রিমি বলল, আমাকে মনে থাকবে তো? না কলকাতা গিয়েই ভুলে যাবেন? কলকাতাটা কি আমাদের হৃষিকেশের চেয়েও বড় শহর?

আমি বললাম, কত হাজার হৃষিকেশ ঢুকে যাবে কলকাতাতে।

তারপর ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে, ওকে বুকে টেনে নিলাম। চুমুতে চুমুতে ভরে দিলাম ওকে। ওর কপালের সিঁথিতে, স্তনসন্ধিতে চুমু খেলাম। ও হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে আমার চুমুতে তার চুমু যোগ করল। অস্ফুটে বলল, আপনি এখনও বড় হননি, রোজ দাড়ি কামালে কী হয়।

তারপর বলল, যে খিদের পুরো নিবৃত্তি না হয়, তাকে ভুলেও জাগাতে নেই। মন দুখায়। শুধুই মন দুখায়।

গুরুজী আমাকে একটা বই দিয়েছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের লেখা, THE PRINCIPAL UPANISHADS। আমি যে হিন্দি বা সংস্কৃত জানি না। ইংরেজি জেনেই গর্বে এতদিন বেঁকে ছিলাম। অথচ অধিকাংশ পশ্চিমি দেশের শিক্ষিত মানুষ নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও নিদেনপক্ষে দুটি ভাষা জানেন। যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি তাঁরা হয় ফ্রেঞ্চ, জার্মান বা স্প্যানিশ জানেন। স্প্যানিশ না জানলে ল্যাটিন অ্যামেরিকাতে ভারি অসুবিধে হয়, ফ্রেঞ্চ না জানলেও ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং কানাডার অনেক জায়গাতেও খুবই অসুবিধে হয়।

আমরা এসব খবরই রাখি কিন্তু আমি ভারতীয় হয়েও হিন্দি বা সংস্কৃত জানি না। অথচ গুরুজীর জার্মান শিষ্য যে প্রতিটি বছর অফেনবাখ থেকে এখানে আসে, সে সংস্কৃতে পণ্ডিত, আমাদের দর্শন সে গুলে খেয়েছে।

লজ্জা! কী লজ্জা! আবার যদি আসি এখানে তাহলে সংস্কৃত না হলেও হিন্দিটা অন্তত ভাল করে শিখে আসব। ভারতীয় হয়ে তুলসীদাস বা মূল রামায়ণ, মহাভারত হিন্দিতে পড়তে পারি না। এ বড় লজ্জার কথা।

আমরা পথে নেমে এলাম। আর চুকারের ডাক, পাহাড়ি বুলবুলির ডাক, শম্বরের ঘ্যাক ঘ্যাক, কোটরা হরিণের ব্বাক ব্বাক, গভীর রাতে বড় বাঘের উঁ—আও ডাক শুনতে পাব না।

বাস এসে গেল। দ্রিমির হাতে চাপ দিয়ে আমি বাসে উঠে পড়লাম। বাসটা যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ দ্রিমি হাত নাড়তে লাগল। আমি বসার জায়গা পাইনি তাই হাত নাড়তেও পারলাম না।

দ্রিমি কী ভাবল, কে জানে।